নারায়ণ সান্যাল



# অশ্লীলতার দায়ে

নারায়ণ সান্যাল

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলকাতা ৭০০০০৯

এই গ্রন্থের রচনাকাল
এপ্রিল-মে ১৯৭৫

প্রথম (নাথ) সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৮৬
সেপ্টেম্বর 1979

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

নবম মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৫
ফেব্রুয়ারী 2009

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

ISBN 81-8093-001-7

৮০ টাকা

অনুজপ্রতিম
অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী-কে

# কৈফিয়ৎ

এই উপন্যাস রচনার মূল অনুপ্রেরণা পেয়েছি দু'খানি ইংরাজী গ্রন্থ থেকে। লেখকদ্বয়ের কাছে আমি অকুণ্ঠভাবে ঋণ স্বীকার করছি। প্রথমটি মার্কিন লেখক আর্ভিং ওয়ালেস লিখিত 'সেভেন মিনিটস্' ; দ্বিতীয়টি জাস্টিস জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক রচিত 'ল অব অবসিনিটি ইন ইণ্ডিয়া'। এ-ছাড়া সরোজ আচার্যের লেখা 'সাহিত্যে অশ্লীলতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ' থেকেও বহু সাহায্য পেয়েছি। কল্যাণীয় অ্যাডভোকেট শ্রীমান স্নেহাংশু রায়, শ্রীসুবাস মৈত্র এবং অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ডক্টর মানসী দাসগুপ্তা 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'-মামলায় সাক্ষী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা সবিস্তারে আমাকে বর্ণনা করায় আদালতের দৃশ্যটি আঁকতে আমার সুবিধা হয়েছে।

প্রথম সংস্করণ পড়ে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি অন্তরা অথবা ডক্টর মৈত্র কেমন করে পেলেন। কেউ কেউ আমাকে সেটা ব্যাখ্যা করে পরবর্তী সংস্করণে বুঝিয়ে দিতে বলেছেন। আমার মনে হয় সেটা বাহুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের মতো বইটি পুলিস প্রহরায় গুদামজাত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে কালোবাজার মারফৎ এ জাতের দুচারটে বই—যার অমন চাহিদা—কী করে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত স্বীকার করে যাই—আদালত-দৃশ্যের অবতারণায় আমি সজ্ঞানে বাস্তবকে ছেড়ে কল্পনার দিকে ঝুঁকেছি। এ আদালত বাস্তবের আদালত নয় সাহিত্যের আদালত। তাই বাস্তবে যেখানে দেড় দু'বছর ধরে মামলাটি ঝুলে থাকার কথা সেখানে আমার কাহিনীতে সেটি মাত্র এক সপ্তাহে শেষ হয়েছে।

28.8.79

## এক

টেলিফোনটার 'কথামুখে' হাত চাপা দিয়ে মিনতি ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, দাদু, নির্মল একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কখন আসতে বলব?

আনন্দময় হলকামরার ওপ্রান্তে ড্রেসিং-গাউন পরে ইজিচেয়ারে লম্বমান অবস্থায় কী একটা বই পড়ছিলেন। তাঁর মুখে চুরুট, হাতে লাল-নীল পেন্সিল। নাতনীর আহ্বানে বইটা টি-পয়ে নামিয়ে রাখেন, পেন্সিলটাও। চুরুটটাকে মুখ থেকে সরিয়ে বলেন, নির্মল? মানে, আমাদের নির্মল? আমার সঙ্গে আবার তার কী দরকার? সে তো তোর সঙ্গেই....

বাধা দিয়ে মিনতি বলে, কী দরকার তা যদি জানতে চাও তো নিজে এসে টেলিফোন ধর। বলছে, একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলবে, টেলিফোনে হবে না—সামনা-সামনি বলতে চায়—

: ও বুঝেছি! তা সে কথা আমাকে বলে তো লাভ নেই। আমি তো অনুমতি দিচ্ছিই। ওকে বল্ তোর বাপ্‌কে লিখতে। সেই তো তোর লীগাল গার্জেন।

: আঃ দাদু! কী বকছ আবোল-তাবোল! বিয়ের ব্যাপার যেদিন পাকাপাকি করব সেদিন তোমার অনুমতিও চাইব না—ড্যাডকেও লিখব না। এ অন্য ব্যাপার।

: আই সী! বিয়ে নয়! অন্য ব্যাপার। তা কী ব্যাপার?

মিনতি শ্রাগ করে। বলে, বলছে কী একটা বিষয়ে লীগাল অ্যাডভাইজ্ নিতে চায়। আজ সন্ধ্যায় আসতে বলব? ধর সাড়ে পাঁচটা?

: বল!

মিনতি সেই মর্মে টেলিফোনে জানিয়ে লাইনটা কেটে দেয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে দাদুকে বলে, তোমার ডায়েরীতে লিখে রাখব? আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়...

আনন্দময় ততক্ষণে বইটা তুলে নিয়েছেন চোখের সামনে। তার ওপার থেকে বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারিস। তবে লাভ নেই কিছু, কারণ আজ বুধবার, সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনে আমার লেকচার আছে—

: ও মা! তাই তো! তা তখন বললে না কেন?

আবার বইটা নামিয়ে রেখে আনন্দময় ছদ্ম-বিস্ময়ে বলেন, সেকি! তুই জেনে শুনে করিসনি?

: জেনে শুনে? তুমি বাড়িতে থাকবে না জেনেও ওকে আসতে বলব?

আনন্দময় আকাশ থেকে পড়েন: আরে! আমি তো তাই ভেবেছি। আমি ভাবলুম—তুই কায়দা করে জানতে চাইলি আমি কখন অনুপস্থিত থাকব!

মিনতি রেগেমেগে টেলিফোনটা আবার তোলে—

: এই মিন্টু! পাগলামি করিস না। নির্মল আসুক না বিকালে। আমি তো ঘণ্টা-খানেক বক্‌বক্ করে বাড়িতে ফিরে আসব। একটা ঘন্টা তোরা না হয়...

মিনতি ছদ্ম অভিমানে বললে, তুমি একটা যাচ্ছেতাই!

: বটেই তো! সুযোগ করে দিলাম—কোথায় খুশি হয়ে কফি খাওয়াবি—

দাদু এসময় এক কাপ কফি খান বটে। মিনতি রান্নাঘরের দিকে যায়।

আনন্দময় আর মিনতি। দাদু নাতনী। যোধপুর পার্কের এই নির্বান্ধব ত্রিতল বাড়িতে দুটি প্রাণী। দুই বন্ধু। আনন্দময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। আবার বইটা নামিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকান। শীতের সকাল। কার্নিশে একটা কাক। কুয়াশার সঙ্গে শহরের ধোঁয়া তালগোল পাকিয়ে যেন 'ট্রাফিক জাম' করেছে আকাশের কোণায়। বড় রাস্তার এক-চিল্‌তে একটা ভগ্নাংশ এই জানলা দিয়ে নজরে পড়ে—মিত্তিরদের আর গুহনিয়োগীদের দুটি বাড়ির ফাঁক দিয়ে। প্রাইভেট আর পাবলিক বাস, মোটর-গাড়ি, ঠেলা, রিকশা আর পদাতিকদের বিদ্যুৎ-চমক। ওরা কে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই জানা নেই—শুধু দেখতে পাওয়া যায় ওদের ব্যস্ততা। প্রবেশ আর প্রস্থান। ঝপ করে রঙ্গমঞ্চে ঢুকে খপ করে বেরিয়ে যাওয়া।

ঠিক যেন মানুষের জীবন : আগমন আর নির্গমন। প্রবেশ আর প্রস্থান। ওঁর নিজের এই আটষট্টি বছরের জীবনটাও বোধকরি মহাকালের হিসাবে ঐ ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকের বেশি নয়। নিয়োগীদের বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে মিত্তিরদের বাড়ির আড়ালে হারিয়ে যাওয়া। এ দুনিয়ায় প্রথম যেদিন এসেছিলেন—সেই হারিয়ে যাওয়া পূব-বাংলার সিংদরজা-ওয়ালা প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ির একান্তে এক অন্ধ কুটুরিতে মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে মৃত্তিকার প্রথম স্পর্শ পেয়েছিলেন—সে কতো যুগ আগেকার কথা। এই লোলচর্ম বিংশ শতাব্দী তখন বেণীদোলানো সাত বছরের বালিকা মাত্র। সেটা শোনা কথা, অঙ্কের হিসাব। কিন্তু তারপর? এই আটষট্টিটা বছরে কম তো দেখলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর কলকাতা শহরের আলোকসজ্জার কথাও মনে আছে ওঁর। উনি তখন রায়-বাড়ির দশ-এগারো বছরের বালক মাত্র। বাবার সঙ্গে শহর-কলকাতা দেখতে এসেছিলেন—শালতি করে বড় গাঙ—সেখান থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ ঘাট, বাকিটা ট্রেনে। শেয়ালদা থেকে পটুয়াটুলি। কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব দিন?

তার জন্য অবশ্য খেদ নেই কিছু। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন। এই দুনিয়ার রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ পঞ্চেন্দ্রিয়ের করপুটে গ্রহণ করেছেন অঞ্জলি পেতে। ডুব দিয়েছেন, ঘট ভরেছেন—বাকি আছে বিদায় নেওয়া। জমিদারী খুইয়েছেন—সাত-পুরুষের সেই মোটা-মোটা থামওয়ালা প্রাসাদ, পারাবতকূজিত স্তব্ধ-মধ্যাহ্ন, সেই সারি-সারি নারিকেল গাছের ছায়া, আম কাঁঠালের বন—সব, সব খুইয়েছেন। তা হোক—এক হাতে গেছে, আর এক হাতে এসেছে। সারা জীবনে উপার্জনও করেছেন প্রচুর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত। শুধু অর্থ নয়, সম্মান, শ্রদ্ধা, প্রতিপত্তি এবং শান্তি। দেহটা আজও আটক পড়ে আছে এই যোধপুর-পার্কের প্রাসাদোপম ত্রিতল বাড়িতে—মনটা তাঁর বানপ্রস্থ নিয়েছে অনেকদিন। সেই যেদিন স্ত্রী মনোরমাকে রেখে এলেন ক্যাওড়াতলার ক্রিমেটোরিয়ামে। তখনও উনি রিটায়ার করেননি। দুই ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে প্রতুল বিবাহ করেছিল মনোরমা বেঁচে থাকতে। মনোরমা মর্মাহত হয়েছিলেন—প্রতুল এক পাঞ্জাবিনীকে বিবাহ করায় ; আনন্দময় তাতে নিরানন্দ হননি। প্রতুল এখন ফরেন-সার্ভিসে—আছে দূর প্রাচ্যে, জাকার্তায়। ছোট ছেলে অতুলের মেম বিয়ে করাটা অবশ্য মনোরমা দেখে যাননি। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বছর দুই—ছেলেটি বাঙালি ; কিন্তু চাকরি করছে বিলাতে। সুতরাং আনন্দময়ের সংসার সেদিক থেকে নিরানন্দময়। একমাত্র ব্যতিক্রম এই মিনতি। প্রতুলের বড় মেয়ে। সে বরাবর রয়ে গেছে কলকাতায়। এখন

যাদবপুরে পড়ছে। এবার এম. এ. দেবে। প্রতুল ওকে বহুবার নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছে—মিন্টুই রাজী হয়নি। হয়তো দাদুর মুখ চেয়েই।

ভালই হয়েছে। তবু কথা বলার একটা মানুষ আছে। বাদবাকি তো চাকর-ঠাকুর শ্রেণীর। সময় অবশ্য কেটে যেত—মিনতি না থাকলেও—সময় কাটানোটা কোন সমস্যাই মনে হয়নি আনন্দময়ের। এই তিনতলা বাড়ির গোটা একতলাটা শুধু বই দিয়ে ঠাসা। বই, বই আর বই। আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়ে এত বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার কলকাতা শহরে অল্পই আছে। আনন্দময় রায়, জে—রিটায়ার্ড প্রিন্সিপ্যাল, 'ল-কলেজ'—'ইন্টার-ন্যাশ্‌নাল ল' বিষয়ে একজন অথরিটি। শুধু আইন নয়—দর্শন বিষয়েও ওঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। আনন্দময় শুধু 'ডক্টরেট অফ ল'-ই নন, তিনি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে অনারারী পি-এইচ-ডি পেয়েছেন। আনন্দময় সুবক্তাও। দর্শনের দুরূহ সূত্রগুলি তিনি অতি সুললিত ভাষায় ব্যাখ্যা করে থাকেন। ইতিপূর্বে নানান প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসত। ইদানীং শরীরের জন্য বিশেষ কোথাও যান না—একমাত্র গোলপার্কের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে সপ্তাহে একদিন গিয়ে দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

সে প্রসঙ্গই তুলেছিলেন আনন্দময়—বলতে চেয়েছিলেন, সপ্তাহের সেই চিহ্নিত বারটির কথা নিশ্চয়ই খেয়াল আছে তাঁর নাতনী মিনতির ; আর তাই সে নির্মলকে ঐ সময়ে আসতে বলেছে।

তাতে দোষ হয়নি কিছু। আনন্দময় সেটা মনে করেন না। যে-যুগে যে নিয়ম। ওঁদের আমলে বাপ-মা গিয়ে ছেলে দেখতেন, মেয়ে দেখতেন—ওঁরা জীবনসাথীকে দেখতে পেতেন একেবারে ছাঁদনাতলায়। আনন্দময়ের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল। আনন্দময়ের বিবাহ হয়েছিল মাত্র একুশ বছর বয়সে, মনোরমা মাত্র ষোলো। পরস্পরকে দেখেছিলেন একেবারে শুভদৃষ্টির পরমলগ্নে। এখন অন্য রেওয়াজ। প্রতুল-অতুলরাই প্রেম করে বিয়ে করল, তা মিনতি তো আবার তার পরের জেনারেশান। নির্মল ছেলেটি ভাল। মাত্র বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স কিন্তু এর মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে। এত অল্প বয়সে সরকারী মামলা পরিচালনার সুযোগ অতি অল্পজনের ভাগ্যেই ঘটেছে। নির্মলের ব্রিলিয়াণ্ট কেরিয়ার তাকে এই বয়সেই সে সুযোগ দিয়েছে। ছোকরা উঠবে, অনেক উপরে উঠবে। তার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় আনন্দময় এটা বুঝতে পারেন। মিনতি সুখী হবে।

আইনের কূট-কৌশল সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকলে নির্মল সটান চলে আসে আনন্দময়ের কাছে। মিনতি কফি বসায়। আনন্দময় নিমীলিত নেত্রে শুনতে থাকেন চুরুট মুখে, আর নির্মল বোঝাতে থাকে কেসটা কী, জটিলতাটা কোথায়। শুনতে শুনতে একসময় আনন্দময় চোখ খোলেন। বলেন, ইয়েস, টুকে নাও : (1) ওসমান ভি. অতুলকৃষ্ণ ; এ. আই. আর 1949 ক্যাল 692 (2) মহম্মদ হুসেন ভি. দলিপসিংজী, এ. আই. আর 1970 এস. সি. 45 (3) বাবুলাল ভি. কিং-এম্পারার, এ. আই. আর 1938 পি. সি.130।

নির্মল দ্রুতহাতে শ্রুতিলিখন সেরে ছোটে নিচের তলার গ্রন্থাগারে। নথীপত্র ঘেঁটে বইগুলো নিয়ে যখন ফিরে আসে ততক্ষণে মিনতি হয়তো রেখে গেছে কফির ট্রে। নির্মল অবাক হয়ে ভাবে আনন্দময়ের মাথার ভিতর ইণ্ডেকস-কার্ডগুলো কোন্ কায়দায় সাজানো? উনি কেমন করে এমন স্মৃতিনির্ভর নিদান হাঁকতে পারেন? কোথায় কোন আদালতে কবে এ-জাতীয় বিচার হয়েছে তা কী করে এভাবে মনে থাকে ওঁর?

কিন্তু থাকে। দেখা যায়, ভুল হয় না আনন্দময়ের। আজ তুমি যে সমস্যার কথা ভাবছ তেমনি সমস্যা আগেও দেখা গিয়েছিল---অতীতযুগের বিচারকদল ভেবে-চিন্তে তার উপর রায় দিয়েছেন। সেগুলি দেখ, বিশ্লেষণ কর, বুঝে নাও কোন্ ল-পয়েন্ট কেমনভাবে পেশ করবে, কী কায়দায় সওয়াল করবে, মক্কেলকে জেতাবে।

আজও বোধহয় সেইরকম কোন কেস-এর জট ছাড়াতে নির্মল তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। ঠিক আছে---সে আলোচনা তো হবে রাত্রে। তার আগে তাঁর বক্তৃতা। আজকের বিষয়বস্তুটা যেন কী? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে---কেনোপনিষদ্ শুরু করার কথা আছে আজ। কেনোপনিষদ্। 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ---কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ?' মন কাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া স্ববিষয়ে গমন করিতেছে? শ্রেষ্ঠ প্রাণই বা কাহার নির্দেশে গমনাগমন করিতেছে? 'ইষ' ধাতুর অর্থ ত্রিবিধ হতে পারে—আভীক্ষ্ণ্য, পুনঃপুনঃ গতি এবং ইচ্ছা। এখানে শব্দটির অর্থ—ইচ্ছা। শ্রুতি একথা জানেন যে, মনের কর্তা হচ্ছে দেহ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিময় এই দেহই 'প্রেযয়িতা',---প্রেরণকর্তা ; তবু শ্রুতি কেন এ প্রশ্ন তুললেন? আমার দেহের, আমার ব্যক্তিসত্তার অতিরিক্ত এমন স্বতন্ত্র স্বাধীন কি কোন সত্তা আছেন যাঁর ইচ্ছামাত্রে আমার মন নানা চিন্তায় ব্যাপৃত হচ্ছে? কে সেই শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন? তাঁকে বুঝে নিতেই এই আত্মজিজ্ঞাসা, এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। তাই নিয়েই কেনোপনিষদ্। কেনোপনিষদে মাত্র চৌত্রিশটি শ্লোক। চারখণ্ডে বিভক্ত এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। কিন্তু প্রথমেই শ্রুতি একটি প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। আনন্দময় নিমীলিত নেত্রে সেই প্রারম্ভিক মন্ত্রটি মনে মনে উচ্চারণ করলেন : 'আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র মথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং'...আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রবণেন্দ্রিয়, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ বৃদ্ধি বা পুষ্টি লাভ করুক। উপনিষৎ প্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউক।...

কিন্তু কেন? ইন্দ্রিয়াতীতকে উপলব্ধি করাই যদি কেনোপনিষদের লক্ষ্য হয় ; যদি সেই ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনার দায়িত্ব আমার দেহাতীত কোন ব্রহ্মের উপরেই বর্তায় তবে আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে পুষ্ট করতে চাইব কেন? ঐ বাক্-প্রাণ-চক্ষু-শ্রবণেন্দ্রিয়ের কারবার তো ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মকে নিয়ে নয়---সে তো রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় এই প্রকৃতিরই উপাসক। তাহলে প্রথম প্রার্থনামন্ত্রে সেই ইন্দ্রিয়সমূহের বৃদ্ধি এবং পুষ্টিলাভ কামনা করা হল কেন? কেনেষিতং? কার ইচ্ছায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন থেকে রাত্রে ফিরে এসে আনন্দময় দেখলেন নির্মল আর মিনতি ঘন হয়ে বসে আছে মুখোমুখি। ড্রাইভারকে গাড়ি গ্যারেজ করতে বলে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন আনন্দময়। ছড়ি রাখার স্ট্যাণ্ডে হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছড়িটা রেখে এগিয়ে এসে সোফায় বসেন। নির্মল দাঁড়িয়ে উঠেছিল, সেও বসল। বৃদ্ধ বললেন, কী তোমার গুরুতর আলোচনা আছে নির্মল? শুরু কর। আমি কর্ণময়।

নির্মল বললে, একটা বিরাট কেস্-এ ফেঁসে গেছি, স্যার!

: ফেঁসে গেছ? য়ু আর দ্য অ্যাকিউজ্‌ড়্?

: আজ্ঞে না। সে অর্থে নয়। কেসটা আমাকে সওয়াল করতে দেওয়া হয়েছে। আমি সেটাকেই রিপ্রেসেণ্ট করব।

আনন্দময় মিনতির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, বোঝ কাণ্ড! উনি মাইনে পাচ্ছেন

সওয়াল করার জন্য—আর কেস হাতে এলে বলছেন 'ফেঁসে গেছি!'

নির্মল আবার বলে, না—মানে কেসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! স্টেটের দিক থেকে এবং আমার ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের দিক থেকেও।

: প্রথমটার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, দ্বিতীয়টার জন্য আছে। কি বলিস মিন্টু? ডু য়ু এগ্রি?

মিনতি মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, না আমার আপত্তি আছে। আপত্তি ঐ বহুবচন প্রয়োগে। আমাকে আবার দলে টানছ কেন?

: তবে তুই এখানে বসে আছিস কেন?

: বসে আছি জানতে—তোমাদের কতক্ষণ লাগবে। মানে, রাত্রে নির্মল এখানে খেয়ে যাবে কি না।

: যাবে। আমাদের আলোচনা এখন অনেকক্ষণ ধরে চলবে। শুনলি না, এই কেসটার সঙ্গে নির্মলের কেরিয়ার ইনভল্‌ভ্‌ড্‌? তারপর নির্মলের দিকে ফিরে বললেন, মামলাটা কিসের? আই মিন, ধারাটা কত?

: সেকশান 292।

: আই সী! আনন্দময় মিনতির দিকে ফিরে বলেন, এ কি! তুই এখনও বসে?

: কেন? আমি থাকলে তোমাদের কী অসুবিধা হচ্ছে?

: কী আশ্চর্য! শুনলি না, ধারাটা 292।

মিনতি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। নির্মল মুখ লুকিয়ে হাসে। আনন্দময় রহস্যটা পরিষ্কার করেন, 'ল অব অবসিনিটি'—অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত কোন কিছু আলোচনা করব আমরা। কাঁচা খিস্তি করব দুজনে—'ফোর-লেটার্ড-ওয়ার্ডস'—ভাগ তুই।

মিনতি নির্মলকে বললে, সত্যি? আবার সেই লেডি চ্যাটার্লি, বিবর, প্রজাপতি, রাত ভ'রে বৃষ্টি?

আনন্দময় নির্মলকে বলেন, দেখলে নির্মল, দেখলে? এ-ছুঁড়ির সব ঠোঁটস্থ! অশ্লীলতায় অভিযুক্ত বইগুলোর নাম কেমন পটপট করে বলে গেল?

মিনতি উঠে যায়। আনন্দময় এবার চাপল্য পরিহার করে বললেন, আমি তোমাকে এ-বিষয়ে খুব একটা সাহায্য করতে পারব না নির্মল। আমার কোর্টে ঐ জাতীয় মামলা কোনদিন ওঠেনি। না অরিজিনাল, না অ্যাপিলে।

: কিন্তু আমি শুনেছিলাম স্টেট ভার্সেস বুদ্ধদেব বোসের কেস-এ আপনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষী দিতে চেয়েছিলেন?

: হ্যাঁ চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে সেটা ম্যাচিওর করেনি।

: কেন স্যার?

: কেন, সে কথা থাক। নানান কারণ ঘটেছিল। তবে আমি সাক্ষ্য না দিলেও ডিফেন্সে সাক্ষীর অভাব হয়নি। ডঃ মানসী দাসগুপ্তা এবং ডঃ শিশির চ্যাটার্জি দুজনেই অত্যন্ত পণ্ডিত এবং দুজনেই সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, বুদ্ধদেবের 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' আদৌ অশ্লীল নয়।

: তবু কিন্তু ওঁরা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হেরেছিলেন।

: সো হোয়াট? আপীলে জাস্টিস বসু এবং জাস্টিস মুখার্জি বুদ্ধদেব বসুকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, তোমাদের কেসটা কী? আর আসামী কে? লেখক,

প্রকাশক না মুদ্রক?

: তিনজনের একজনও নয়, স্যার—আমরা গ্রেপ্তার করেছি একটি পুস্তক বিক্রেতাকে।

: স্ট্রেঞ্জ! সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে এই বেঁড়ে বেটাকে ধরবার চেষ্টা করা হল কেন?

: দূর্নীতিদমন বিভাগ মনে করেছে এ পাপ নির্মূল করতে হলে একেবারে মূলে আঘাত করতে হবে।

: কিন্তু 'মূল' তো হচ্ছে লেখক—যার মাথায় দুর্বুদ্ধিটা প্রথমে জেগেছিল।

: সে 'মূলে' কুঠারঘাত করে দেখা গেছে, কিস্‌সু হয় না। লেখক খুশিই হয়। শেষ-মেষ দু'-এক শ' টাকা ফাইন দিতে হলেও ক্ষতি নেই। বাজেয়াপ্ত বইয়ের কাটতি যায় বেড়ে—লেখক 'দুর্নাম' নামক দুর্লভ বস্তুটি লাভ করেন; সাহিত্যজগতে তাঁর খাতির বাড়ে। তাছাড়া লেখককে মামলায় কাবু করাও শক্ত। লেখকদের প্রতি সাধারণ মানুষ, সংবাদপত্র, এমনকি বিচারকেরও একটা দুর্বলতা থাকে। বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে দেখেছিলেন তো স্যার? আমরা তাই গাছের সেই মূল কাণ্ডটাকে এবার স্পর্শ করিনি—বরং সেই মূল যে-মৃত্তিকা থেকে আহার্য সংগ্রহ করে, আঘাত হেনেছি সেই মৃত্তিকাতে। তলা থেকে মাটিটাকে সরিয়ে দিতে পারলে—যতবড় মহীরুহই হোক,—ভেঙে পড়বেই। লেখক আর প্রকাশক গোপনে খুশি হয় অশ্লীলতার দায়ে তাদের বইয়ের বিরুদ্ধে মামলা হলে। কিন্তু বেচারা পুস্তক-বিক্রেতা? তার লাভের অঙ্কে কিছুই নেই। দু-একটা ক্ষেত্রে ঐ দোকানদারকে জেল-জরিমানা করতে পারলে, অশ্লীল বই আর বিক্রি করতে সাহস পাবে না, ফলে প্রকাশক ছাপাতে চাইবে না, ফলে লেখক লিখবে না।

: তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবশ্য বক্তব্যটার যুক্তি অনস্বীকার্য। তা সে যাই হোক, পুস্তক-বিক্রেতাটি কে? কী-ভাবে তাকে ফাঁসানো হল?

নির্মল আনুপূর্বিক বর্ণনা দেয় :

## দুই

কলেজ স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি বি. এম. ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স-এর প্রকাণ্ড দোকান। কলকাতার অন্যতম বৃহত্তম পুস্তক-ব্যবসায়ী। দেশী-বিদেশী বইয়ের সম্ভার। কাউন্টারে না হোক চার-পাঁচজন কর্মচারী খদ্দেরের পছন্দমত বই যোগান দেয়। গ্রন্থবিপণির প্রতিষ্ঠাতা বিমলমোহন ভট্টাচার্যমশাই স্বর্গলাভ করেছেন—কেবলমাত্র 'সন্স'-রাই এখন মালিক। ভট্টাচার্যমশাইয়ের দুই পুত্র; ছোটটি কলেজে পড়ছে। বড়দা বিজয়মোহন দোকানের দেখ্‌ভাল করছেন। তিনি স্বয়ং বসেছেন ক্যাশ-কাউণ্টারে।

সকাল সাড়ে দশটা। দোকান সবে খুলেছে। খদ্দেরপাতি বিশেষ নেই। বিজয়বাবুর নজর হল—একজোড়া সুবেশ দম্পতি ট্রামরাস্তা থেকে ফুটপাথ পার হয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক স্যুটপরা, ভদ্রমহিলারও পোশাক-পরিচ্ছদে আভিজাত্যের ব্যঞ্জনা। বয়স দুজনের ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। শতকরা আশিভাগ সম্ভাবনা—ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। বইয়ের দোকানে ঢুকবার মুখেই ভদ্রমহিলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। তাঁর হাতে একটি অ্যাটাচি-কেস। সঙ্গীর কোটের হাতা আকর্ষণ করে তাঁর দৃষ্টি কাচের বিজ্ঞাপন-কাবার্ডের দিকে আকৃষ্ট

করেন। দোকানে ঢুকতেই বাঁ-হাতি ঐ গ্লাসকেসে সদ্য-প্রকাশিত কিছু বই, বইয়ের প্রচ্ছদ অথবা বিশেষ কোন বিজ্ঞাপনের ক্যাপশ্যান ডিসপ্লে করা হয়। বিজয়বাবু জানতেন, ঐখানে গত এক সপ্তাহকাল একটি মারাত্মক বিজ্ঞাপন টাঙানো আছে। যে বিজ্ঞাপনটা ওরা দুজনে পড়ছে এখন—ঐ কালো স্যুট, বাটিক টাই এবং ক্রেপ-ভয়েল-জড়োয়া দুল। পড়া শেষ হল। ভদ্রমহিলা নিম্নকণ্ঠে সঙ্গীকে কী যেন বললেন। উত্তরে তিনিও কী যেন বললেন। দুজনে উঠে এলেন দোকানে। বিজয়বাবু আরও লক্ষ্য করে দেখলেন, ওঁর একজন কর্মচারী অনেকগুলি বই টেবিলের উপর পেড়ে নামালো কিন্তু ভদ্রমহিলা পুনরায় ঐ কাচের শো-কেসের কাছে সরে এসে বিজ্ঞপ্তিটি দ্বিতীয়বার পড়তে থাকেন। বিজয়বাবু মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন বিজ্ঞাপনখানি—

"আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।—

"এখনও সভ্য না হইয়া থাকিলে এই শেষ সুযোগ :

"(১) আমরা কপিরাইট অনুমত্যানুসারে মাত্র ত্রিশ হাজার গ্রন্থ ছাপিতেছি। গ্রাহক হইবার অধিকার আবেদনপত্র প্রথমে-পাওয়ার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে। কোন আবেদনপত্র গ্রহণ না করার অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত। কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহিত সভ্য/সভ্যাই আবেদন করিতে পারিবেন। কোন আবেদনপত্র অগ্রাহ্য বা বাতিল করার জন্য কোনরূপ কারণ দর্শাইতে আমরা বাধ্য নই।

"(২) গ্রাহক হইবার জন্য আবেদনপত্র নিম্নলিখিত পুস্তকবিপণিতে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থের পূর্ণমূল্য একটি crossed postal order অথবা কলিকাতাস্থ কোন ব্যাঙ্কের demand draft/pay order সহ জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। একজন আবেদনকারীকে পাঁচখানির অধিক গ্রন্থ বিক্রয় করা হইবে না। প্রকাশের পর রসিদ দাখিল করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রন্থ ডেলিভারি লইতে হইবে।

"(৩) যে সমস্ত গ্রাহক ডাকযোগে বই সংগ্রহ করিতে চাহেন তাঁহাদের ডাকমাশুল নিজেদের বহন করিতে হইবে এবং ডাকমাশুল বাবদ গ্রন্থ-পিছু অতিরিক্ত তিনটাকা জমা দিতে হইবে। বই শুধুমাত্র রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হইবে।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থটির সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত:

'সর্বকালের সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত পুস্তক!...লেখক ও প্রকাশকের দুঃসাহস অকল্পনীয়।'

'পর্নোগ্রাফির চূড়ান্ত নিদর্শন?.... না নরনারীর নন্দনতত্ত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা?'

'কোনার্ক অথবা খাজুরাহোর মন্দির-গাত্রে যে তত্ত্ব পাথরে প্রতিফলিত তা যে ছাপার অক্ষরে পাওয়া যেতে পারে এ কথা চিন্তাই করিনি। কোনার্ক-শিল্পীকে যতই গালাগাল দিন নিঃসন্দেহে মানতে হবে তিনি জাতশিল্পী। এ গ্রন্থের লেখকের সম্বন্ধেও সেই শেষকথা।'

"মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন করা ভিন্ন মূল রচনার কোনও অংশ বর্জিত হয় নাই। প্রতিটি বিবাহিত বাঙালী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য :

অপ্রকাশ গুপ্ত বিরচিত যৌন-উপন্যাস

**।। সাগর সঙ্গমে ।।**

"লাইনো টাইপে ছাপা। সুন্দর কাপড়ের মজবুত বাঁধাই। পৃষ্ঠা-সংখ্যা 328।

মূল্য : কুড়ি টাকা।"

বিজয়বাবু নজর করে দেখলেন, মহিলাটি তাঁর সঙ্গীর কাছে ফিরে এসেছেন। দুজনে কি যেন আবার কথা হল। কর্মচারিটির সঙ্গেও তাঁরা কথা বললেন। সে হাত তুলে বিজয়বাবুকে দেখিয়ে দিল। ওঁরা দুজনে এগিয়ে এলেন তাঁর সামনে। ভদ্রলোকই কথা বললেন, আপনিই বিজয়বাবু? দোকানের মালিক?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

: 'সাগর সঙ্গমে' বইটি কি এখন কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না? আপনার কর্মচারী···

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ টাকা জমা দিলে সোমবার পাবেন।

: তার মানে আপনার দোকানে এখনও এসে পৌঁছায়নি?

: তার মানে তা মোটেই নয়। এখন অন্তত শ-পাঁচেক কপি বই আমার দোকানেই আছে। প্রকাশকের নির্দেশে সোমবার বইটি বাজারে ছাড়া হবে।

ভদ্রলোক কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। একটি সিগ্রেট ধরালেন। ভদ্রমহিলা কালো রঙের অ্যাটাচি-কেসটাও রাখলেন কাউন্টারের উপর, খাড়া করে। ভদ্রলোক একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, কেন বলুন তো? বই এসে গেছে, অথচ বিক্রি করছেন না?

বিজয়বাবু বুঝিয়ে বলেন, এ বইটার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। বছর চল্লিশ আগে বইটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশমাত্র ইংরাজ সরকার বইটি অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করেন। বিচারক নাকি তাঁর রায়ে লিখেছিলেন যে, আগামী চল্লিশ বছরের জন্য বইটির বিক্রয় নিষিদ্ধ। ওঁর রায়দানের তারিখটা থেকে চল্লিশ বছর শেষ হচ্ছে আজ শনিবার। তাই বিক্রি চালু হবে সোমবার থেকে।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়েছেন মনে হল। বললেন, কয়েকটা বিষয় বুঝলাম না। বইটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ঢাকা কোর্টের কী এক্তিয়ার আজ কলকাতার জীবনযাত্রায়? দ্বিতীয়ত, নগদ পয়সা দিয়ে লোকে বই কিনবে তার জন্য আবেদনপত্র, পোস্টাল অর্ডার এসব হাঙ্গামা কেন?

দোকানে খদ্দেরের ভীড় থাকলে হয়তো বিজয়বাবু বলতেন, কী জানি মশাই,আমি দোকানদার, সে-সব কথার কী জানি? সে জানে প্রকাশক।

হাতে আর কাজ না থাকায় উনি বোঝাতে শুরু করলেন, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু মামলাটা কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট-আদালতের। ইংরাজ-আমলের ম্যাজিস্টেটের সেই আদেশ আইন-মোতাবেক আজও এখানে গ্রাহ্য। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাবে বলি—প্রকাশক মশাই বোধহয় আশঙ্কা করেছেন যে, বইটি আবার অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত হতে পারে। তাই উনি আগে থাকতেই আট-ঘাট বাঁধছেন। আবেদনকারী স্বহস্তে লিখে দিচ্ছেন—তিনি প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহিত!

এতক্ষণে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করে বলেন, বইটা কি সত্যিই অশ্লীল?

বিজয়বাবু হাসলেন : এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ আছে। প্রথমত অশ্লীলতার সংজ্ঞাটাই আমরা জানি না। ঐ তো দেখুন না, বিজ্ঞাপনে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন—'পর্নোগ্রাফির চূড়ান্ত নিদর্শন, না নন্দনতত্ত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা!'

এ ভদ্রলোক বোধহয় নন্দন-তত্ত্ব-টত্ত্ব বোঝেন না, তাঁর মন আইন-ঘেঁষা। আবার একটি আইন-ঘটিত প্রশ্নই করলেন তিনি, আমি কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা কখনও শুনিনি—কোন বই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাজেয়াপ্ত হওয়া···

বিজয়বাবু বলেন, আমি সারাজীবন পুস্তক-ব্যবসায় নিয়ে আছি, তা আমিও কখনও

শুনিনি। প্রদীপবাবুর মুখে শুনেছি—

: প্রদীপবাবু কে?—বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক।

: প্রদীপ পাত্র। এ বইয়ের প্রকাশক। ভারতী প্রকাশনের প্রোপ্রাইটার যশোদারঞ্জন পাত্রের একমাত্র ছেলে।

: হ্যাঁ, কী শুনেছেন প্রদীপবাবুর কাছে?

: শুনেছি, সেই ম্যাজিস্ট্রেট ছিল একটু পাগলাটে ধরনের। পণ্ডিত ছিল লোকটা। জাজ্‌মেন্টে নাকি সে একটি সংস্কৃত শ্লোকও আউড়েছিল---অর্থাৎ পৃথিবী প্রকাণ্ড বড়, আর সময়ও অনন্ত।

ভদ্রমহিলা পিছন থেকে বলে ওঠেন : কালোহ্যহং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী।

: একজ্যাক্টলি! অর্থাৎ বিচারক তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার জন্যে বইটি অগ্রাহ্য করলেও, সর্বকালের, সর্বদেশের জন্যে সে কথা বলবার মত মনের জোর খুঁজে পাননি। নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো তাই চল্লিশ বছরের জন্যে বইটি নিষিদ্ধ করেছিলেন।

ভদ্রলোক বলেন, আপনি তো আমাকে বড় তাতিয়ে দিলেন মশাই; প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে। আপনি পড়েছেন বইটা নিজে?

বিজয়বাবু একটা হাই চাপতে চাপতে বললেন, কাল রাতে ডিনারের সময় শেষ পাতাটা পড়েছি। অপূর্ব!

: অপূর্ব! য়ু মীন অশ্লীল নয়?

: অপূর্ব মানে কি তাই?

: তার মানে বইটি অশ্লীল?

: আপনি নিজে পড়ে বিচার করবেন।

: তা আর করতে পারছি কই? আপনি যে আজ বেচবেন না বলছেন। দেখুন মশাই,—আমরা কলকাতায় থাকি না। ভারতবর্ষেও নয়। কাল সন্ধ্যার প্লেনে আমরা বাইরে যাব। এক কপি কি কিছুতেই বেচতে পারেন না আজ?

বিজয়বাবু সে-কথার জবাব না দিয়ে বললেন, কোথায় থাকেন আপনারা?

জবাব দিল মেয়েটি, টান্‌জানিয়া! সেখানে অনেক বাঙালী আছেন—দিন না একখানা বই, নিয়ে যাই।

: টানজানিয়া কোথায়?

: দক্ষিণ আফ্রিকায়—টাঙ্গানাইকা—নাইজিরিয়া দেশগুলো মনে আছে?

: কাল রাত্রেই আপনারা চলে যাচ্ছেন? সে ক্ষেত্রে অবশ্য—

: থ্যাঙ্কু! থ্যাঙ্কু!—ভদ্রলোক পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করেন।

বিজয়বাবু বলেন, দাঁড়ান মশাই। আগে আবেদনপত্র ভর্তি করুন। আপনি বিবাহিত নিশ্চয়?

ভদ্রলোক একগাল হাসলেন। সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বলেন, তুমিই বরং ফর্মটা ভর্তি কর। আমার না আছে সিঁথিতে সিঁদুর, না হাতে শাঁখা।

বিজয়বাবু লজ্জিত হয়ে বলেন, কিছু মনে করবেন না, জাস্ট এ ফর্মালিটি!

মেয়েটি আবেদনপত্রখানা টেনে নিয়ে সেটা ভর্তি করে জমা দিল।

পড়ে নিয়ে বিজয়বাবু বললেন, ঠিক আছে।

তাঁর চোখের ইঙ্গিতে একজন কর্মচারী ভিতর থেকে একখণ্ড বই প্যাক করে

আনতে গেল। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক বললেন, না দেখেই বিশটা টাকা খরচ করে ব... না নিলাম। ঠকব না তো?

বিজয়বাবু হেসে বললেন, আমি জামিন থাকলাম। এমন রগরগে বই বাজারে আসেনি কোনদিন---আপনার স্ত্রী উপস্থিত না থাকলে---

ভদ্রলোক হঠাৎ ঘুরে সঙ্গিনীকে বললেন, তুমি গাড়িতে গিয়ে বস না রমা। আমি এক্ষুনি আসছি।

মহিলা হাসলেন। বিচিত্র হাসি। অ্যাটাচি-কেসটা ফেলে রেখেই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন দোকান থেকে। ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে বলেন, কী বলছিলেন তখন---একেবারে র?

: ঘুম ছুটে যাবে!

: ব্যাপারটা কী নিয়ে?

: একটা বেশ্যা মাগীর কেচ্ছা! আত্মকাহিনী আর কি! সারাজীবন সে কত রকম পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে তার রগরগে বর্ণনা! মেয়েটির নাম তটিনী। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, পাঠান, মায় জাহাজী নিগ্রোর ঘাট পার হয়ে সে প্রেমে পড়ল এক ভেতো বাঙালীর! ত্রিশ বছরের পোড়-খাওয়া মাগীর এক বাইশ বছরের বাচ্চা নাগর! সে এক মহা কেলেচ্ছা!

কর্মচারী ব্রাউন-পেপারে মোড়া বইটা নিয়ে আগিয়ে আসতেই বিজয়বাবু সংযত হলেন। খরিদ্দার ভদ্রলোক ব্রাউন-পেপারের মোড়কটা খুলে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন বইটার ফর্মা-বাঁধাই ঠিক আছে কিনা। ভদ্রলোক একখানা একশ টাকার নোট বার করে কর্মচারীটিকে দিলেন। বিজয়বাবু ভাঙানি ফেরত দিলেন এবং মহিলার নামে ক্যাশমেমো কাটলেন।

ভদ্রলোক নমস্কার করে চলে গেলেন।

এবং মিনিট তিনেক পরেই ফিরে এলেন আর একজন সঙ্গীর সঙ্গে। পিছন পিছন সেই ভদ্রমহিলা। বিজয়বাবু বললেন, আপনার অ্যাটাচি-কেসটা তো? এই নিন।

ওঁরা তিনজনে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে অ্যাটাচি-কেসটা নিয়ে বললেন, মাপ করবেন বিজয়বাবু, এটা অ্যাটাচি-কেস নয়, একটা কনসিল্‌ড্‌ টেপ রেকর্ডার। আমরা এ পর্যন্ত যে কথাবার্তা বলেছি তা ওতে রেকর্ড করা হয়েছে। এবার আমাদের পরিচয়টা দিই—অফিসিয়াল পরিচয়। আমার নাম ইন্সপেক্টর বিমান গুহ, আমার সহকারী শ্রীরঞ্জিত তরফদার, আর উনি মহিলা-আরক্ষা বিভাগের সার্জেন্ট মিস্‌ রমা দাশ।

বিজয়বাবু স্তম্ভিত। কথাগুলো তিনি বোধহয় সব ঠিক বুঝতে পারলেন না। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন...মানে!...কী বলতে চাইছেন আপনি?...

: আমি ইন্সপেক্টর বিমান গুহ আপনাকে অর্থাৎ বি. এম. ভট্টাচার্য অ্যাণ্ড সন্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যকে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের 292 ধারা মতে গ্রেপ্তার করছি। অবসীন পাবলিকেশন অ্যাক্ট (1925-এর ক্রমিক সংখ্যা আট) অনুসারে কোন অশ্লীল বই বিক্রয় করলে আপরাধী আইনত দণ্ডনীয় বিবেচিত হবে। যেহেতু আপনি শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য মিস্‌ রমা দাশকে—

: মিস্‌ রমা দাশ? উনি আপনার স্ত্রী নন?

: 'সাগর সঙ্গমে' নামে একটি অশ্লীল বই বিক্রয় করেছেন তাই ঐ ধারা মতে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। আপনার দোকানে ঐ বই যত কপি আছে তা আমাকে হস্তান্তরিত করে রসিদ নিন, এবং আমার সঙ্গে থানায় চলুন।

কর্মচারীরাও এগিয়ে এসেছে গণ্ডগোল শুনে। কেউ কেউ নিম্নস্বরে বলছে—শালারা পুলিস!

বিজয়বাবু হতচকিত হয়ে বলেন, কী···কী বলছেন মশাই? আমার কী দোষ হল? আমি ছাপোষা দোকানদার···আমার মত তো হাজারটা দোকানে···

বিমান গুহ বললে, বিজয়বাবু, গ্রেপ্তারের পূর্বে আপনাকে জানানোর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এখন, আপনাকে গ্রেপ্তার করার পর আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আপনি যা কিছু বলছেন, তা ঐ টেপ-রেকর্ডার যন্ত্রে উঠে যাচ্ছে। আপনার মামলা চলা কালে আপনার ঐসব কথা আমরা আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি। আপনি ইচ্ছে করলে কোন কথা না বলতে পারেন, আমার কোন প্রশ্নের জবাব না দিতে পারেন। ইচ্ছে করলে আপনি আপনার সলিসিটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন···

বিজয়বাবু থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁর একজন প্রবীণ কর্মচারী এগিয়ে এসে বললে, বিজয়দা, কিছু ঘাবড়াবেন না। কোন কথা আর আপনি বলবেন না এঁদের। আমি প্রদীপবাবুকে এক্ষুনি ফোন করে দিচ্ছি। উনি তো বলেই ছিলেন পুলিসের হামলা হলে ওঁকে জানাতে···

বিজয়বাবু রুমালে মুখটা মুছে বললেন, আমার বাড়িতে একটা···

: সব ব্যবস্থা করছি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তো আমরা জামিনে ছাড়িয়ে আনব আপনাকে। ব্যস্ত হবার কী আছে? আপনি বিচলিত হবেন না।

বিজয়বাবু পুনরায় বিচলিতকণ্ঠে বললেন, না না, আমি ঠিক আছি। ক্যাশের চাবিটা তাহলে···

: ওটা আপনি নিয়ে যান। ক্যাশ বন্ধ করে যান। দোকান খোলাই থাকবে। আমি আলাদা ক্যাশের হিসাব রাখছি। আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব বিজয়দা।

বিজয়বাবু ম্লান হাসলেন। বললেন, আমি তাহলে এঁদের সঙ্গে···

বিমান গুহ বললে, হ্যাঁ আসুন। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীটের মুখটায় পুলিস ভ্যান রেখে এসেছি আমরা।

ওঁরা রওনা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ পিছন থেকে সেই বৃদ্ধ কর্মচারীটি বলে ওঠে—দারোগাবাবু, একটা কথা, শুনুন?

: ইয়েস? ঘুরে দাঁড়ায় বিমান গুহ।

: আপনি বিজয়দাকে অ্যারেস্ট করছেন কি করে? ব্রাউন কাগজে মোড়া বইখানা আমি আপনার হাতে দিয়েছিলাম। একশ টাকার নোটখানাও আপনি আমারই হাতে প্রথম দিয়েছিলেন। সুতরাং বিক্রেতা আমি : নবীন পতিতুণ্ডি। আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

বিমান গুহ 'নবীন' নামধারী ঐ বৃদ্ধকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি ফতুয়া, চোখে নিকেলের চশমা,—একটা ঘষা কাঁচ। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, একমাথা রুক্ষ সাদা চুল। বিমান বললে, না। বিক্রেতা শ্রীবিমান ভট্টাচার্য—যিনি ক্যাশমেমো লিখেছেন। আসুন বিজয়বাবু।

বিজয়বাবু কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

নবীন পতিতুণ্ডির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি-বিনিময় হল না। সে তার ঘষাকাঁচ চশমার ভিতর দিয়ে ইন্সপেক্টর বিমান গুহর দিকেই তাকিয়ে ছিল। বললে, আরও একটা কথা ছিল---

: বলুন?

আমার নাম নবীন পতিতুণ্ডি---আগেই বলেছি। আমি আজ চল্লিশ বছর ধরে বই বেচি---বুঝেছেন? বই লিখি না, বেচি! আমি সামান্য মানুষ,---তবু আমার সাবধান-বাণীটা শুনে যান---এ আপনারা ভাল করলেন না। ঐ মহিলাটির মিথ্যা কথা লেখার কৈফিয়ৎ একদিন ওঁকে দিতে হবে। এ দেশের আদালতে না হলেও আরও বড় একটা আদালতে! আপনারা পুলিস, কিন্তু প্রবঞ্চক! ঠগ! আপনারা বিজয় ভট্‌চার্যিকে আজ অপমান করছেন না---অপমান করছেন অপ্রকাশ গুপ্তকে। তিনি আপনাদের মত প্রবঞ্চক, ঠগ ছিলেন না---সত্য কথা বলবার হিম্মৎ তাঁর ছিল। তাঁর স্বর্গত আত্মা আপনাদের আজ অভিশাপ দিচ্ছে---

ইন্সপেক্টর বিমান গুহ জবাব দেয় না। অভিসম্পাতে সে অভ্যস্ত। সদলবলে বেরিয়ে আসে দোকান ছেড়ে।

## তিন

চ্যুত হওয়াটাই জীবনে পরম লগ্ন---এ সত্য জানা ছিল ভাস্কর মুখার্জির। গাছের আম ক্রমে বড় হয়, মাটি তাকে আকর্ষণ করে---ঝোড়ো হাওয়ায় সে দুলতে থাকে কিন্তু প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে বোঁটার নিরাপদ আশ্রয়ে। ঝড়ের কাছে সে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না---ঐ বৃন্তের সঙ্গে যে তার নাড়ির যোগ! তবু একদিন তার সেই নাড়ির যোগ ছিন্ন হয়---আর সেই বৃন্তচ্যুত হওয়াতেই তার সার্থকতা।

ভাস্করের জীবনে আজ সেই পরম লগ্নটি এসেছে। যে গাছ তাকে এতদিন প্রাণরসে পুষ্ট করেছে---তার নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে কেন্দ্রাতিগ বেগে তাকে বের হয়ে পড়তে হবে, যেমন করে বন্দরের কাল শেষ হলে জাহাজ ভেসে পড়ে অকূল সমুদ্রে। কৃতজ্ঞতার নোঙর এবার ছিঁড়তে হবেই।

কৃতজ্ঞতা। তার বন্ধন বড় শক্ত। সমস্ত সংসার তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে ঋণ দিয়ে, দাদন দিয়ে। সকলের সব ঋণ মিটিয়ে দিতে দিতে দেখবে একেবারে রিক্ত হয়ে গেছ। বাপ শিবনাথের কাছে তুমি কৃতজ্ঞ---তিনি তোমাকে এই দুনিয়ায় এনেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, মানুষ করেছেন, শেষমেশ হাতদুটি কচলে কচলে তোমাকে একটা চাকরিতেও ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মা শৈলবালার তো কথাই নেই---কথায় বলে মাতৃঋণ! ও শোধ করা যায় না। মাস-পহেলায় তাই যখন ও পে-প্যাকেটটা মায়ের হাতে ধরে দেয়, আর তিনি প্রশ্ন করেন, এ মাসে একশ টাকা কম কেন রে?---তখন বলতে নেই সিনেমা-সিগ্রেট ছাড়া কলকাতায় অফিস যাতায়াতের জন্য বাসভাড়া লাগে। দাদা অশোক সব সম্পর্ক ত্যাগ করে গেলেও তোমার একটা কর্তব্য আছে। মনে করে দেখ, তার বদান্যতায় তুমি তার ব্যবহৃত শতচ্ছিন্ন বইগুলি ঘেঁটেই একে একে পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়েছিলে একদিন। ছোট বোন উমার অবশ্য কোন দাবী নেই। না থাক---সে আছে বলেই বোতামহীন ইস্ত্রিছাড়া জামা-প্যান্ট আজও পরতে হয় না ভাস্করকে। নাঃ! ভাস্কর কৃতজ্ঞতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ।

তবু 'প্রেম' শব্দটার এমন একটা মহিমা আছে—সহস্রাব্দীর মানব-সভ্যতা আর সাহিত্য তাকে এমন পর্যায়ে তুলতে পেরেছে যে, 'দুত্তোর' বলে সব ছেড়েছুড়ে বেড়িয়ে পড়ার একটা অজুহাত ভাস্কর খাড়া করতে পারত ; পারছে না—তার দাদার জন্য। ও খেলা দেখিয়ে তিনি এ সংসার ছেড়ে গেছেন একদিন। 'রিপিট শো'-তে আর সে-থ্রিল নেই। একই অজুহাতে এ সংসারের দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে প্রেমের জোয়ারে ভেসে পড়ার মত মনোবল সংগ্রহ করতে পারছে না বেচারি।

শনিবার। অফিস ছুটি হয়েছে বেলা দুটোয়। কিন্তু ভাস্কর যখন বাড়ি এসে পৌঁছালো তখন রাস্তায় বাতি জ্বলছে। ভাস্কর কায়দা করে বলতে পারত অফিসের কাজই করেছে এতক্ষণ—ওভার-টাইম, কিন্তু মনের অগোচর তো পাপ নেই। ভাস্কর বোঝে কিসের আকর্ষণে সে ঐ সুন্দরী মক্কেলের সান্নিধ্যে কাটিয়ে এল এই সাপ্তাহান্তিক অপরাহ্ণের অবকাশ। কাজের কথার চেয়ে সেখানে অকাজের কথা হয়েছে বেশি। আয়করের অঙ্কের চেয়ে তৃপ্তির সঙ্গটাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছিল।

ভাস্কর ল-কলেজ থেকে পাস করে ভ্যারেণ্ডা ভাজছিল কিছুদিন। পিতা শিবনাথই একদিন ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন 'মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র' সলিসিটার্স ফার্মের সিনিয়ার পার্টনার সুকোমল মিত্রের কাছে। শিবনাথ যে সওদাগরী অফিসের বড়বাবু ছিলেন, সেই 'ইণ্ডিয়া এণ্টারপ্রাইস্ অ্যাণ্ড কোম্পানি'র সলিসিটার্স ছিলেন 'মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র'। চাকরি-জীবনে তাই শিবনাথের সঙ্গে সুকোমল মিত্রের কিছুটা পরিচয় হয়েছিল। সেই সূত্রেই অবসরপ্রাপ্ত শিবনাথ তাঁর 'এম. এ., বি. এল.' পুত্রের উমেদারি করতে এসেছিলেন। এবং সফলকাম হয়েছিলেন। ফলে এক হাতে কালো গাউনটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে অপর হাতটি বাড়িয়ে বাও করে 'মিলর্ড!'—বলে সওয়াল করার স্বপ্ন ঘুচে গেল। শিবনাথের অধস্তন পুরুষ হয়ে গেল 'মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র' কোম্পানির উত্তরাধিকার সূত্রে গ্লোরিফায়েড কেরানি। প্রথমে ঢুকেছিলেন সামান্য মাহিনাতে, কিন্তু নিজ কর্মক্ষমতার গুণে এখন ও প্রায় চার অঙ্কের সংখ্যাটা ছুঁই-ছুঁই। ভাস্কর অনেকবার ভেবেছে এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন প্র্যাক্টিস শুরু করবে—কলেজে বক্তা এবং ডিবেটার হিসাবে সে বরাবর সুনাম কিনেছে। ওর বিশ্বাস সাহস করে একবার নেমে পড়তে পারলে উকিল হিসেবে সে নাম কিনবে। 'নাম' মানেই অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। আর ওর এই গোপন বাসনার ক্রমাগত ইন্ধন জুগিয়ে গেছে ওর সহপাঠী আর বন্ধু সলিল লাহিড়ী।

: ছোড়দা, তোমার একটা জরুরী ফোন এসেছিল। বেলা তিনটেয়—প্রদীপদা খোঁজ করছিল ; বলেছে তুমি বাড়ি এসেই ওকে রিং-ব্যাক করবে।

এক কাপ ধূমায়িত চা হাতে উমা এসে দাঁড়ায়।

ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে ভাস্কর বললে, ঠিক আছে।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে ভাস্কর আবার ডুবে গেল তার চিন্তায় : প্রদীপ এতদিন পরে হঠাৎ এমন জরুরী ফোন করল কেন? কতদিন পরে?—তা বছর খানেক তো বটেই। ওদের বাড়িতে সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটে যাবার পর প্রদীপ চলে গিয়েছিল। আর আসেনি কোনদিন, যোগাযোগও করেনি। প্রদীপ ওর সহপাঠী ; একসঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে পড়ত। সে একটা যুগ গেছে—যখন সকাল থেকে রাত্রি ওর জীবন আলোকিত হয়ে থাকত ঐ প্রদীপের আলোয়। কলেজ, কফি হাউস, ক্লাস-পালানো ম্যাটিনী শো, অথবা খেলার মাঠ। ওরা তিনজন—ও, প্রদীপ আর সলিল। ওরা দুজনেই

মধ্যবিত্ত সংসারের ভালো ছেলে—মাসিক পকেট-মানির পরিমাণটাকে কলেজ যাতায়াতের বাসভাড়া দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হত ছুটি বাদে মাসের দিনাঙ্ক, এবং ভাগশেষ এক বাণ্ডিল ব্যবহৃত বাস-টিকিট; ফলে বড়লোকের ছেলে ঐ প্রদীপের স্কন্ধেই চাপত রেস্তোরাঁর বিল থেকে সিনেমা-কাউন্টারে পয়সা মেটাবার দায়। প্রদীপের বাবা বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী—প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। এদেশে তো বটেই বিদেশেও তাঁর বহু বই কাটে। ফলে অর্থের অভাব ছিল না প্রদীপের, এবং বন্ধুদের জন্য তা ব্যয় করবার মত দরাজ দিলটাও ছিল।

ছেলেটা সত্যিই দিল-দরিয়া। সেবার শিবনাথ যখন বাথরুমে উল্টে পড়লেন—মানে তাঁর প্রথম অ্যাটাক হল, তখন ভাস্কর চোখে অন্ধকার দেখেছিল। তখনও ভাস্কর চাকরি-বাকরি ধরেনি। দাদা তার আগেই সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে। সংসার টিকে ছিল একমাত্র শিবনাথের উপার্জনে—ঐ প্রদীপই সে সময় অযাচিতভাবে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল এক বাণ্ডিল একশ টাকার নোট। বিনা হ্যাণ্ডনোটে—বলতে গেলে, ধার শোধের প্রত্যাশা না রেখেই। এত টাকা প্রদীপ কোথায় পেল সে-কথা ভাস্কর সাহস করে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেনি—প্রয়োজনের তাগিদ তার এতই সর্বগ্রাসী ছিল। পরে জেনেছিল, প্রদীপ সে সময় বাপের ব্যবসা দেখত; ক্যাশ টাকা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ছিল তার। কী করে সে ক্যাশরেজিস্টার ম্যানেজ করেছিল তা আজও জানে না ভাস্কর—সে শুধু জানে, চাকরি পাবার পর তিল তিল করে সেই ঋণ শোধ করেছে সে, মাসে মাসে পঞ্চাশ একশ দিয়ে। হ্যাঁ, কৃতজ্ঞতার কথা যদি তোল তবে এ বাড়ির বাইরে ঐ আর একজনের কাছেও ভাস্করের কেনা হয়ে থাকা উচিত।

প্রেসিডেন্সী কলেজের গণ্ডি পার হবার পর প্রদীপের সঙ্গে যোগাযোগটা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। প্রদীপ ঢুকে পড়েছিল তার বাপের ব্যবসায়ে—'ভারতী প্রকাশনীতে।' এম. এ. পড়েনি প্রদীপ, উপায়ও ছিল না—কারণ অর্নাস নিয়ে পাসই করতে পারেনি। সলিল আর ভাস্কর দিনে পড়ত এম. এ. আর রাত্রে আইন। তখনও অবশ্য মাঝে মাঝে প্রদীপের সঙ্গে ওদের দেখা হত। আড্ডায়। তারপর যেমন হয়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে পথে-ঘাটে দেখা হলে যে-কেউ একজন অভিযোগ করে—কিরে হতভাগা! আজকাল যে তোর পাত্তাই পাওয়া যায় না?

সলিলের সঙ্গে অবশ্য দোস্তিটা আরও কিছুদিন টিকে ছিল। সেটা ছিন্ন হল সলিল বিয়ে করার পর। তবু দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে—হাইকোর্টের বারান্দায়, ওল্ড কোর্ট হাউসের সেই চিহ্নিত কাফেটেরিয়ায়। কিংবা সলিল হয়তো এসে হানা দিয়েছে ওর অফিসে, অথবা ভাস্করই গিয়ে বসেছে ওর অন্ধ কুটুরিতে। সলিল লাহিড়ীও ঠিক ওর মত ঢুকেছিল এক বাস্তুঘুঘুর খোঁয়াড়ে—আলো-বাতাসহীন এক আইন-ব্যবসায়ীর অফিসে। 'কেস' নিয়ে ওদের আলোচনা হয়েছে, ল-পয়েন্ট নিয়ে তকরার হয়েছে, উত্তমকুমার থেকে গারফিল্ড সোবার্স, কিউবা থেকে ভিয়েৎনাম, ডবল-হাফ চায়ের কাপে ডুবিয়ে ছেড়েছে। তবু সে দ্বৈত-সঙ্গীতে গানের ধুয়োর মতো একটা প্রসঙ্গ বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে। ওদের একটা যৌথ স্বপ্নের কথা। দু-বন্ধুর একটা না-গড়া সাতমহলা বাড়ির নক্সা। 'মুখার্জী অ্যাণ্ড লাহিড়ী, সলিসিটার্স ফার্ম'! সেই কালো গাউন পরে বাও করে বলা—'য়োর অনার!' 'মি লর্ড!'

ওদের দুজনের যে কেউ প্রসঙ্গটা তুললেই অপরপক্ষ তাকে তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিত

: অবজেক্‌শন, য়োর অনার! দিস ইজ ইর্‌রেলেভ্যান্ট, ইম্মেটিরিয়াল, অ্যাণ্ড—

কথা খাঁটি। চাকরি ছেড়ে না হয় দুই বন্ধু একটা নতুন ফার্ম খুলে বসল, অফিসঘর ভাড়া নিল, না হয় কোনক্রমে টেলিফোন কানেকশানও পেল। তারপর? 'কেস' আসবে কোথা থেকে?

সলিল বলত, বুঝলি ভাস্কর, উকিলবাবু তো পাওয়া যায় পাড়ায় পাড়ায়। সে ভিড়ে একটা নতুন অফিস খুলে মাছি তাড়াবার কোন অর্থ হয় না। শুরু করতে হবে নাটকীয় ভাবে—ড্রামাটিক্যালি! এমন একটা কেস নিয়ে আমরা উদ্বোধন করব যে, রাতারাতি ফেমাস! যে মামলার কথা নিত্য হবে খবরের কাগজের হেড-লাইন! তোর আমার নাম রোজ ছাপা হবে কাগজে! তেমন একটা ঝাঁঝালো কেস-এর সন্ধান দিতে পারিস?

ভাস্কর বলত, তেমন 'কেস' কোর্টে আসে হাজারে একটা। আর এলেও মক্কেল খোঁজে কেষ্ট-বিষ্টু কৌঁসলী—ঐ যাঁরা চাঁদি ছোন না—যাঁদের ফি মোহরে কষতে হয়!

সলিল বলত—সেই তো হয়েছে মুশকিল। না হলে কবে এ চাকরির মাথায় লাথি মেরে—

: কই প্রদীপদাকে ফোন করলে না?—উমার কণ্ঠস্বরে চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে আসে ভাস্কর। এ যে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। তা অবশ্য হতেই পারে। এক কালে প্রদীপ পাত্র শ্রীমতী উমার প্রতি কিছু দুর্বলতা দেখিয়েছিল বটে। সেই যে যুগে ও এ বাড়িতে আসত। সকাল-বিকাল। উমা তখন সপ্তদশী; ওরা বাইশ-তেইশ। সে আজ বছর আষ্টেক আগেকার কথা। উমার জন্য ভাস্করের দুঃখ হয়। পঁচিশ বছরের কুমারী মেয়ে! বেচারী কালো, মুখশ্রী যতই সুন্দর হোক—ওর কল্পলোকের রাজপুত্র আজও এসে পৌঁছায়নি এ বাড়ির দোরগোড়ায়! না, ভুল হল—সে বোধহয় এসেছিল—তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিবনাথের কঠোর জাত্যভিমানে। রাঢ়ী শ্রেণীর মেয়ের জন্যে পাত্রবাড়ির পাত্র? এ অনাচার অসহনীয়। তারপর? তারপর শিবনাথ রিটায়ার করেছেন—দাদা সংসার ছেড়ে চলে গেছে; মায়ের হাত হয়েছে শাঁখা-সম্বল। আর এতবড় সংসারের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার দায় মিটিয়ে ভাস্করও কিছু সঞ্চয় করতে পারেনি যাতে ঐ রাঘববোয়ালদের—ঐ যারা মাঝে মাঝে এসে বাইরের ঘরে বসে মিষ্টান্ন ধ্বংস করে চলে যেত, 'বাড়ি গিয়ে চিঠিতে জানাব' বলে—ওদের দাবী মেটানো যায়। ইদানীং অবশ্য সে বখেরা মিটেছে। উমা আর কোন পাত্র-পক্ষের সামনে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করতে দৃঢ়স্বরে অস্বীকার করেছে। হয়তো তার জেদ পাত্তা পেত না শিবনাথের ধমকে—কিন্তু রোজগেরে ছেলের সহানুভূতি উমারই পক্ষে যাওয়ায় সে বিড়ম্বনার অবসান ঘটেছে।

ভাস্কর উমাকে বললে, এখন আর ওকে ফোন করে কোন লাভ নেই। প্রদীপ অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে।

: অফিস কেন? ওদের বাড়িতে কর না?

ভাস্কর ইতিমধ্যে ইজিচেয়ারে আরাম করে শুয়েছে। বলে, তুই একটু চেষ্টা করে দেখ না উমা। ওকে লাইনে পেলে ডেকে দিস্।

উমা ভাব দেখালো সে যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে। নেহাৎ দাদার বন্ধুর জরুরী দরকার তাই সে রাজী হল। ভাস্করের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ডাইনিং স্পেস-এ। টেলিফোনটা ঐখানে থাকে। তুলে নিয়ে ডায়াল শুরু করতেই দক্ষিণের ঘর থেকে

শিবনাথ বলে ওঠেন, কাকে ফোন করছিস্ রে খুকি?

এই আর এক যন্ত্রণা। বুড়ো মানুষ, রিটায়ার করেছেন, অথর্ব,—আপন মনে থাকলেই হয়। তা নয়—কে কী করছে, কে আসছে, কে যাচ্ছে, কোথা থেকে আসছে বা যাচ্ছে সব খবর ওঁর জানা চাই। বুড়ো হলে মানুষের ধর্ম-ধর্ম বাতিক হয়—স্বর্গে যাবার সুবিধা হক না হক মর্ত্যের মানুষগুলো কয়েকঘণ্টা নিশ্চিন্ত হতে পারে। শিবনাথ তার ধার মাড়ান না। গল্পের বই পড়েন না, কিন্তু লাইব্রেরী থেকে কি বই আনা হচ্ছে খবর রাখেন। তাঁর একমাত্র নেশা—রেডিও। দিবারাত্র কানের কাছে রেডিও বাজছে; উনি কিন্তু শোনেন না আদৌ। পঞ্চেন্দ্রিয় একাগ্র করে উন্মুখ হয়ে লক্ষ্য করতে থাকেন সংসারের প্রতিটি মানুষকে—'তোর হাতে ওটা কী রে কেষ্টা?' অগত্যা কেষ্টা দাদাবাবুর জন্য আনা সিগ্রেটের প্যাকেটটা হাত-সাফাই করতে বাধ্য হয়। 'উমা, দেখি চিঠিটা কার?'—খামের চিঠি হলেও রেহাই নেই, আলোর সামনে ধরে লক্ষ্য করবেন—ভিতরের বস্তুটাকে সনাক্ত করা যায় কিনা; হস্তাক্ষর, পোস্টাল ছাপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। মায় প্রৌঢ়া স্ত্রীকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করবেন, 'তখন জানলা দিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

উমা শিবনাথের প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাহুল্য বোধ করে। ভাস্করকে ডেকে দেয়, ছোড়দা, পাওয়া গেছে। নাও, কথা বল—

ভাস্কর উঠে আসে। শিবনাথ ও-ঘর থেকে যথারীতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে থাকেন, কে রে? কাকে টেলিফোনে পেলি রে উমা?—উমা জবাব দেয় না।

: হ্যালো···কে প্রদীপ? বল? কী ব্যাপার?

: কোথায় থাকিস সারাদিন? অফিসে ফোন করলে বলে বাড়ি গেছে, বাড়িতে ফোন করলে বলে অফিসে গেছে!

: এ দুনিয়াটা শুধু অফিস-বাড়ি দিয়ে সীমিত নয়। কেন খুঁজছিলি বল?

: টেলিফোনে হবে না। অনেক কথা আছে। মোস্ট আর্জেন্ট! তুই আছিস? আসব?

: জাস্ট এ মিনিট!—টেলিফোনের কথা-মুখে হাত চাপা দিয়ে ভাস্কর উমার দিকে ফেরে। বলে, প্রদীপ আসতে চাইছে। কী বলব?

উমা কিছুতেই নির্লিপ্ত ভাবটা বজায় রাখতে পারল না। তার মুখে অতি দ্রুত কয়েকবার রঙ পাল্টালো। বোধকরি তার মনে পড়ে গেল পাঁচ-সাত বছর আগে দেখা প্রদীপদাকে, কিংবা যেদিন সে শেষবার এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সেই দিনটার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল ওর। অথবা সব কিছু আড়াল করে দাঁড়ালেন শিবনাথ। বাড়িতে কুল্লে তিনখানা ঘর। দক্ষিণের সবচেয়ে ভাল ঘরখানা শিবনাথ-শৈলবালার ঘাঁটি। পাশের ছোট্ট খুপরিটি উমার আর সামনের ঘরখানা ভাস্করের। প্রদীপদা এলে ছোড়দার ঘরেই এসে বসবে; কিন্তু শিবনাথ কি টের পাবেন না? যা হবে না, হবার নয়, তার জন্য স্বপ্ন দেখে কী লাভ? শুধু শুধু হয়তো অপ্রীতিকর একটা ঘটনা ঘটবে। না, উমা তা চায় না। তার দৃঢ় অভিমত প্রদীপদাকে এ বাড়িতে আসতে বলার কোন মানে হয় না—অত কাণ্ডের পর।

: কী হল? কী বলব?

: আমি তার কী জানি?—এর চেয়ে দৃঢ়তর ভাষায় উমা বলতে পারল না।

ভাস্কর টেলিফোন-মুখে বললে, না রে, এখানে একটু অসুবিধা আছে রে প্রদীপ।

আমাদের বাড়িতে আজ গেস্ট আছে। এখানে নিরিবিলি হবে না—তুই বরং বাড়িতে থাক। আমিই আসছি।

প্রদীপও যেন একটু আশাহত হল। বললে, ও আচ্ছা। ঠিক আছে, আয়।

ভাস্কর টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে। উমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে। বলে, সরি!

: 'সরি' মানে?

: মানেটা যদি বুঝে থাকিস তবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। না বুঝে থাকিস তাহলে বৃথাই বলেছি ওটা—সে ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।—

ভাস্কর চলে আসে নিজের ঘরে। শার্ট প্যান্ট ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি চড়ায়। পিছন থেকে শোনা যায় শিবনাথের কণ্ঠস্বর বিবিধ-ভারতীর প্রোগ্রামের সঙ্গে মেশানো—গেস্ট আবার কে এল এ বাড়িতে? আশ্চর্য বাবা! কথা বলতে এদের যেন মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে! সব কটা সমান!

মিনিট পাঁচেক পরে উমা এ ঘরে এসে দেখল, পোশাক বদলিয়ে ভাস্কর নিশ্চুপ পড়ে আছে তার ইজিচেয়ারে। দু আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগ্রেটে গাছের পাকা-আমটির মত মারাত্মকভাবে ঝুলছে ছাইটা। চোখ দুটি বোজা, চশমাটা কোলের উপর। উমার পদশব্দেও ধ্যানভঙ্গ হল না ভাস্করের।

: ছোড়দা।

: উঁ?—চোখ দুটি খুলে গেল, ছাইটা পড়ল মেঝেতে।

: কি ভাবছিলি বল তো?

: যা ভাবছিস তুই—এতদিন পরে প্রদীপ পাত্র হঠাৎ কী জরুরী কথা বলতে চাইছে ভাস্কর মুখার্জিকে!

একটু ইতস্তত করে উমা বললে, ওর সেই টাকাটা পুরো শোধ হয়ে গেছে?

: গেছে। না গেলেও এভাবে টাকার তাগাদা দেবার লোক সে নয়।

: না, না, তা বলছি না আমি। আমি ভাবছিলাম—

: ঠিক ওই কথাই তো আমিও ভাবছি রে উমা!

: কী কথা?

: তুই যা ভাবছিস। প্রদীপ পাত্রের জরুরী কথাটা যদি এমনতর হয় : 'অনেক অনেক দিন উমাকে দেখিনি। সে কেমন আছে রে?'

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই এ-কথায় খেপে গেল উমা। বললে, ছোড়দা! তোদের মনে রাখা উচিত—আমিও রক্ত-মাংসের জীব! কেন, অহেতুক আমাকে এভাবে অপমান করিস বল তো? আমি...আমি তোদের কী ক্ষতি করেছি?

ভাস্কর সোজা হয়ে উঠে বসে। চশমাটা নাকে চড়ায়। বলে, উমা, আমাকে ঐ শিবনাথ-শৈলবালার দলে ফেলিস না! তুই তো জানিস—এ ব্যাপারে আমি বরাবর তোর দলে! এখনও যদি তোর হিম্মৎ থাকে তো বল! বড়দা যেভাবে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল সে ভাবে যদি—

: কী বকছ পাগলের মত? সে-সব তো কবে চুকে-বুকে গেছে—

: আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ হঠাৎ প্রদীপের টেলিফোন পেয়ে আমার কেমন যেন সন্দেহ জাগছে! তাই যাবার আগে তোর মনের কথাটা জেনে যেতে চাই। পারবি?—দ্যাখ, যদি সে ভাবেই ঘটনার মোড় নেয়...আই মিন, প্রদীপ যদি আজ...

: তার আগে আমাকে একটা কথা খোলাখুলি বল্ তো?

: কী?

: তোর কী হয়েছে? আজ কদিন ধরে লক্ষ্য করছি তোরও একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে! তুইও কি কোন মেয়েকে—?

এমন মুখোমুখি প্রশ্নের সম্মুখে ভাস্করও দিশেহারা হয়ে গেল। জবাব যোগাল না তার মুখে। ভেবে রেখেছিল—এ জাতীয় প্রশ্ন উঠলে সরাসরি হেসে উড়িয়ে দেবে, অস্বীকার করবে ; কিন্তু এমন পরিবেশে, এমন সুরে উমা প্রশ্নটা করে বসল যে সব কিছু গুলিয়ে গেল ভাস্করের।

: আমি ঠিকই ধরেছি। তাই নয়? মেয়েটি কে তা এখনই জানতে চাইছি না ছোড়দা, শুধু বল সে কি বে-জাতের?

কর্তব্য ছাড়া রক্তের সম্পর্কের সঙ্গে আরও একটা বন্ধন হয়ে থাকে, তাকে বলে ভালবাসার বন্ধন। এ বাড়িতে ঐ একটি মাত্র প্রাণী—ঐ উমাই সে বন্ধনে আঁকড়ে রেখেছে ভাস্করকে। তাই বেচারী অস্বীকার করতে পারল না। বললে, শুধু বে-জাত নয় রে উমা, মেয়েটি বিধবা!

উমার প্রতিক্রিয়াটা ঠিক নজর হল না ভাস্করের, কারণ সেই মুহূর্তেই আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা। উমার ঐ চমকটা সেই টেলিফোনের আহ্বানেও হতে পারে। ভাস্করই এগিয়ে এসে টেলিফোনটা তুলে নিল : হ্যালো!

: প্রদীপই বলছি। শোন, তোদের বাড়িতে তো আজ গেস্ট আছে। তুই বাড়িতে বলে আয় আজ রাত্রে আমার এখানেই থাকবি। রাত্রে এখানেই খাবি।

: ও আচ্ছা!

টেলিফোনটা রেখে উমাকে বললে, প্রদীপই আবার ফোন করেছিল। মাকে বলে দিস্ আমি রাত্রে ফিরব না। খাবও বাইরে।

: প্রদীপদার বাড়িতে থাকবি?

ভাস্কর হেসে বললে, তুই কী ভাবছিলি? অন্য কোথাও?

উমা হাসল না। আঙুলে আঁচলটা জড়াতে জড়াতে বললে, একটা কথা ছোড়দা—

: বল?

: তোরা আজ সারারাত কি কথা আলোচনা করবি তা আমি জানি না ; কিন্তু প্লিজ আমার প্রসঙ্গ যেন না ওঠে।

: তার মানে?

উমা মুখটা তুলল। ওর চোখে জল নেই, তবু যেন চিক্‌চিক্ করছে তার দৃষ্টিটা। বললে, তুই এক্ষুনি যে কথা বললি, তারপর···!

: কী বলেছি আমি? দূর তা বলিনি। সব বাজে কথা!

: না। আমার কাছে লুকোস না। আমি বুঝতে পেরেছি। বড়দার মত তুইও···

উমা দ্রুত ঢুকে যায় নিজের ঘরে। হঠাৎ খিলটা বন্ধ করে। ভাস্কর পিছন থেকে ডাকে, উমা, এই উমা, শুনে যা—

ও-ঘর থেকে শিবনাথ বলে ওঠেন, আবার কে ফোন করল রে? খুকি! এই খুকি!

রুদ্ধ দ্বারের ও-পাশে শিবনাথের পঁচিশ বছরের খুকিটি কি করছে তা আর দেখতে পেল না ভাস্কর। সে পথে নামল।

## চার

পাইকপাড়ায় থাকার এই এক সুবিধা। ফাঁকা দোতলা বাসের সুবিধামত সীটে জানলা ঘেঁষে বসা যায়। ভাস্কর আরাম করে বসল তার সীটে। বাসটা ভর্তি হচ্ছে একে একে। ছাড়ার দেরি আছে। থাক। যখন হয় ছাড়বে। তাড়া কি? সারাটা রাতই তো সে থাকবে প্রদীপদের বাড়ি। আবার চিন্তার জগতে ডুব মারে সে।

না, উমা নয়, এখন সে যে মেয়েটির কথা ভাবছে সে মেয়েটির নাম রেবা সেন। এই তো ঘণ্টা-তিনেক আগে যার বাড়িতে শনিবারের অপরাহ্নটা কাটিয়ে এল ভাস্কর— অফিসের কাজে। রেবা সেন—গৌরাঙ্গী, সুন্দরী, অনিন্দ্য ফিগার—কে বলবে এক ছেলের মা এবং বয়স আটাশ—আটাশ বছর তিন মাস। অর্থাৎ ভাস্করের চেয়ে মাত্র সাত মাসের ছোট। সমবয়সীই বলা চলে। মক্কেলের বয়সটা ভাস্কর নির্ভুল ভাবে জানে। মক্কেলই। লেট-ল্যামেন্টেড ব্যবসায়ী বিকাশ সেনের ধর্মপত্নী শরণাপন্ন হয়েছিলেন মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র সলিসিটার্স-এর অফিসে। নিতান্ত বৈষয়িক প্রয়োজনে। স্বর্গত বিকাশ সেনের সম্পত্তির দখল নিতে। মিত্র অ্যাণ্ড মিত্রর সিনিয়র পার্টনার দায়িত্বটা দিয়েছিলেন ভাস্কর মুখার্জিকে। ফলে বারে বারে মক্কেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। স্বামীর যাবতীয় 'অ্যাসেট্স্'-এর সন্ধান যোগাড় করতে হয়েছে—ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, শেয়ার, ইন্সিওরেন্স পলিসি, ডিবেঞ্চার এবং স্থায়ী সম্পত্তি। কলকাতায় দুখানি বাড়ি, গাড়ি—ভল্টের কালো টাকা তো বটেই। রেবা সেন প্রথমটা স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু ভাস্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর সুড়সুড় করে সব খুলে দেখিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন তার উপর। রাউণ্ড অফ্ করলে সংখ্যাটা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যাতে ওয়েলথ্ ট্যাক্স এড়ানো অসম্ভব। কালো টাকা বাদ দিলেও। অথচ আশ্চর্য, সেটা এতদিন দাখিল করেননি ধুরন্ধর ব্যবসায়ী বিকাশ সেন। এই সূত্রেই রেবা সেন পুরোপুরি ধরা দিলেন ভাস্করের কাছে, ও-সব তো কিছুই জানি না আমি। উনি কোথায় কি রেখেছিলেন তা কি আমি খোঁজ নিয়েছি কোনদিন?

: কিন্তু এখন তো দেখছেন? সব কিছুর উপর প্রবেট নিতে গেলে ওয়েলথ্ ট্যাক্স দিতেই হবে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টগুলো অন্তত জয়েণ্ট নামে করেননি কেন?

: কতবার বলেছি ওঁকে—চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিলেন সদ্য-বিধবা। সে অশ্রু স্বামীর বিয়োগে, না তাঁর মূর্খতায়, সেটা সমঝে উঠতে পারেনি ভাস্কর।

কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল না করে পারেনি। রেবা সেন অত্যন্ত সুন্দরী, উচ্চ-শিক্ষিতা, যাকে বলে অ্যাকমপ্লিশড্! তাঁর পিতৃকুলও অর্থবান। পিতা নেই—কিন্তু কাকারা আছেন। তাঁরাও টাকার কুমির। এ-ক্ষেত্রে এই মহিলাটি কেন বিবাহ করেছিলেন ঐ বিকাশ সেনকে—বয়সে যিনি ছিলেন ওঁর চেয়ে বিশ বছরের বড়? মাথায় দুই-ইঞ্চি ছোট? কী পেয়েছেন ঐ মহিলা? একটি পুত্র এবং লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি ছাড়া?

ভাস্কর বাধ্য হয়ে বলেছে, কাঁদছেন কেন? কান্নার কি আছে? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি তো আছি—

মহিলা অশ্রু-আর্দ্র দুটি চোখ ওর মুখের উপর মেলে বলেছিলেন, শুধু আপনার ভরসাতেই আমি এ বিপদে বুক বেঁধেছি ভাস্করবাবু। আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

: করব কথা দিচ্ছি। প্রথমেই বলি, আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না—

তা গোপন কিছুই করেননি রেবা সেন। কিন্তু খুলে দেখাতে যাবার ঐ এক বিপদ— এদিকটা খুলতে গেলে ওদিকটা আপনিই খসে পড়ে। বৈষয়িক জীবন যে দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় শুনতে শুরু করেছিলেন মহিলার বৈষয়িক সমস্যা—তা থেকে ওঁদের পারিবারিক ইতিহাস—তা থেকে ক্রমে ঐ পূর্ণযৌবনা রমণীর দাম্পত্যজীবনের বঞ্চনার ইতিকথা। পৌঢ় স্বামী ওঁর সব চাহিদা মিটিয়ে দিতে পারতেন না—আর তার তির্যক ফল হয়েছিল এই যে, স্ত্রীকে বিশ্বাসও করতে পারেননি। সব কিছু লুকাতে চাইতেন সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর কাছ থেকে। প্রথমপক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়কথা থেকে ব্যাঙ্কের পাসবই।

ভাস্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, বিকাশবাবু আপনাকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করেছিলেন? কই সে কথা তো বলেননি?

: বলিনি? তবে বলতে ভুলে গেছি। হ্যাঁ, দ্বিতীয় পক্ষে।

এরপর আর প্রশ্ন না করে থাকতে পারেনি ভাস্কর, কিন্তু কেন বলুন তো?

: কী কেন?

: আপনার মত এত সুন্দরী, এত অ্যাকমপ্লিশড্ একটি মহিলা—

: থ্যাংকস ফর দ্য কমপ্লিমেণ্টস! সে আর এক দুর্ভাগ্যের কথা! বাইরের লোককে তা বলা যায় না।

: বাইরের লোক? আমাকে আজও তাই ভাবেন আপনি?

: ভাবব না? আমরা বন্ধু নই আজও। আপনি উকিল, আমি মক্কেল—

: কিন্তু তার বাইরেও তো আমাদের ব্যক্তিসত্তা আছে মিসেস সেন? আমরা কি বন্ধু হতে পারি না?

রেবা সেন হেসে বলেছিলেন, কি করে হব বলুন? একতরফা আমি কতটা আগাতে পারি? আপনি এখনও 'আপনি-আজ্ঞে' করছেন, আপনার চোখে আমি এখনও মিসেস্ সেন—

ভাস্কর মরিয়া হয়ে মেয়েটির মকরমুখী রুলিপরা হাতটা তুলে নিয়ে বলেছিল, আমারই ভুল, রেবা। এবার বল, কেন ঐ বিকাশবাবুকে বিয়ে করেছিলে? ভালবেসে?

আরও দিন সাতেক পরের কথা—

রেবা সেন-এর শয়নকক্ষেই ওকে পৌঁছে দিল ঝিটা। বললে, মায়ের শরীরটা খারাপ, আপনাকে উপরের ঘরে যেতে বললেন।

এ-ঘরে ইতিপূর্বে ভাস্কর আসেনি। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল রেবা শুয়ে আছে খাটে। গায়ের উপর চাদর। বললে, কী ব্যাপার? শরীর খারাপ শুনলাম?

: হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে একটু ; ও কিছু নয়। বস, কী খাবে বল?

ভাস্কর এগিয়ে এসে ওর জ্বরতপ্ত কপালে হাত রাখল, গালে হাত দিয়ে দেখল। বললে, তোমার জ্বর, আর আমি বসে বসে খাব?

: জান না—শরৎবাবু বলেছেন—পুরুষদের সামনে বসিয়ে খাওয়াতে পারলে মেয়েমানুষ আর কিছু চায় না?

: তাই বুঝি? তবে খাওয়াও! ডাক তোমার বামুনদিদিকে।

পরের সপ্তাহে—

রেখার জ্বর ছিল না বটে, তবু পরিচারিকা ওকে নিয়ে গেল উপরের ঘরে। সে-ও কোন কৈফিয়ৎ দিল না এবার, ভাস্করও সেটা দাবী করল না। সোজা এসে ঘরে ঢুকে নিজে থেকেই বললে, কী খাওয়াবে বল? তোমার প্রবেট পাওয়া গেছে। এখন সব সম্পত্তির মালিক শ্রীমতী রেবা সেন।—ফাইলটা সে বাড়িয়ে ধরে ওর সামনে।

: সত্যি?—উঠে আসে রেবা সেন। ফাইলটা ওর হাত থেকে নেয়। তাকিয়েও দেখে না। ছুঁড়ে ফেলে খাটের উপর। ভাস্করের দুটি হাত নিজের মুঠিতে ধরে বলে, বল কী খেতে চাও? আজ যা চাইবে তাই খাওয়াব!

: যা চাইব? আমি যদি এমন কিছু চাই যা বামুনদিকে অর্ডার দিয়ে আনানো যায় না? যা এখানেই আছে? আমার থেকে হাতখানেক দূরে?

অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গি করে রেবা সেন বলে, বুঝলাম না! কিসের কথা বলছ?

ভাস্কর একবার পিছন ফিরে দেখে নিল—হ্যাঁ, পরিচারিকা ওকে পৌঁছে দিয়েই বেরিয়ে গেছে। ভাস্কর নিজের হাত দুটো ছাড়িয়ে নেয়। বেষ্টন করে ধরে ঐ মেয়েটির দেহ। ওর মুখটা নত হয়ে আসে। রেবা সেন মুখটা সরিয়ে নেয় না। ঊর্ধ্বমুখে প্রতীক্ষা করে সে নিমীলিত নেত্রে—প্রত্যাশিত উষ্ণ স্পর্শ—

: আপনার টিকিট হয়েছে স্যার?

: ও হ্যাঁ। না হয়নি। কালিঘাট!—মানিব্যাগ খুলে ভাস্কর পয়সা বার করে।

টিকিট দিয়ে কণ্ডাক্টর এগিয়ে যায়। এতক্ষণে ভিড় হয়েছে বেশ। বাসটা এসপ্ল্যানেড ছাড়লো।

…কী যেন ভাবছিল সে? ও হ্যাঁ, রেবা সেনের কথা।

মেয়েটা সেদিকে সেয়ানা। কোথায় থামতে হবে, তা জানে। যতই শিক্ষিতা হক, ও তো ভারতীয়। একটা আমেরিকান কিম্বা ইউরোপের মেয়ের কাছে পুরুষমানুষের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া আর তাকে বিবাহ করা দুটি সম্পূর্ণ সম্পর্কবিমুক্ত প্রশ্ন। এমন মেয়ে সে দেশে অঢেল, যারা বলবে—ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে আমার আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে; কিন্তু ওকে বিয়ে করতে পারব না কোনদিন। এ দেশের মেয়েরা ও-ভাবে ভাবতে তৈরী নয়। তাদের শয্যার 'ভিসা' তখনই ইশু করা হয় যখন ও-পক্ষ বিবাহের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ পাসপোর্টখানি দাখিল করতে সক্ষম। এজন্য ভাস্কর রেবাকে দায়ী করতে পারেনি। ক্রমে সে প্রশ্নও উঠল—উঠল কিন্তু সেই বৈষয়িক প্রসঙ্গ থেকেই। উকিল-মক্কেল সম্পর্কের ভেক ধরে! ভাস্কর বলেছিল, তোমার অত টাকা কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টে রাখার তো কোন দরকার নেই রেবা! সেভিংস-এ বদল করে নাও না। সুদ পাবে—

রেবা হেসে বলেছিল, আমার একটি মাত্র সন্তান। তার ব্যবস্থা তো করাই আছে। অত টাকা শুধু শুধু জমিয়ে রেখেই বা কী লাভ?

: তবে কী করবে?

: খরচ করব! আর বছর দেড়-দুইয়ের মধ্যেই তো হয়ে যাব উত্তরত্রিশ!

ভাস্কর গম্ভীর হয়ে বলেছিল, ওঃ! তা একা মানুষ অত টাকা খরচই বা করবে কী করে? মদ ধরবে, না রেস খেলবে?

: কেন, দেশ দেখেও তো খরচ করা যায়? চল না দুজনে কাশ্মীর ঘুরে আসি?

: কাশ্মীর। দুজনে? সেখানে আমি কী পরিচয়ে যাব?

: লোকের কৌতূহল আর হোটেলের খরচা কমাতে চাইলে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে। তোমার আপত্তি আছে?

ভাস্কর গম্ভীরভাবে বলেছিল, আছে। এক বিছানায় শুয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারব না আমি।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল রেবা। বলে, বেশ, তাহলে আমার বন্ধুর পরিচয়েই চল। আলাদা ঘরে শোবে।

ভাস্কর মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, না। যদি যাই তবে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই যাব। আর সেটা মিথ্যা পরিচয় হবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে রেবা বলেছিল, ভাস্কর! ছেলেমানুষি করো না—তুমি নিজেই বলেছ তোমাদের ফ্যামিলি খুব কন্‌সার্‌ভেটিভ। তোমার বাবা এই অপরাধে তোমার দাদাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন, মেয়ের বিবাহ সুপাত্র পেয়েও দেননি। তোমার বাবা···

: টু হেল উইথ মাই ফাদার!—রুখে উঠেছিল সেদিন ভাস্কর মুখার্জি।

: আমি শুধু কায়স্থই নই, আমি বিধবা, আমার সন্তান আছে—

: আই নো, আই নো—পদচারণা করতে করতে সিগ্রেট ধরিয়েছিল ভাস্কর।

···ঐ যাঃ! বাসটা কালিঘাট স্টপেজ পার হয়ে রাসবিহারীর মোড়ের দিকে চলতে শুরু করল যে! ভাস্কর চট করে উঠে পড়ে। এর পা মাড়িয়ে, ওকে কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

পিছন থেকে কে যেন বলে—দাদা কি এতক্ষণ খোয়াব দেখছিলেন নাকি?

## পাঁচ

সলিল লাহিড়ীকে ওখানে দেখতে পাবে এটা আশা করেনি ভাস্কর। ওকে দ্বারপথে দেখতে পেয়ে প্রদীপ বললে, শেষ পর্যন্ত আসতে পারলি তাহলে? আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

প্রদীপ পাত্রের বৈঠকখানা। রাত আটটা। টিপয়ে ব্ল্যাক-নাইটের বোতল, সোডা, গ্লাস, স্ন্যাকস্‌। সলিল আর প্রদীপ অনেকক্ষণ আসর জমিয়েছে মনে হয়। ভাস্কর বললে, তুই আজকাল বাড়িতেই চালাচ্ছিস? মেসোমশাই···

: মেসোমশাই, মাসীমা ইত্যাদি আজ পাঁচ মাস এ-বাড়ি ছাড়া। বাবার অ্যাক্‌সিডেন্টের পর থেকেই ওঁরা দেরাদুনে।

ভাস্করের মনে পড়ে গেল সব কথা। ভুলে গিয়েছিল। ভারতী প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য শ্রীযশোদারঞ্জন পাত্রের মোটর-দুর্ঘটনার কথা মাসছয়েক আগে কাগজে দেখেছিল বটে। ভেবেছিল খোঁজ নেবে, নেওয়া হয়নি। লোকপরম্পরায় শুনেছিল তিনি বেঁচে গেছেন এ-যাত্রা। একটু অস্বোয়াস্তি বোধ করল ভাস্কর। তার বাবা শিবনাথের থ্রম্বোসিস-এর সময় প্রদীপ দিবারাত্র ছুটোছুটি করেছে—অযাচিত ধার দিয়েছে। অবশ্য হয়ত শিবনাথ শুধু ভাস্করের জনক বলে নয়, হয়তো তিনি তাঁর কন্যার জনক বলেই—

: তুই আজকাল কোথায় থাকিস রে হতভাগা? বিকেল বেলা? সন্ধ্যেবেলা?—প্রশ্ন করে সলিল।

: তোর মত বিয়ে করলে বউ-এর আঁচল ধরে থাকতুম।

: জানি রে শালা, জানি—বিয়ে করিসনি তাই মক্কেলের আঁচল ধরে বসে থাকিস?

ভাস্কর অবাক হয়। বলে, মক্কেলের আঁচল? তার মানে?

গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে সলিল বললে, শালা যেন আকাশ থেকে পড়ল! উটপাখি রে আমার! বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবছে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না! এদিকে যে টি-টি পড়ে গেছে তা খেয়াল নেই।

প্রদীপ বলে, ঝাঁট দে ওসব বাজে কথা। বল ভাস্কর, বল কি খাবি?

: কি খাবি মানে? হুইস্কি খাব! আবার কি!

একটু পরে প্রদীপ বললে, ভাস্কর, এবার কাজের কথায় আসি ভাই। যে জন্য তোকে ডেকেছি। ঘটনাচক্রে আমি একটা প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি। বস্তুত জীবন-মরণ সমস্যা। আমার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে এর উপর।

ভাস্কর গম্ভীরভাবে বলে, বেশ বল।

প্রদীপ্ত আনুপূর্বিক সব কথা খুলে বলে :

ভারতী প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ যশোদারঞ্জন কোনকালেই পুত্রকে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং দায়িত্বশীল বলে মনে করেননি। ক্যাশ রাখতে দিয়েছেন, লেখকদের বাড়িতে ওকে পাঠিয়েছেন, পুস্তক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও পাঠিয়েছেন—কিন্তু যাকে বলে 'পলিসি-ম্যাটার' তার মধ্যে ওকে ঢুকতে দেননি। দিতে বাধ্য হলেন নিজে মোটর-দুর্ঘটনায় পড়ার পর। তাও দিলেন শর্তসাপেক্ষে। ছেলের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে এক লক্ষ টাকা দিয়ে বলেছেন তিনি ছয় মাস পরে হিসাব-নিকাশ নেবেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর যদি দেখেন প্রদীপ ব্যবসায়কে উন্নততর না করে লোকসানের দিকে নিয়ে গেছে, তা হলে—যশোদারঞ্জনের সাফ জবাব—ভারতী প্রকাশনের গুড-উইল তথা প্রেস উনি একটি ট্রাস্টিকে দিয়ে যাবেন। প্রদীপ পাবে বসত-বাড়ি, গাড়ি এবং ফিক্সড ডিপোজিটের কিছু টাকা। যশোদারঞ্জনের মতে, 'ভারতী প্রকাশন'-এর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে বাঙলা সাহিত্যে—শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ থেকে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত সকলের উপন্যাসই এককালে ছাপা হয়েছে ভারতী প্রকাশন থেকে—একাধিক সাহিত্যিককে বাঙলা সাহিত্যের আসরে নামিয়ে বলেছে—'আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে'। এ প্রকাশনার মর্যাদা জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে জড়িত।—অযোগ্য পুত্রের অকর্মণ্যতার দোষে তিনি এই প্রকাশন-সংস্থাকে ডুবতে দেবেন না। প্রদীপ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু দুর্বুদ্ধি চাপল ওর মাথায়। রাতারাতি ও যুগান্তকারী কিছু একটা করে বসতে চাইল। সুযোগও এসে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। প্রদীপ হঠাৎ স্থির করে বসল—মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার!

বাঙলাদেশের মৈমনসিং থেকে একটি ছেলে ওকে এনে দিল একটা বই। তার কপি-রাইট নাকি কিনেছিলেন ছেলেটির বাবা। বইটি পুনঃপ্রকাশের কপি-রাইট সে ভারতী প্রকাশনকে বেচতে ইচ্ছুক।

অদ্ভুত বই। নাম 'সাগর-সঙ্গমে'। লেখক : অপ্রকাশ গুপ্ত। বইটি ঢাকা থেকে 1935 সালে প্রকাশিত। মাত্র পাঁচশ কপি নাকি ছাপা হয়েছিল। আর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বাজেয়াপ্ত হয় কলকাতায়। রায় দিয়েছিলেন ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এল. কে. জনসন, আলিপুর কোর্টে। রায়দানের তারিখ 18.5.1935। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর

রায়ে প্রকাশক আবদুল রেজাক এবং মুদ্রাকর মহম্মদ বারিকে পঁচিশ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে এক-এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন এবং সমস্ত বই চল্লিশ বছরের জন্য বাজেয়াপ্ত করেন—অর্থাৎ চল্লিশ বছরের মধ্যে এই গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ বা বিক্রয় বন্ধ করে দেন। লেখকের বিরুদ্ধে কিছু করা যায়নি, কারণ গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই লেখক অপ্রকাশ গুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রদীপ কৌতূহলী হল ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের রায়ের নকল পড়ে। প্রথমত চল্লিশ বছরের ঐ নিষেধাজ্ঞাটা তাকে উৎসাহী করে তোলে, দ্বিতীয়ত বিচারকের বক্তব্য। বিচারক তাঁর রায়ে বলছেন, "সব দিক বিবেচনা করে বইটিকে আমি 'অশ্লীল' বলে মনে করেছি—এখানে অশ্লীলতার সংজ্ঞা হিসাবে আমি ১৮৬৮ সালে 'হিকলিন্স-কেস্'-এ জাস্টিস ককবার্ণের মতামতকেই মেনে নিয়েছি, অর্থাৎ : 'আমি মনে করি, অশ্লীলতার বিচার এইভাবে হতে পারে—দেখতে হবে যেটাকে অশ্লীল বলে অনুমান করা হচ্ছে সেটা খোলা-মনের মানুষের অন্তরে কতটা প্রভাব বিস্তার করে তাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে…যাদের হাতে সেই বইটি পড়বে, যেসব অপরিণত-বয়স্ক নারী ও পুরুষের--এমন কি পরিণত-বয়স্কদেরও—তাদের অন্তরে কতটা অপবিত্র এবং অসচ্চরিত্রের মানুষের চিন্তাধারা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।' সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে অশ্লীলতা একটা দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বায়ব ধারণা নয়। ভিক্টোরীয় যুগে লোকে চেয়ার অথবা পিয়ানোর নগ্ন পায়াকে অশ্লীল মনে করে তা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত, শেক্সপীয়রের 'Who loves to *lie* with me under the greenwood tree' পংক্তিটিকে বদলে ছাপা হয়েছিল 'Who loves to *work* with me,' তাই আজকের দেশ-কালের কথা মনে করে এ গ্রন্থটিকে আমি অশ্লীল বলে রায় দিলেও—এ বই সর্বকালের ও সর্বদেশের পক্ষে অশ্লীল বলে আমি মনে করি না। আমার বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী তাই এ গ্রন্থটির প্রকাশ ও বিক্রয় আমি শুধুমাত্র চল্লিশ বছরের জন্য বন্ধ করে দিলাম।"

কৌতূহলী হয়ে প্রদীপ সেই বাজেয়াপ্ত বইটির একটি শতছিন্ন কপি আদ্যন্ত পড়ে ফেলল। অবাক হল। না, স্তম্ভিত হল। স্থির করল, এ বই তাকে প্রকাশ করতেই হবে। মাত্র পাঁচশ টাকা রয়ালটি দিয়ে গ্রন্থটির কপিরাইট সে কিনে নিল ঐ মুসলমান ছেলেটির কাছ থেকে—মৈমনসিংহবাসী আবদুল রজাকের পুত্র মক্‌বুলের কাছ থেকে।

তার ঠিক দেড় বছর আগে জাস্টিস মুখার্জী আপীলে বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'র বৃষ্টি'-কে অশ্লীলতা দোষ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। চল্লিশ বছরে দেশটা অনেক অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হেনরি মিলার-এর বই এখন কলকাতার সব খানদানি দোকানে বিক্রয় হয়—কেউ খোঁজ নিতে যায় না ; 'গুপ্তজ্ঞান' সিনেমা প্রদর্শন আজ বৈধ। সুতরাং—

তবু প্রদীপ সাবধানতা অবলম্বন করেছিল—এই তার প্রথম ও শেষ চেষ্টা। 'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।' সে স্থির করল রাতারাতি বাজার মাৎ করে দেবে। একবারে লাইনো-টাইপে ত্রিশ হাজার বই ছাপালো সে। ও জানত বইটি বাজেয়াপ্ত হলে ওর সমূহ সর্বনাশ। লাখ টাকার সবটাই যাবে। তাই ও এক বিচিত্র ব্যবস্থা করল। প্রাক-প্রকাশ বিজ্ঞাপনে বহু টাকা ব্যয় করল। যে বই বাজারে নেই তার দুর্নাম আর সুনামে সবাই যাতে মুখর হয়ে ওঠে, কৌতূহলে সবাই যেন পাগলা হয়ে থাকে। ও রটিয়ে দিল—কপিরাইট শর্ত অনুসারে 'ভারতী প্রকাশন' মাত্র ত্রিশ হাজার কপি ছাপাবার

অধিকারী। তারপর আর এ গ্রন্থ শর্ত-অনুসারে দশ বছর কেউ ছাপতে পারবে না। অর্থাৎ তোমরা যদি কিনতে চাও তাহলে এখনই কিনতে হবে। স্থির হল, ঠিক চল্লিশ বছর পরে 19.5.1975 তারিখে বইটি বাজারে ছাড়া হবে। এমন ব্যবস্থা করা হল যে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই—বড় জোর দু-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত বই প্রকাশকের বাঁধাই-গুদাম থেকে পাঠকের হাতে পৌঁছে যায়। প্রকাশক অগ্রিম নিয়ে বিক্রয় করলেন পুস্তক বিক্রেতাকে, পুস্তক-বিক্রেতা অগ্রিম নিয়ে গ্রাহক করলেন প্রকাশনের আগেই। স্থির হল, এক সপ্তাহের মধ্যেই দোকান খালি করে ফেলা চাই। এক ঢিলে তাতে অনেক পাখি মারা যাবে। প্রথমত ত্রিশ হাজার বই ছেপে বাঁধিয়ে দোকানে দোকানে পৌঁছে দিতে হলে অনেক টাকার মূলধন লাগে—সেটার পরিপূরক ঐ সদস্যদের অগ্রিম মূল্য মেটানো। দ্বিতীয়ত বই বাজারে না থাকলে কেউ সেটা 'অশ্লীল' বলে মামলা দায়ের করতে পারবে না। চেষ্টা করলেও কেউ রাতারাতি বইটি বাজেয়াপ্ত করাতে পারবে না। কারণ কোর্টের রায় বার হতে হতেই যাবতীয় সদস্যের হাতে বইগুলি পৌঁছে যাবে। তখন পুলিসের আর করণীয় কিছু থাকবে না। ত্রিশ হাজার বই থাকবে ত্রিশ হাজার পাঠকের হেপাজতে। সমস্ত রকম ভাবে আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হয়েছিল প্রদীপ ; কিন্তু পুলিস এক উল্টো চাল চেলে তাকে কাৎ করেছে। সোমবার উনিশে মে বইটি সমস্ত দোকানে একযোগে বিক্রি হওয়ার কথা—কিন্তু শনিবার সতেরই মে পুলিস গ্রেপ্তার করল বিশিষ্ট পুস্তক-ব্যবসায়ী বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্যকে! ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে প্রদীপ বলল, বল এখন কী করা যায়?

ভাস্করের গ্লাস ইতিমধ্যে খালি হয়েছিল। সেটা ভর্তি করতে করতে বললে, প্রথম কাজ জামিনে বিজয়বাবুকে ছাড়িয়ে আনা।

: সেটা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। সেইজন্যই তোকে অফিসে এবং পরে বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তোকে না পেয়ে সলিলকে ফোন করি।

সলিল বলে, আমি গিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু যতদূর শুনেছি, পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ইণ্টারিম ইনজাংশান চেয়েছে ঐ অশ্লীল বইটির বিক্রয় বন্ধ করে দেবার।

ভাস্কর বলে, কাল রবিবার, সোমবারের আগে সম্ভবপর নয়। হয়তো বারো আনা বই সোমবারেরর মধ্যেই বাজারে বেরিয়ে যাবে।

প্রদীপ বললে, আই ডাউট ইট্! ভুলে যাস নে কালকের খবরের কাগজে প্রকাণ্ড হেড-লাইন দিয়ে খবরটা ছাপা হবে। হয়তো সকালের রেডিওতে লোকাল নিউজেও শুনবে সবাই। ইতিমধ্যে আমার অফিসে দশ-বারোটা ফোন এসেছে খবরটার সত্যতা জানতে। বিজয়বাবুর মত প্রবীণ এবং শ্রদ্ধাভাজন পুস্তকবিপণীর মালিকের অবস্থা দেখে অনেকেই ঘাবড়ে যাবে।

ভাস্কর একটু ভেবে নিয়ে বলল, কার কোর্টে মামলাটা যাচ্ছে জানিস? আর কোন্ পুলিস ইন্সপেক্টর কেসটা চালাবে?

: যে ম্যাজিস্টেটের কাছে বইটির বিক্রয় স্থগিত রাখার আদেশ প্রার্থনা করে পুলিস দরখাস্ত করেছে তাঁর নাম খগেন্দ্রনাথ খাসনবীশ ; আর পুলিস-ইন্সপেক্টর-এর নাম নির্মল নিয়োগী।

ভাস্কর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বুঝলাম। তোমার ঘাড়ে স্বয়ং শনি চেপেছেন।

খগেন খাসনবীশ একটা যাচ্ছেতাই ম্যাজিস্ট্রেট—ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার রুগী, বিয়ে থা করেনি, সিঙ্গিমাছের ঝোল আর গাঁদাল পাতা খায়—দুনিয়ার যাবতীয় জিনিসের চেয়ে তার ছায়াটা ওর আগে নজর পড়ে। 'গোলাপ' শব্দটা শুনতেই ওর মনে পড়ে কাঁটার কথা, চাঁদের উল্লেখে তার কলঙ্কের, সূর্যাস্তের প্রসঙ্গ উঠলে মশার! ধর্ম-ধর্ম বাতিক আছে, আধুনিক কোন কিছুই দুচক্ষে দেখতে পারে না। স্বপাক খায়, নেশা-ভাঙ নেই—

প্রদীপ বললে, আচ্ছা ক্যান্টাংকোরাস্ লোক তো! তুই এত খবর পেলি কোথায়?

: খবর রাখতে হয় ব্রাদার। আর দু-নম্বর খবর হচ্ছে নির্মল নিয়োগী লোকটা আমাদের চেয়ে দু-বছরের সিনিয়ার। ল-কলেজে আমাদের বিরুদ্ধবাদী ইউনিয়নের পাণ্ডা ছিল। পলিটিক্যাল কারণে আমি আর সলিল ওর শত্রু ছিলাম। সুতরাং সেখানেও চিঁড়ে ভিজবে না।

প্রদীপ আরও হতাশ হয়ে বলে, সুতরাং আমাকে কী করতে বলিস?

: তুমি শালা গভীর গাড্ডায় পড়েছ! তোমাকে প্রথম পরামর্শ দেব, টাকার মায়া ত্যাগ করে একেবারে এক নম্বর কোন ব্যারিস্টারকে 'বুক' করা। শঙ্করদাস অথবা করুণাশঙ্করকে—করুণাবাবু সম্প্রতি 'রাত ভ'র বৃষ্টি'-কে বাঁচিয়েছেন। সলিল কি বলিস?

সলিল লাহিড়ী মতামত দেবার আগেই প্রদীপ বলে ওঠে, ভাস্কর, তোর এই পরামর্শ দেওয়ার আগেই আমি মনস্থির করেছি। আমার ডিফেন্স কাউন্সিলার নির্বাচন সেরে রেখেছি।

: তবে তো ল্যাটা চুকেই গেছে। তাঁর ঘাড়ে সব দায়িত্ব দিয়ে ফেল্।

: তাই তো দিচ্ছি। আমার কাউন্সিলার মেসার্স ভাস্কর মুখার্জি অ্যাণ্ড সলিল লাহিড়ী। তাঁদের স্কন্ধেই তো—

ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী পাগলামি করছিস্! এ কি ছেলেমানুষী করার ব্যাপার? কেসটার গুরুত্ব—

: ভাস্কর! কেসটার গুরুত্ব আমার চেয়ে আজ কেউ বেশি বুঝছে না। আমার সব কিছু আমি স্টেক্ করেছি। আমার সমস্ত সঞ্চয়, বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, তাঁর সম্পত্তিতে আমার উত্তরাধিকার—আমার জীবিকা এবং জীবন! অচেনা কারোও হাতে আমি তা অর্পণ করে শান্তি পাব না। তোরা দুজনে আমাকে ভালবাসিস। আমার সঙ্গে দরকার হলে মরতে রাজী! তাই তোদের ওপরেই এ দায়িত্ব আমি দিতে চাই।

ভাস্কর সলিলের দিকে ফিরে বলে, এ কী পাগলামি বল দেখি—এ কখনও হয়?—তুই আমি দুজনেই চাকরি করি, প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করি না—

সলিল বললে, সন্ধ্যে থেকে সেই কথাই তো বোঝাবার চেষ্টা করছি আমি। এ শালা জিদ ধরে বসে আছে—কোনও কথা শুনবে না।

প্রদীপ বলে, শোন্—আমার সমস্ত প্রস্তাবটা পেশ করি। তাহলেই বুঝবি।

প্রদীপ সব কিছুই ভেবে রেখেছে। তার প্রস্তাবটা এমন কিছু দুর্বোধ্য নয়। সে জানে ভাস্কর এবং সলিল, ওর দুই প্রাণের বন্ধু, তাদের বর্তমান চাকরিতে সন্তুষ্ট নয়। ওরা দুজনেই একটা স্বাধীন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান খুলতে চায়। নানান বাধার সম্মুখীন হয়ে তারা সে মনোবাসনা মনেই চেপে রেখেছে। প্রদীপ তার এই জীবন-মরণ সমস্যার মুখোমুখি হয়ে খুলে দিতে চাইছে সেই বাধার লক্‌গেট। প্রদীপের দৃঢ় বিশ্বাস—ঐ লক্‌গেটের ডালা একবার খুলে দিতে পারলে ওর দুই বন্ধুর প্রতিভার বন্যায় ভেসে যাবে প্রদীপের

সমস্যাগুলো। কী ভাবে লক্‌গেটের ডালা খুলবে? শোন তোমরা ; এক নম্বর—প্রদীপ এখনই ওর অফিসের একটি ঘর ছেড়ে দিচ্ছে—'মুখার্জি অ্যাণ্ড লাহিড়ী, সলিসিটার্স ফার্ম'-এর অফিস বসবে সেখানে। টেলিফোন দেবে, একটা গাড়ি দেবে, অফিসের যাবতীয় ব্যয়ভার মেটাবে। মামলার যাবতীয় খরচ তো দেবেই—ভাস্কর আর সলিল বর্তমানে যা মহিনা পাচ্ছে সেই হারে ও দিতে থাকবে যতদিন কেস চলে। বলা বাহুল্য, নিচু আদালতে হার হলে ও হাইকোর্টে যাবে, হয়তো তার উপরেও যাবে—অর্থাৎ বছর দুই-তিন ধরে চলবে এ মামলা। হারলেও এই দুই তিন বছরে 'মুখার্জি অ্যাণ্ড লাহিড়ী' কোম্পানি বিখ্যাত হয়ে যাবে। আর জিতলে? বইয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশ শতাংশ ও দেবে মুখার্জি অ্যাণ্ড লাহিড়ী কোম্পানিকে। বিশ টাকা দামের ত্রিশ হাজার বই, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশ শতাংশ বলতে ওরা এক-একজনে পাবে ত্রিশ হাজার টাকা।

: কেমন রাজী?

সলিল এবং ভাস্কর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

সলিল বললে, দ্যাখ প্রদীপ, তুই যে অফার দিচ্ছিস তা আমার কাছে 'জ্যাকপট্'। আমি আমার অফিসের নরককুণ্ড থেকে বের হবার রাস্তা খুঁজছি আজ পাঁচ বছর। স্বাধীন ব্যবসা আমার স্বপ্ন—সেই স্বপ্ন সফল করার পথে ছিল নানান বাধা। তুই এক ফুৎকারে সব বাধা সরিয়ে দিয়েছিস। ফলে আমার রাজী না হওয়ার কোন অর্থ নেই। আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা একটা দুর্লভ সুযোগ : কিন্তু তবু আমি এ প্রস্তাবে রাজী নই। কেন জানিস? তোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তুই আমার বন্ধু। প্রাণের বন্ধু। তোর ভালও আমাকে দেখতে হবে। তুই যা করতে চাইছিস—সেটাতে বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য। ভাস্কর এবং আমি—আমরা দুজনেই নভিস্। এতবড় দায়িত্ব নেওয়া আমাদের উচিত হবে না। তুই কি বলিস ভাস্কর?

এবারেও ভাস্করকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে প্রদীপ বলল, একটা কথা বলি—আমি কিন্তু নাবালক নই। এ সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি প্রথম 'সিপ' গলায় ঢালার আগে—ভেবে-চিন্তে, বুঝে-সুঝে। ল-পয়েন্টে তোমরা কনসাল্ট করতে কোনও সিনিয়ারকে দলভুক্ত করতে চাও কর—আমি খরচ করতে পিছপাও নই ; কিন্তু আমি লড়ছি শুধু আমার জীবন আর জীবিকার জন্য নয়—লড়ছি একটা আদর্শের জন্য। বাক্-স্বাধীনতার জন্য। সাহিত্যসৃষ্টিকারীর স্বাধীনতার জন্য। সে জন্য আমি চাই এমন লোক যে আমার বিশ্বাসভাজন—যে মামলার জন্য মামলা লড়বে না, আদর্শের জন্য লড়বে। বল ভাস্কর, কী বলবি?

ভাস্কর বললে, এতবড় কথাটা যখন বললি প্রদীপ, তখন আমি আর 'না' বলতে পারি না। তবু একটা মস্ত 'কিন্তু' আছে। বাক্-স্বাধীনতা নিশ্চয়ই চাই—মাইণ্ড য়ু, এখন আমি অ্যাকাডেমিক ডিসকাশেন করছি—কিন্তু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে অশ্রাব্য খিস্তি করার অধিকার আমি তাই বলে কাউকে দিতে নারাজ। আদর্শগত কারণে যদি আমাকে লড়তে হয় তবে প্রথম শর্ত হচ্ছে, আমি আগে বইটা পড়ি। দেখি আমার মতে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য কি না। যদি হয়, তবে আমিই এ প্রস্তাবে রাজী। নচেৎ নয়।

প্রদীপ অবাক হয়ে বললে, সে কি রে? তুই এখনও পড়িসনি?

: কি করে পড়ব বল? বইটা কি বাজারে বেরিয়েছে?

: বাজারে বের হয়নি, কিন্তু তোর বাড়িতে পৌঁছেছে। রেজিস্ট্রি বুক পোস্টে। আমি

এ পর্যন্ত মাত্র সাতাশখানি কম্প্লিমেন্টারি কপি ছেড়েছি—আমার বিশিষ্ট বিশ্বাসভাজন বন্ধুদের। সলিল তার কপি পেয়েছে।

: দুর্ভাগ্যবশত আমি এখনও পাইনি। পোস্টাল গণ্ডগোল নিশ্চয়।

: পোস্টাল গণ্ডগোল নয়। গণ্ডগোল অন্যত্র—

প্রদীপ তার টেবিলের টানা ড্রয়ার থেকে একটি ফাইল বের করে। পাতা উল্টে একটি কাগজ মেলে ধরে। তাতে গাঁথা আছে 'অ্যাকনলেজমেন্ট ডিয়ু' স্লিপটা। স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে প্রাপকের সইটা। তারিখ তিনদিন আগেকার। সই করেছে উমা।

ভাস্কর বললে, ঠিক আছে। তাহলে বাড়িতেই আছে বইটা। কাল রবিবার আমি পড়ব। সোমবার জানাব।

: না। আজ রাত্রেই তোকে পড়তে হবে। আমার এখানে। আর হুইস্কি খাস নে তুই।

প্রদীপ টানা ড্রয়ার থেকে বের করে আনে আর এক কপি বই। ভাস্কর উল্টেপাল্টে দেখে। 'সাগর-সঙ্গমে'। লেখক—অপ্রকাশ গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ—মে, 1935, ঢাকা। পুনর্মুদ্রণ—মে, 1975, কলকাতা। টাইটেল পেজ-এর পরে জাস্টিস্ জনসনের রায়ের একটা অংশ মুদ্রিত—সেই যেখানে উনি বলেছেন, বইটিকে কেন উনি সর্বকালের জন্য 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করেননি। প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত 'নিবেদনে' বলা হয়েছে—কিছু মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন করা ছাড়া প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের আদ্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশক আশা রাখেন, এই চল্লিশ বছরে দেশ, জাতি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে স্বর্গীয় লেখক অপ্রকাশ গুপ্ত নর-নারীর যৌনজীবনের একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে বসে এক শাশ্বত সত্যে উপনীত হয়েছেন। এখানে সাহিত্য-রস নিঃসন্দেহে তথাকথিত 'অশ্লীলতার' গণ্ডি ছাড়িয়ে এক নতুন জীবনদর্শনের তীর্থে উপনীত হয়েছে।

বইটা নেড়ে-চেড়ে ভাস্কর বললে, মোদ্দা বিষয়বস্তুটা কী?

জবাব দিল সলিল লাহিড়ী। বইটা সে খুঁটিয়ে পড়েছে। বললে :

বইটি নায়িকার জবানীতে লেখা। অর্থাৎ লেখক নায়িকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব কিছু দেখেছেন ও লিখেছেন। লেখক 'আমি' হয়েছেন নায়িকারূপে। কাহিনীর নায়িকার নাম তটিনী। সে রূপোপজীবিনী। ঢাকায় দেহ-ব্যবসায়ে সে দিন-গুজরান করত। বারবনিতার কন্যা, বারাঙ্গনার পাড়ায় মানুষ। তার বাল্য এবং কৈশোর ঐ ক্লেদাক্ত পরিবেশে কেটে গেছে। লেখাপড়া শেখেনি—অক্ষরপরিচয় হয়েছিল মায়ের কল্যাণে। বলা বাহুল্য পিতৃপরিচয় নেই। খুব ভাল গান গাইতে পারে। সুন্দরী। মাত্র পনের বছর বয়স থেকেই মা-মাসিদের ব্যবস্থাপনায় সে উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে। একুশ বছর বয়সে একটি সন্তান হয়। বাঁচেনি। তারপর কী একটা ওষুধ খেয়ে সে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। বাঁচে, তবে জননী হবার অধিকার হারায়। এতে নিশ্চিন্ত হয় ওর মা-মাসি। এমনকি তটিনীও। এবার নির্ঝঞ্ঝাট। পনের থেকে ত্রিশ—এই পনের বছরে সে নানান জাতের, নানান বয়সের, নানান মেজাজের পুরুষের সংস্পর্শে এসেছে—ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙালী, মগ, এমনকি কাবুলিওয়ালা। তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা শুনিয়েছে তটিনী—সহজ সরল ভাষায়—অলঙ্কার-বর্জিত সারল্যে—যেন মনে হয়, লেখক অশিক্ষিতা একটি বারবনিতার জবানবন্দী 'লংহ্যাণ্ডে' টুকে নিয়ে তা ছেপেছেন। অন্তত ভাষায় তাই মনে হয়। ঐ পরিবেশে এমন কতকগুলি শব্দ প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয় যার অর্থ সর্বজনবোধ্য—অথচ অভিধানে যা খুঁজে পাওয়া যায় না। নজর করলে হয়তো পাবলিক ল্যাট্রিনের দেওয়ালে তাদের সন্ধান মেলে।

তটিনীর অকপট স্বীকারোক্তিতে মাঝে মাঝে সেই সব নিষিদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুদ্রিত অবস্থায় শব্দগুলি নিঃসন্দেহে অশ্লীল—দেশকালের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে—কিন্তু যে পরিবেশে, যে অবস্থায়, যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে তটিনী শব্দগুলি ব্যবহার করেছে সেখানে সেগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়। তার মার্জিত রূপই বরং বিসদৃশ লাগত। শব্দগুলি পরিবর্তিত হলে তটিনীর জবানবন্দীতে সেগুলি বেখাপ্পা মনে হত। কেমন জান? ধর আকবর লেঠেল পল্লীসমাজে বলতে চাইছে : 'দিদি-ঠাকুরুণ, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল খাটতে পারি, ফৈরিদি হব কোন কালামুয়ে', অথচ শালীনতার সংজ্ঞা মেনে শরৎবাবু লিখলেন, 'জ্যেষ্ঠা ভগ্নী! তোমার আদেশে আসামীরূপে দশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে পারি, কিন্তু বাদী হব কোন দগ্ধাননে?'

ভাস্কর বাধা দিয়ে বলে, তবু আমি বলব সলিল, ঐ যুক্তিতে আমি ছাপার অক্ষরে ঐসব নিষিদ্ধ অশ্লীল শব্দ বরদাস্ত করতে রাজী নই।

সলিল বললে, ভুল করছিস ভাস্কর। আমার মুখে শুনে তুই রায় দিতে পারিস নে। তুই নিজে পড়, পড়ে দেখ, বোঝ। তারপর বলিস।

ভাস্কর স্বীকার করে। হ্যাঁ, তার ভুলই হয়েছে। সাহিত্যের বিচার তার 'পাঠে'। সমালোচকের সুপারিশে নয়।

প্রদীপ বললে, এইমাত্র তুই যে ভুলটা করলি ভাস্কর, তার কারণটা তলিয়ে দেখ—তাকে বলে 'সংস্কারের কৈঙ্কর্য'। প্রচলিত ধারণায় তোর মন আগে থেকেই সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে বলেই—না পড়ে তুই মতামত প্রকাশ করলি। খোলা মন নিয়ে আগে বইখানা পড়—

সলিল উঠে পড়ে। বলে, আমি চলি ভাই। অনেক রাত হয়ে গেছে। ভাস্কর তিনশ পাতার বই রাতারাতি শেষ করবে। আসর সকাল সকাল ভাঙাই ভাল।

প্রদীপ বলে, তুইও থেকে যা না।

সলিল হেসে বলে, ভো নির্লাঙ্গুলৌ শৃগালৌঃ! তোমরা ভুলে গেছ আমার জন্য বাড়া ভাত আগলে একটি রমণী অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন—

সলিল চলে গেল। প্রদীপ বলল, আয় খেয়ে নিই।

: চল।

খেতে খেতে অন্যান্য প্রসঙ্গ এল—যশোদারঞ্জন এখন কেমন আছেন, কবে ফিরবেন। এদিককার খবরও। উমা কেমন আছে, ভাস্কর কি বিয়ের কথা ভাবছে—

হঠাৎ ভাস্কর মনস্থির করে ফেলে। সবটা নয়, কিছুটা ভাঙবে বন্ধুর কাছে। প্রদীপ ওর প্রাণের বন্ধু। দেখাই যাক না, সে কী পরামর্শ দেয়। ঘনিষ্ঠতা কতদূর হয়েছে সেটা পুরোপুরি স্বীকার না করেও ভাস্কর তার নূতন মক্কেলের সংবাদটা জানায়। আদ্যোপান্ত সবটা শুনে প্রদীপ বললে, আসলে প্রবলেমটা আমার মাথায় ঢুকছে না। তুই বলছিস—মেয়েটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, অ্যাকমপ্লিসড, বলছিস অগাধ সম্পত্তির মালিক। তাছাড়া তোরা দুজনেই দুজনকে ভালবেসেছিস—এক্ষেত্রে বাধাটা কোথায়?

: রেবা কায়স্থ, বিধবা এবং একটি সন্তানের জননী—

প্রদীপ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। একটু ভেবে নিয়ে বললে, বিধবা এবং একটি সন্তানের জননী এ দুটোকে কোন বাধাই মনে করি না আমি। তবে কায়স্থ বলে যদি তোর ব্রাহ্মণত্বের অভিমান—

ভাস্কর বাধা দিয়ে বলে, প্রদীপ তুই তো জানিস—ওটাকে বাধা বলে আমি আদৌ মানি না।

: তাহলে বাধা কোথায়?

: বাধছে আমার পারিবারিক সম্পর্কে। বাবা অত্যন্ত রক্ষণশীল, এটা কিছুতেই মেনে নেবেন না। বড়দার কথা তো তুই জানিসই—

: জানি। কিন্তু চিন্তা করে দেখ ভাস্কর—একজন মর্বিড বুড়োকে আঘাত দেওয়া হবে বলে দু-দুটো জীবন ব্যর্থ করার কোনও অর্থ হয়? সময়ের মাপে ঐ বৃদ্ধের জীবনকাল হয়তো মাত্র দশ বছর—আর যে দুটো ছেলেমেয়েকে তুই বঞ্চিত করতে চাইছিস তাদের পড়ে আছে দীর্ঘজীবন।

ভাস্কর বললে, সবই মানছি। আমার আসল বাধাটা কোথায় জানিস? আসল বাধা শিবনাথ মুখার্জী নয়, তাঁর কন্যা—উমা।

: উমা? উমা এর ভিতর আসছে কি করে?

: আমি ঐ বিধবাটিকে বিবাহ করলে বড়দার মত বাবা আমাকেও বাড়ি থেকে তাড়াবে। না খেয়ে মরব সো ভি আচ্ছা! মা অথবা উমা প্রতিবাদ করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারবে না। পারবে না আমি জানি। বড়দার ক্ষেত্রে এটা দেখেছি। আমার কাছ থেকে অর্থ-সাহায্যও নেবে না বাবা। বড়দার কাছ থেকে যেমন নেয় না। তোর কথা সত্যি—বুড়োবুড়ীর জীবন শেষ হয়ে এসেছে, ওঁরা আর কতদিন? কিন্তু উমা?

: তাকে তোর কাছে এনে রাখবি।

: বাবা দেবে না। উমাও আসবে না। দুরন্ত অভিমানী সে।

প্রদীপ অনেকক্ষণ খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করল। জবাব দিতে গিয়েও যেন দিতে পারছে না। তারপর মনস্থির করে বললে, ভাস্কর! আর সে দায়িত্ব যদি আমি নিই?

: তুই! মানে?

: মানেটা তোর জানা। অনেকদিন পর শুনলি তাই ধরতে পারছিস না।

এবার জবাবটা দিতে ভাস্কর দেরি করল। শেষে বললে, ও প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রাখা যাক প্রদীপ। আই মীন—তোর বিয়ে আর আমার বিয়ে। আগে লড়াইটা ফতে হোক। হারি কি জিতি দেখি—তারপর ও-কথা। বইটা দে। পড়তে শুরু করি এবার।

খাওয়া শেষ হয়েছিল ওদের। ভাস্কর বেসিনে হাত ধুতে গেল। হঠাৎ ওর মনে একটা প্রশ্ন জাগল। বললে, একটা কথা। বইটার নামকরণের অর্থ তো বুঝলাম না?

: সাগর-সঙ্গমে? ও হ্যাঁ, বাকীটা সলিল বলেনি তোকে। ত্রিশ বছর বয়সে বারবনিতার জীবনে এল এক নতুন খদ্দের। একটি ছেলে। ওর চেয়ে বছর ছয়েকের ছোট। ছেলেটি অস্বাভাবিক। যৌন-ক্ষমতার বিচারে। তাকে নিয়ে কৌতুক জাগল ওর। কৌতূহল হল। সাতঘাটে জল খাওয়া অভিজ্ঞ বারবনিতা প্রেমে পড়ল এতদিনে—ঐ বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে। এখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি। একটা খোলাখুলি দৈহিক মিলনের বর্ণনায় শেষ হয়েছে উপন্যাসখানা।

: বুঝলাম। মানে, বুঝলাম না—নামকরণের যাথার্থ্য তাহলে—

: ও! বলতে ভুলে গেছি, ওর চেয়ে ছয় বছরের ছোট সেই ছেলেটির নাম সাগর। তটিনী এতদিনে সাগর-সঙ্গমে উপনীত হল।

: আই সী! 'সঙ্গম' শব্দটি তাহলে দ্ব্যর্থবোধক!

# ছয়

শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিটা যখন শেষ হল রাত তখন পৌনে চারটে। পাশের টেবিলে বইটা নামিয়ে রাখল ভাস্কর। হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। নীরন্ধ্র অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে ভাস্করের চোখের সামনে ফুটে উঠল---না, বারবনিতা তটিনীর আলেখ্য নয়, অপরিণতবয়স্ক সাগর নয়—ওর মানসপটে ভেসে উঠল একটি পরিচিতা মেয়ে : রেবা সেনগুপ্তা।

এবং যে বেশে তাকে এতদিন দেখেছে, আজ সন্ধ্যাতেও দেখেছে, সে-বেশে নয়— 'বেশ'-এর প্রশ্নই ওঠে না। যে ভঙ্গিতে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় তটিনী শুয়ে ছিল অবিকল সেই ভঙ্গিমায়।

অন্ধকারেই উঠে বসল ভাস্কর। আবার হাত বাড়িয়ে বাতিটা জ্বালে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে তার। উঠে গিয়ে ঢক ঢক করে জল খেল প্রথমে। তারপরে বাথরুমে গিয়ে বেসিনে মুখে চোখে জল দিল। ভিজা হাতটা ঘাড়ে বুলালো। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছল। আবার এসে বসল ওর খাটে।

নিঃসন্দেহে বইটা ওকে বিচলিত করেছে। অস্বীকার করে লাভ নেই—হ্যাঁ, একটা জান্তব ক্ষুধায় সে এখন তাড়িত। ঘুম আসছে না। ওর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়েছে। পরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যাবে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বইটা নিঃসন্দেহে উত্তেজক। তবু! সবকিছু সত্ত্বেও ভাস্করের মনে হল বইটি এক আশ্চর্য সৃষ্টি। লেখকের কলম অত্যন্ত জোরালো। বক্তব্য বলিষ্ঠ। সব চেয়ে বড় কথা—নাচতে নেমে ভদ্রলোক ঘোমটা টানেননি কোথাও!

উত্তেজক হক, বইটা কি অশ্লীল? অশ্লীলতার দায়ে কি এটাকে বাজেয়াপ্ত হতে হবে?

মিনিটখানেক দু হাতে মাথা ধরে ভাস্কর চিন্তা করল। তারপর আপন মনেই বলে উঠল—না! এ উপন্যাস রসোত্তীর্ণ সাহিত্য!

ঘুম যখন আসবে না, তখন বিচার করে দেখতে দোষ কি?

ভাস্করের মতে বিদ্যাসুন্দরের মিলন-বর্ণনা অশ্লীল, কিন্তু লেডি চ্যাটার্লির যৌন-বর্ণনা অশ্লীল নয়। যদি বল---কেন? ভাস্কর বলবে—বিদ্যাসুন্দরে ঐ বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত আরোপিত। বিদ্যার গর্ভসঞ্চারের কথা কবিকে কাহিনীর খাতিরে বলতে হত; বেশ কথা, কিন্তু কী ভাবে সে গর্ভিণী হয়ে পড়ল তার বর্ণনা কাব্যের প্রয়োজনে আবশ্যিক ছিল না। ভারতচন্দ্র সে দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন, কাব্যের খাতিরে নয়—পাঠককে, এক্ষেত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর উমেদার দলের মনে সুড়সুড়ি দিতে। অপর পক্ষে লরেন্স-এর বিষয়বস্তুটা ছিল পরিপূর্ণ যৌন-সমস্যা। লেডি চ্যাটার্লির স্বামী পঙ্গু—যৌন-জীবনে অপাংক্তেয়। নরনারীর যৌন-জীবন তার জীবনের সবখানিই নয়, তবে অনেকখানি। সেখানে কোন সমস্যা দেখা দিলে তার আলোচনা জীবনের আলোচনা; সে নাচেরও প্রয়োজন আছে; আর সে নাচের আসরে ঘোমটা টানার প্রয়োজন নেই। লরেন্সের কাছে তাই খোলাখুলি বর্ণনা ছিল বিষয়বস্তুর দিক থেকে অপরিহার্য---যা সত্য ছিল না ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে।

ধর আর একটা উদাহরণ :

'রাত ভ'র বৃষ্টি'তে বুদ্ধদেব বসু একটা 'জন্তু'র ঐ যে ইমেজটা ব্যবহার করেছেন সেটা অশ্লীল নয়। নয়নাংশুর যে সমস্যা তার সঙ্গে ঐ জন্তুটার প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার দাম্পত্যজীবনের বিয়োগান্ত নাটকে সেও একটা কুশীলব। তার কথা এড়িয়ে নায়কের ট্র্যাজেডির মর্মমূলে প্রবেশ করা যেত না। তাই ঐ ইমেজ প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয়—বোধকরি ছিল আবশ্যিক। কিন্তু আধুনিক অনেক সাহিত্যিকের কলম দিয়ে আধুনিকতার নামে বাস্তবধর্মিতার অজুহাতে যেসব জৈবিক বৃত্তি, যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা বেরিয়ে আসছে তা ভাস্করের মতে অশ্লীল—কারণ কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়, মূল সমস্যার সঙ্গে ঐ চুটকি বর্ণনা সম্পর্ক-বিমুক্ত। তাই সেগুলি প্রক্ষিপ্ত। ফলে, অশ্লীল! ভারতচন্দ্র যদি সচাটুকার মহারাজের চিত্তবিনোদনের জন্য ঐ বর্ণনায় নেমে থাকেন, তাহলে এঁরা নামছেন নিতান্ত অর্থনৈতিক কারণে। হু হু করে বই কাটবে এই আশায়।

তোমরা হয়তো একমত হবে না—ভাস্করের হিসাবে কোনার্কের মন্দিরগাত্রে অনেক মিথুনমূর্তি অশ্লীল—খাজুরাহের কাণ্ডারীয় মহাদেব-মন্দিরে সেই মূর্তিই ওর কাছে বরণীয়। ভাস্কর বলতে চায় : সূর্যমন্দিরে নর-নারীর যৌন-জীবনের চিত্র প্রক্ষিপ্ত, আরোপিত—যা সত্য নয় কাণ্ডারীয় মহাদেব-মন্দিরে। গৌরীপট সমেত শিবলিঙ্গের ধ্যানেই রয়েছে নন্দন-তত্ত্বের মূল কথা—মন্দিরের বহির্গাত্রে সেই মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা, উদাহরণ, রকমফেরটা প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য। সূর্যমন্দিরে তা নয়।

প্রসঙ্গত তলস্তয়ের কথা মনে পড়ল ভাস্করের : 'হোয়াট্ ইজ আর্ট?'

প্রায় একশ বছর আগে কাউন্ট তলস্তয় বলছেন, "সুতরাং যদিও বলেছি, শিল্পপদবাচ্যকে কোন নূতন বাণী শোনাতে হবেই, তবু কোন কিছু নতুন কথা বলতে পারলেই সেটা শিল্পপদবাচ্য হবে না; সার্থক শিল্প হতে হলে তাকে এই কয়টি শর্ত পূরণ করতে হবে—

(ক) নূতন কথা যা বলা হয়েছে তা যেন মানব-কল্যাণে কাজে লাগে;
(খ) নূতন কথা এমন ভাষায় বলতে হবে যাতে তার অর্থ বোধগম্য হয়;
(গ) নূতন কথা যেন শিল্পসৃষ্টিকারীর আভ্যন্তরিক তাগিদে সৃষ্টি হয়—
বাইরের আরোপিত কারণে নয়।"

ভাস্করের মতে ভারতচন্দ্র থেকে তথাকথিত আধুনিক লেখকরা ধরা পড়ে যাচ্ছেন ঐ প্রথম আর তৃতীয় শর্তে। তাঁদের সৃষ্টি মানবকল্যাণে কোন ভূমিকা নিতে অপারক—এবং তাঁদের সৃষ্টি লেখকের আভ্যন্তরিক সৃষ্টির তাগিদে নয়। নতুন কিছু দিতে পারছেন না বলেই এঁরা অশ্লীলতার দ্বারস্থ হচ্ছেন—যদি ঐ ভাবে তাঁরা সাহিত্য-জগতে টিকে থাকতে পারেন।

তা সে যাই হোক, সাগর-সঙ্গমে? সে কি পেরেছে তলস্তয়ের ঐ শর্তত্রয় পূরণ করতে? হ্যাঁ, নতুন কথা সে বলেছে—বারবনিতার জীবনের ঐ অনুদঘাটিত দিকটা সমাজ জানত না—তাকে জানানো হয়নি। আজ জানা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে লেখকের ভাষা ও বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিন নম্বর শর্তটা। লেখকের মূল প্রেরণা কী। পর্ণগ্রাফিক একটা যৌনপুস্তক লিখে সে কি বাজার মাৎ করতে চেয়েছিল? কে ঐ অপ্রকাশ গুপ্ত? কী তার ইতিহাস?

পাশের খাটে ঘুমোচ্ছিল প্রদীপ। অঘোরে। ঠেলে তুলল তাকে। প্রদীপ উঠে বসে। চোখ রগড়ে বলে, শেষ হয়ে গেল?

: হল। আই মাস্ট অ্যাডমিড—বইটা দারুণ!

প্রদীপের ঘুম ছুটে যায় একেবারে। ঘড়িটা দেখে নেয় একবার। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খায়, তারপর বলে, দারুণ মানে? শ্লীল না অশ্লীল?

: সে প্রশ্ন অবান্তর। লেখাটা রসোত্তীর্ণ। একটা সাহিত্যকীর্তি।

: টু হেল উইথ য়োর সাহিত্য! বইটা 'অবসিন', কী না?

: আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নয়। অবশ্য কয়েকটা কথা তার আগে জানতে চাই।

: আবার কী জানতে চাস? বইটা আদ্যন্ত পড়েছিস। শ্লীল হলে শ্লীল, অবসিন হলে তাই। আর কী জানার আছে?

: আছে। কে ঐ অপ্রকাশ গুপ্ত? তার জীবনী সম্বন্ধে কতটুকু জানা গেছে? কেন সে লিখেছিল ঐ বইটা? সাগর আর তটিনী কি রক্ত-মাংসের জীব? কোন সূত্রে লেখক ঐ বারবনিতার জীবনকে এত কাছে থেকে দেখেছেন?

: সে সব প্রশ্নও উঠবে বলতে চাস? বইটি বাজেয়াপ্ত হবে কি হবে না এই বিচারে?

: আলবৎ উঠবে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে লেখক একটা জীবন-সত্যকে অনুভব করেছিলেন—জীবনে জীবন যোগ করে। এ কোনো সৌখিন মজদুরী নয়! তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজসেবা—বারবনিতার জীবনের ট্রাজেডি ফুটিয়ে তোলা। 'ইয়ামা দ্য হেলহোল' বা 'নানা'তে—

প্রদীপ হাত বাড়িয়ে ভাস্করের হাতটা ধরে। বলে, আমি জানতাম। সে জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করেছি। কাল ইয়াকুব ঢাকা যাচ্ছে।

: ইয়াকুব কে?

যে মুহূর্তে পুলিস বিজয়বাবুকে গ্রেপ্তার করেছে বলে সংবাদ পেয়েছিল প্রদীপ সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে—মামলায় অপ্রকাশ গুপ্তকে সুপ্রকাশ করার প্রশ্ন দেখা দেবে। লেখকের সম্বন্ধে সে কিছু না জেনে কপি-রাইট কিনেছিল। সে তখনই পার্কসার্কাসের ইয়াকুব মিঞাকে ডেকে পাঠায়। ইয়াকুবের বই-বাঁধানোর কারবার আছে। ওদের ভারতী প্রকাশনের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের কারবার। প্রদীপ জানতো ইয়াকুব দু-নৌকায় পা দিয়ে চলে। তার পরিবারের সকলে আছে ঢাকায়—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় থেকেই। ইয়াকুব মাসে-দুমাসে একবার ঢাকা যায়। ইয়াকুব অতি বিচক্ষণ এবং বিশ্বাসী। তাকে কিছু টাকা দিয়ে প্রদীপ ঢাকায় পাঠিয়েছে। আগামীকাল, অর্থাৎ ইংরাজি হিসাবে আজই—এই রবিবারেই ইয়াকুব ঢাকায় রওনা হচ্ছে। সে তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিয়ে আসবে। প্রকাশক আবদুল রেজাক, মুদ্রাকর মহম্মদ বারিকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। একটিমাত্র সন্ধান-সূত্র হাতে আছে—আবদুল রেজাক-এর পুত্রের ঠিকানা—সেই যে ছেলেটি কপি-রাইট বিক্রয় করেছে। প্রদীপ ইয়াকুবকে বলেছে, অপ্রকাশ গুপ্ত অথবা তটিনী-সাগর সম্বন্ধে কোন কিছু সন্ধান পাওয়া যায় কিনা জেনে আসবে। আবদুল জীবিত—যদিও—তার বয়স সত্তরের উপর। সে নিশ্চয় অনেক সংবাদ দিতে পারবে লেখকের সম্বন্ধে। সে কিভাবে পাণ্ডুলিপি পেয়েছিল, লেখককে কত টাকা কিভাবে দিয়েছে! লেখক বা তার আত্মীয়-বন্ধু কাউকে সে চেনে কিনা—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভাস্কর বললে, আমার মনে হচ্ছে একটা বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয় হয়েছিল লেখকের। কল্পনায় একটা বেশ্যার জীবন এত নিখুঁতভাবে আঁকা যায় না। শুধু তাই নয় —তটিনীর ভাষা পড়ে মনে হয়, রচনার অনেকখানি লেখক শ্রুতিলিখনে লিখেছেন।

শুনে শুনে।

: সে যাই হোক। তুই এ কেস নিলি তো?

: নিলাম। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব প্রদীপ। তোর মনে হতে পারে—আমার এই সিদ্ধান্তের পিছনে অনেক অনেক কারণ আছে—তা তো মনে হতেই পারে—আমার বর্তমান বন্ধ্যা-জীবিকা থেকে মুক্তি, আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি, উমার উপকার করার ইচ্ছা ইত্যাদি ; কিন্তু বিশ্বাস কর প্রদীপ, আজ, এই মুহূর্তে আমার কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছেন ঐ অজ্ঞাত অপ্রকাশ গুপ্ত। তাঁর সৃষ্টি! একটা কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকে আমি এভাবে হত্যা করতে দেব না! অপ্রকাশ গুপ্ত মারা গেছেন—কিন্তু 'সাগর-সঙ্গমে' বইটাকে আমি মরতে দেব না। এ আমার বাক্-স্বাধীনতার অধিকার, আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতার লড়াই।

প্রদীপ ওর পিঠ চাপড়ে বললে : ব্রেভো!

পূব আকাশে ততক্ষণে আলো ফুটতে শুরু করেছে।

## সাত

শনিবার রাত দশটায়—যে সময় ভাস্কর 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি পড়তে শুরু করল, যে সময় নির্মল নিয়োগী বিদায় নিল আনন্দময়ের যোধপুর পার্কের বাড়ি থেকে এবং যে সময় পার্কসার্কাসে ইয়াকুব মিঞা ঢাকা যাত্রার প্রাক্কালে তার স্যুটকেস গোছানো শেষ করল—ঠিক সেই সময় মধ্য কলকাতার একটি হোটেলে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল।

ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে নিরাবরণ একটি রমণীর মৃতদেহ—রমণী নয়, বছর কুড়ি-বাইশের একটা হতভাগা মেয়ে। আর তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে—দু-এক বছরের ছোট হবে। প্যান্টের বোতাম আঁটছে সে কাঁপা-কাঁপা আঙুলে। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে ঐ মেয়েটির অনাবৃত দেহটা!

: সুখেন! কুইক! কী করছিস তুই এতক্ষণ ধরে?—বলে ওঠে ওর সঙ্গী। সে বিছানার চাদরটা টেনে নামায়। আপাদমস্তক ঢেকে দেয় মেয়েটিকে। তারপর মাটিতে পড়ে থাকা বুশ-শার্টটা নিয়ে সুখেনকে জামা পরাতে থাকে। বলে মাথা ঠাণ্ডা রাখ। নার্ভাস হলেই সর্বনাশ! দাঁড়া, আমি দরজা খুলে আগে উঁকি দিয়ে দেখি—

সুখেন কোনক্রমে বললে, যাবার আগে একটা টেলিফোন করলে হ'ত না? মেয়েটা হয়ত এখনো মরেনি।

ওর বন্ধু সুরেশ প্যাটেল দরজা একটু ফাঁক করে দেখছিল করিডরটা নির্জন কিনা। সুখেনের কথায় ফের ঘুরে দাঁড়ায়। দরজাটা বন্ধ করে। বলে, পাগল! ডেডবডি আবিষ্কৃত হতে যত দেরি হবে আমাদের বাঁচবার চান্স তত বেশি। বুঝছিস না?

সুখেন বোধ করি বুঝতে পারে না। এসব ব্যাপারে একেবারে নভিস্ সে। তবু আমতা আমতা করে বললে, কিন্তু ও যদি বেঁচে থাকে?

: হয়তো আছে। ম্যাটার অফ মিনিটস্। আমরা বাড়ি পৌঁছবার আগেই ফৌত হয়ে যাবে।

সুখেন আর কিছু বলল না। সুরেশ প্যাটেল অত্যন্ত দ্রুত হাতে ঘরের প্রত্যেকটি

দরজার হাতল, প্রত্যেকটি মসৃণ অংশ—যেখানে ওদের আঙুলের ছাপ থাকতে পারে রুমাল দিয়ে মুছে দেয়। তারপর সুখেনের হাত ধরে বলে, আয়, রাস্তা পরিষ্কার!

ওরা হোটেলের করিডরে বেরিয়ে আসে। সুরেশ রুমাল জড়ানো হাতে দরজাটা টেনে বন্ধ করে। সুখেনের হাত ধরে বলে, চল!

রিসেপশান কাউণ্টারে লোক ছিল কিনা সুখেনের নজর হল না। আলোকোজ্জ্বল হোটেলের সিঁড়ি-বারান্দা কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। তার চোখের সামনে ভাসছিল একটা নিরাবরণা নারীমূর্তি। অর্থমূল্যে যে মেয়েটি—

সুরেশের কানে কানে ও বললে, বিশ্বাস কর, মরে যাবে তা আমি ভাবিনি মাইরি—

: আহ্!—একটা চাপা ধমক দেয় সুরেশ। ওকে টেনে নিয়ে যায় পার্কিং জোনে। গাড়িটা সুখেনের, কিন্তু চাবি ছিল সুরেশের কাছে। চাবি খুলে সে নিজে উঠে বসে চালকের আসনে। সুখেনকে পাশের আসনটা দেখিয়ে বলে, বস।

পার্কিং জোনে যে দারোয়ানটা থাকে সে ওদের নির্দেশ দেয়। হাত তুলে অপর দিকের রাস্তাটা বন্ধ করে দেয়। সুরেশ হেড-লাইটটা জ্বালে—যাতে ঐ দারোয়ানের চোখটা ধাঁধিয়ে যায়, যাতে সে পরে গাড়ির আরোহীদের সনাক্ত করতে না পারে। দারোয়ান তার প্রসারিত হাতটা চোখের সামনে টেনে আনে। গাড়িটা তার পাশ ঘেঁষে যাওয়ার সময় সুরেশ হাত বাড়িয়ে একমুঠো খুচরো সিকি আধুলি ওর হাতে ধরিয়ে দেয়। এটাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ব্যাটা এখন ওগুলো গুনতে ব্যস্ত থাকবে। গাড়ির নম্বর-প্লেটটা দেখবে না!

বড় রাস্তায় পড়েই সুরেশ বললে, সুখেন, বি স্টেডি! একদম ঘাবড়াবি না! আমরা কোনো ক্লু পিছনে ফেলে যাচ্ছি না। মেয়েটা একটা কল গার্ল। অসংখ্য লোকের সঙ্গে ওর কারবার। হোটেলরুম সে-ই বুক করেছে। ভয় কি?

: না। আমি ঠিক আছি। কিন্তু সুরেশ! আই···আই ডিডণ্ট ট্রাই টু কিল্ হার! মানে ওকে মারতে চাইনি আমি—বিলিভ মী—

: আই নো! আমার চোখের সামনেই তো ঘটনাটা ঘটল। তুই একটু বেশি জোরে ওকে ধাক্কা মেরেছিলি। ওর মাথাটা ঐ শ্বেত পাথরের টেবিলে বেমক্কাভাবে ঠুকে গেল—মানে, একটা দুর্ঘটনা—পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল অ্যাকসিডেণ্ট! মন খারাপ করিস না!

: না না, মন খারাপ করব কেন? দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই।

: দ্যাট্‌স এ গুড বয়! আমরা তো মেয়েটির সম্মতিক্রমেই—

: আচ্ছা সুরেশ! মেয়েটার নাম কি রে?

: নাম জেনে কি হবে? কালকের কাগজেই দেখবি।

: তুই ওকে কতদিন চিনিস?

সুরেশ গাড়িটাকে কার্বের কাছে পার্ক করল। নির্জন রাস্তা। রাত সওয়া দশটা। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, সুখেন, কয়েকটা কথা তোকে বলি। মেয়েটা কে, কেমন করে আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এসব তুই কিছুই জানিস না। তুই টাকাটা দিয়েছিলি—আর ধাক্কাটা মেরেছিস। এ-কথা তুই জানিস আর আমি জানি। এর বেশি কিছু জানবার চেষ্টা করিস না। আজকের সন্ধ্যার কথাটা তুই স্রেফ ভুলে যাবার চেষ্টা করিস। বুঝলি?

সুখেন অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়ল। তার মনে হল সুরেশ একটা অসম্ভব কথা

বলেছে। আজকের সন্ধ্যার কথাটা সে সারাজীবন ভুলতে পারবে না! সুরেশের সঙ্গে নারীদেহ শিকারে আজ প্রথম এসেছে বটে—কিন্তু এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। এর আগেও বার সাত-আট—

: আর একটা কথা সুখেন! যদিও আমাদের দুজনের কারও ধরা পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই—তবু বলে রাখি, মনে রাখিস, আজ সন্ধ্যায়—সন্ধ্যায় নয়, সারাদিনে তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তুই তোর নিজের মত অ্যালিবি তৈরি করবি, আমি আমার মত করব।

: অ্যালিবি তৈরি করার প্রশ্ন উঠছে কেন? তুই তো বলছিস কোনো ক্লু আমরা পিছনে রেখে আসিনি।

: কারেক্ট। তবু ঐ শালা পুলিসকে তুই চিনিস না। কোন দূরতম সূত্র ধরে ধরে হয়তো তোর কাছে বা আমার কাছে এসে হাজির হবে। হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সেক্ষেত্রে আজ আমি সারাদিন কোথায় ছিলাম তা তুই জানিস না; তুই সারাদিন কোথায় ছিলি তা আমি জানি না। বুঝলি?

সুখেন অন্যমনস্ক ভাবে বললে, হুঁ।

: থার্ডলি! আর একটা মূর্খামি করিস না। ভুলেও ঐ হোটেলে কোনদিন আর যাস নে—

: ঐ হোটেলে কেন যাব?

: 'কেন যাব' সে কথা ছাড়ান দে। কোন কারণেই ঐ হোটেলে একা একা ঐ ঘরটাকে দেখতে যাসনে, বুঝলি?

আরও খানিকটা ড্রাইভ করে লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড়ের কাছে এসে পড়ল। গাড়িটা আবার রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে সুরেশ বলল, কি রে? স্টেডি আছিস? আমি নেমে যাব, না বাড়ি পর্যন্ত তোকে পৌঁছে দেব?

সুখেন বললে, না না। ঠিক আছে। আমি ড্রাইভ করতে পারব। কেন পারব না? আমি তো আর খুন করিনি···ইট'স অ্যান অ্যাকসিডেন্ট!

সুরেশ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তুই ক্রমাগত ঐ কথা ভাবছিস সুখেন। ওটা ভাল নয়! তোকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলেই এক্ষেত্রে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। বুঝলি না? তোদের পাড়ার কেউ তোকে আর আমাকে এক গাড়িতে দেখে ফেলতে পারে—সেটা ঠিক নয়—কারণ আমাদের স্ট্যাণ্ড হচ্ছে, আজ সারাদিনে তোতে-আমাতে দেখা হয়নি—তাই না?

: বলছি তো! আমি ঠিকই আছি, তুই নেমে যা।

: গুড নাইট! সুরেশ নেমে পড়ে।

সুখেনের মুখ দিয়ে কিন্তু কিছুতেই 'শুভরাত্রি' শব্দটা বার হল না। সে গাড়িতে স্টার্ট দিল; কিন্তু নাঃ! এখনও সে ঠিক স্বাভাবিক হতে পারেনি। এখনই বাড়িতে যাওয়াটা ঠিক নয়। নাইট শো সিনেমা দেখে অনেক রাত্রে এর পরও সে বাড়ি ফিরেছে। কেউ কোন সন্দেহ করেনি। স্থির করল মাঠের ধারে গাড়িটা পার্ক করে একটু ময়দানের হাওয়া খাবে। ঐ বিবস্ত্রা মেয়েটির ছবিখানি মনের ক্যানভাস থেকে মুছে ফেলতে হবে নিঃশেষে। তারপর রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি যাবে।

তাই এল সুখেন। আলিপুরে তাদের প্রকাণ্ড বাড়িটার সামনে যখন এসে গাড়িটা দাঁড়

করালো তখন রাত বারোটা দশ। পাড়া নিষুতি—কিন্তু ওদের বাড়িতে অনেকগুলো আলো জ্বলছে। সুখেন গাড়িটা গ্যারেজ করল। সদর দরজার কাছে এগিয়ে এসে দেখল ভিতর থেকে তালাবন্ধ। সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবিটা ও রাখে মানিব্যাগে। পকেট থেকে ম্যানিব্যাগটা বার করতে গিয়ে সেটা খুঁজে পায় না। এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ে বুঝল খোয়া গেছে ম্যানিব্যাগটা। পকেটমার হতে পারে না। সে নিজের গাড়িতে এতক্ষণ ঘুরছিল। তবে কি গাড়িতেই পড়েছে ব্যাগটা? গ্যারেজের দিকে পা বাড়াতেই একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল ওর মুখে। চমকে উঠল সুখেন। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। একটু পরেই নজর হল আলোর সামনে কে যেন ওর ডুপ্লিকেট চাবিটা বাড়িয়ে ধরেছে। বললে, এই চাবিটা খুঁজছ! ওটা আমার কাছে ছিল। নাও। দরজা খুলে ভিতরে ঢোক।

এতক্ষণ অন্ধকারে দৃশ্যটা চোখ-সওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুজন ইউনিফর্মধারী অফিসার। একজন বললেন, আমরা ঘণ্টাখানেক আগেই এসেছি সুখেনবাবু। হোটেল ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টালের তিনতলায় 307 নম্বর ঘরে এই ম্যানিব্যাগটা পাওয়া গিয়েছিল। এস ভাই, ভিতরে এস। সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সুখেন রুখে উঠলো। বললে, না! ভিতরে নয়। থানায়, হাজতে কোথায় নিয়ে যেতে চান চলুন।

: মাথা গরম কর না, সুখেনবাবু। আগে আমাকে সবটা শুনতে দাও। তোমার বন্ধুটিকে কোথায় নামিয়ে দিলে?

: কে বন্ধু? না, কোন বন্ধু আমার সঙ্গে ছিল না। আমি একা ছিলাম।

: একা তো তুমি ছিলে না সুখেনবাবু। তোমরা দুজনে ছিলে—

সুখেন সে কথা এড়িয়ে বললে, মেয়েটা মরে গেছে?

: না মরেনি। বেঁচে আছে। কিন্তু ওর মাথায় আঘাতটা কে করেছিল? তুমি, না তোমার সেই বন্ধু?

: বলছি তো আপনাকে—আমি একা ছিলাম। মেয়েটি বলেনি?

: মেয়েটির নামটা কী বল তো সুখেনবাবু?

: আমি জানি না।

: যার নামই জান না তার সঙ্গে এ ব্যবস্থা করলে কেমন করে একা একা?

: আমি বলব না।

: ঠিক আছে, ঘরে চল। বাইরে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলা ঠিক নয়।

: বলছি তো—আমি বাড়ি ঢুকব না। আপনারা আমাকে থানায়—

: তুমি ভুল করছ সুখেনবাবু। তোমার বাড়ির সবাই তোমার কীর্তির কথাটা জেনে গেছেন। তোমার বাবা—

কথাটা শেষ হল না। ভিতর থেকে সদর দরজার চাবি খোলার শব্দ হল। দরজা খুললেন স্বয়ং মনোহর কানোরিয়া—সুখেনের বাবা। বিখ্যাত শিল্পপতি। বললেন, আপনারা ভিতরে আসুন ইন্সপেক্টর। কথাবার্তা যা জিজ্ঞাসা করবার তা আমার সলিসিটারের সামনে করতে হবে। ভিতরে সবাই অপেক্ষা করছে।

: আই নো স্যার! চলুন আমরা ভিতরে গিয়েই কথাবার্তা বলি।

# আট

পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ায় নির্মল নিয়োগী। প্রশ্ন করে, ভিতরে আসতে পারি স্যার?

অজিত গুপ্ত, আই. পি. এস. একটা ফাইলে নিবদ্ধ-দৃষ্টি বসে ছিলেন। মুখ তুলে অধস্তন কর্মচারীকে দেখতে পেয়ে বললেন, কে নির্মল? এস এস, বস। তোমার কথাই ভাবছিলাম।

নির্মল বসে ভিসিটার্স চেয়ারে। বলে, ডেকেছিলেন কেন? বলুন?

: ঐ 'সাগর-সঙ্গমে' কেসটার আপ-টু-ডেট পজিশান জানতে।

: বিজয় ভট্টাচার্য জামিনে ছাড়া পেয়েছেন, কাল সোমবার আমরা বইটির বিক্রয় সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্য যে ইনজাংশান প্রে করেছি তার রায় বের হবে।

: অপ্রকাশ গুপ্ত বা ঐ তটিনীর বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?

: এখনও নয়। তবে আমাদের এজেন্ট কাজ করে যাচ্ছে।

: তোমার প্রসিকিউশানে সাক্ষী কে কে হলেন?

নির্মল বলে, স্যার কাজের দায়িত্বটা গতকাল দিয়েছেন, আজই কি সাক্ষী যোগাড় হতে পারে? এ-ক্ষেত্রে বুঝে-সুঝে ধীরে-সুস্থে—

: শোন নির্মল! তুমি কি এ কেসের আসল ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আন্দাজ করতে পেরেছ? কেন এতটা ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছি আমরা?

: নিশ্চয়ই। বইটা একটা জঘন্য পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার। এর প্রচার বন্ধ না হলে সমাজবিরোধী কাজকর্ম—

আবার ওকে থামিয়ে দিয়ে অজিত গুপ্ত বলেন, নির্মল, তুমি থামবে?

: থামব? মানে?

: কী আবোল-তাবোল বকছ? এ খেলায় তুমি-আমি-বিজয় ভট্টাচার্য নেহাৎ বড়ের দল—আসলে দাবা খেলা হচ্ছে দুই গ্র্যাণ্ড-মাস্টারের মধ্যে। এটা আপাতদৃষ্টিতে স্টেট ভার্সেস বিজয় ভট্টাচার্যির কেস হলেও আসলে এটা জীমূতবাহন বসু বনাম যশোদারঞ্জন পাত্রের লড়াই। কিছু বুঝলে?

নির্মল অবাক হয়ে বললে, জীমূতবাহন বসু, মানে এম. পি. জীমূতবাহন?

: ইয়েস! অদ্বিতীয় জীমূতবাহন। বুঝলে নির্মল—অপ্রকাশ গুপ্ত, সাগর, তটিনী, আর 'সাগর-সঙ্গমে' ব্যবহৃত ঐ সব নিষিদ্ধ শব্দ—ঐ যাদের ইংরেজিতে বলে ফোর-লেটার-ওয়ার্ডস—ওসব কিছুই নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কে জেতে! যশোদারঞ্জন না জীমূতবাহন? সমাজনীতি এখানে গৌণ, মুখ্য বিবেচ্য বিষয় : রাজনীতি। জান নিশ্চয়, ভারতী প্রকাশনের মালিক যশোদারঞ্জন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন : সাপ্তাহিক ভারতী। সম্পাদক যতটা দাবী করেন পত্রিকা তত বিক্রি হয় না, আবার জীমূতবাহনরা যতটা কম বিক্রি হয় বলে মনে করেন তার চেয়ে বেশি হয়। মোটকথা কাগজটার একটা বাজার আছে—বিশেষ করে জীমূতবাহনের কন্সটিট্যুয়েন্সিতে—যেটাকে বলা হয় বুদ্ধিজীবীর মহল্লা। কী কারণে জানি না, বছর খানেক ধরে যশোদারঞ্জন তাঁর পত্রিকায় ক্রমাগত ঐ জীমূতবাহনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারণ করে চলেছিলেন। রাজনৈতিক নেতারা কোন কিছুই তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু কাগজকে ডরান। আপাতদৃষ্টিতে যশোদারঞ্জন এবং জীমূতবাহনের মধ্যে সৌজন্যের অভাব নেই—যশোদারঞ্জনের মোটর

অ্যাকসিডেন্টের পর জীমূতবাহন সকাল-সন্ধ্যা টেলিফোন করে খবর নিয়েছেন—কিন্তু তাঁর জাতক্রোধ জিইয়েই রেখেছিলেন। এবার তাঁর সুযোগ এসেছে। এই 'সাগর-সঙ্গমে' বইটিকে বাজেয়াপ্ত করলে 'ভারতী-প্রকাশন' বিরাট একটা অর্থনৈতিক ধাক্কা খাবে—আর তার চেয়েও বড় কথা পিতাপুত্রের যে ঝগড়াটা হবে তার অনিবার্য পরিণাম ভারতী-প্রকাশনের ভরাডুবি। ভারতী-প্রকাশন ডুবলে 'সাপ্তাহিক ভারতী'ও ডুববে। সুতরাং—

নির্মল স্বীকার করে, এত কথা আমি জানতাম না স্যার। এর পিছনে যে জীমূতবাহন আছেন, সেটাই জানতাম না আমি।

: দেখছ না, রণনীতিটা কী সুকৌশলে ছকা? বইটি বাজারে বের হবার আগেই তা বাজেয়াপ্ত করার আয়োজন হচ্ছে! সমস্ত কলকাঠি জীমূতবাহন স্বয়ং নাড়ছেন। ঐ যে বললাম—তুমি আমি শুধু বড়ের চাল দিয়ে চলেছি।

ঠিক এই সময়ে অজিত গুপ্তের টেবিলে টেলিফোনটা বেজে উঠল। তুলে নিয়ে বললেন, হ্যালো!

অনেকক্ষণ ধরে শুনে নিয়ে শুধু বললেন, ভেরি গুড! তুমি সোজা ডোভার লেনে চলে যাও।—ইয়েস। ওঁর বাড়িতে। হ্যাঁ, উনি বাড়িতেই আছেন। আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি আর নির্মল ওখানেই যাচ্ছি। রাইট-ও।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, ইন্সপেক্টর বিমান গুহ ফোন করছিল। কাল মধ্যরাত্রে হোটেল ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টালে একটি মেয়ে খুন হয়েছে। কেসটা আমাদের ফেবারে। চল, আমরা এখনই যাব। বেলটা বাজিয়ে আর্দালিকে বললেন, ড্রাইভার গাড়িতে আছে কিনা দেখ, এখনই বের হব আমরা। কুইক।

নির্মল বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। হোটেল ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টালে একটি মেয়ে খুন হবার সঙ্গে 'সাগর-সঙ্গমে' বইটার কী সম্পর্ক? সে প্রশ্ন কিন্তু করে না নির্মল। বলে, কোথায় যাচ্ছি স্যার?

অফিস-ব্যাগে কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে অজিত গুপ্ত বলেন, ডোভার লেনে। জীমূতবাহনের শিবিরে।

আধঘণ্টা পরে। জীমূতবাহনের বাড়ি। রুদ্ধদ্বার কক্ষে জীমূতবাহন ওঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঘরে তিনি একা নন, ছিলেন বিমান গুহ, ইন্সপেক্টর। আর্দালিকে নির্দেশ দেওয়াই ছিল। অজিত গুপ্ত এবং নির্মল নিয়োগী গাড়ি থেকে নামামাত্র সে ওঁদের নিয়ে গেল জীমূতবাহনের ঘরে। সৌজন্য বিনিময়ান্তে সকলে আসন গ্রহণ করা মাত্র জীমূতবাহন বললেন, মিস্টার গুপ্ত! শুনেছেন কাল রাত্রের কাণ্ড? আমাদের কানোরিয়া-সাহেবের পুত্রটির কীর্তি?

অজিত গুপ্ত বলেন, এইমাত্র বিমান আমাকে টেলিফোনে বলেছে। বিস্তারিত জানি না। কী ব্যাপার?

বিমান গুহ সংগৃহীত তথ্য আনুপূর্বিক পেশ করে। কানোরিয়ার পশ্চাদপট, সুখেনের পরিচয়, মেয়েটির অবস্থা এবং স্টেট ভার্সেস বিজয় ভট্টাচার্যের কেসের সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ড কিভাবে সম্পর্কযুক্ত :

মনোহর কানোরিয়া একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। অগাধ সম্পত্তির মালিক। বছর দশেক আগে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর একাধিক ফ্যাক্টরি চালু ছিল—বর্তমানে মাত্র একটি আছে; অন্যান্যগুলি তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য নিরুপদ্রব অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। আলিপুর

রোডে তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সংসার ছোট—স্ত্রী সরমা, শ্যালিকা অন্তরা এবং একমাত্র পুত্র সুখেন কানোরিয়া। বাড়িতে আর যারা থাকে তারা দারোয়ান, ড্রাইভার, পাচক, চাকর, মালী ইত্যাদি। মনোহর প্রৌঢ়, পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই ; স্ত্রী সরমা---পঙ্গু, দুরারোগ্য বাতের ব্যাধিতে। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হাকিমী, আকুপাংচার শেষ করে এখন স্বপ্নাদ্য মাদুলী-নির্ভর হয়ে শয্যাশায়ী। সংসারের দেখভাল করে সরমার ছোট বোন---অন্তরা। বয়সে সরমার চেয়ে তের বছরের ছোট। মনোহর কানোরিয়া বাঙলা দেশে এসেছিলেন কৈশোরে, তাঁর বাপের হাত ধরে—বাঙলায় কথাবার্তা বলেন নির্ভুল। বিবাহ করেছেন বাঙালী পরিবারে। একমাত্র রূপের ছাড়পত্র হাতে সরমা এসেছিল ঐ ধনকুবেরের সংসারে। বয়সে সে স্বামীর চেয়ে দশ বছরের ছোট। সুখেনের যখন জন্ম হয় তখনও সরমা একেবারে ভেঙে পড়েননি। তার পরেই তাঁর রোগ চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। পরে দিদিকে দেখা-শোনা করতে অন্তরা এ পরিবারে আসে। ইতিমধ্যে সরমা-অন্তরার পিতা এবং মাতা দুজনেই স্বর্গারোহন করেছেন। ফলে অন্তরা আর ফিরে যায়নি। এ সংসারেই রয়ে গেছে। এখান থেকেই স্কুলে কলেজে পড়েছে। বি. এ. পাস করার পর বস্তুত বসেই আছে। মাঝে মাঝে ওর বিয়ের কথা উঠেছে---মনোহর খরচ করতে রাজী, অন্তরার রূপেরও খামতি নেই ; কিন্তু দিদির অসহায়তার কথা চিন্তা করে অন্তরা আগ্রহ দেখায়নি। কর্তা এবং গিন্নী মুখে যতই আগ্রহ দেখান, অবচেতন মনের এক কোণায় ওঁদের একটি বাসনা নিশ্চয় লুকিয়ে ছিল—যতদিন সম্ভব অন্তরাকে এই পরিবারে আটকে রাখা। ফলে পঁচিশ বছর বয়সে অন্তরা অনূঢ়া। বস্তুত এ সংসারের কর্ত্রী।

বাকি রইল সুখেন। এই বছরই হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে কলেজে ঢুকেছে। ছাত্র ভাল নয়, থার্ড ডিভিশন। পড়ছে কমার্স। সুদর্শন। একটু যেন অন্তর্মুখী, যাকে বলে ইন্ট্রোভার্ট। কথাবার্তা বলে কম, আপন মনে থাকে। মনোহর ওর জন্য তিন-তিনজন প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন। তিনজনেই প্রফেসর, মাসিক দেড়-দুশ টাকা মাইনে তাঁদের। তাঁরা কী পড়ান, কখন পড়ান, সেটা খোঁজ নেন না গৃহস্বামী। খোঁজ নিলে জানতে পারতেন—তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায়শই বাধ্য হন ছাত্রকে ছুটি দিতে। সুখেনের জন্য মনোহর কী না করেছেন? প্রচুর পকেট-মানি স্যাংশন করেছেন, তিন-তিনটে প্রফেসর ছাড়াও একটা অ্যালসেশিয়ান পুষবার খরচ দিচ্ছেন, দরাজ-হাতে স্বাধীনতা দিয়েছেন পুত্রকে, সদর-দরজার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েছেন, একটা গাড়ি ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। সেটা সুখেন অনেকদিন ধরেই চালাচ্ছিল বিনা লাইসেন্সে—সাবালক হবার আগেই। জেনেও চোখ বুজে ছিলেন মনোহর, আর কি করতে পারেন? তবু পুত্রের মন পাননি। পুত্র তাঁকে ভালবাসে না, শ্রদ্ধা করে না ; ভয়? তা হয়তো কিছুটা করে ; তাই এড়িয়ে চলে।

সরমার সঙ্গেও সুখেনের সদ্ভাব নেই। কারণ সরমা মনোহরের ছায়া দিয়ে গড়া।

একমাত্র সে হৃদয়ের সম্পর্ক বজায় রেখেছে ঐ মাসির সঙ্গে। অন্তরা ওর চেয়ে বছর পাঁচ-ছয় বড় ; দিদির মত। অন্তরা তার দিদি-মা-বান্ধবী সবকিছু।

সেই ছেলেটা এ কী কাণ্ড করে বসল!

বিমান গুহ বলতে থাকে গতকাল রাত্রের ঘটনাটা। বললে, সুখেন কানোরিয়া আদ্যন্ত মিছে কথা বলেছে—ওর সঙ্গে তার কোন বন্ধু নিশ্চয়ই ছিল। একা ওর পক্ষে—

বাধা দিয়ে অজিত গুপ্ত বলেন, বি মেথডিকাল গুহ, আবোল-তাবোল ব'কো না,

প্রথমে বল, সুখেন কী জবানবন্দী দিয়েছে। তারপর বল সেই স্টেটমেন্টে কী কী লুপ-হোল নজরে পড়েছে তোমার, শেষে বল তোমার থিয়োরিটা কী।

: আয়াম সরি স্যার। ঠিক কথা, আগে বলি সুখেনের ভার্শান—

সুখেন বলেছে, সে গতকাল ছটা-নটার শোতে লাইট হাউসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। একা। ওর পাশের সীটে এসে বসল একটি মেয়ে। একা। তাকে ও আগে কখনও দেখেনি। বারে বারে তার হাতের সঙ্গে হাত, পায়ের সঙ্গে পা লেগে যাচ্ছিল সুখেনের। বারে বারেই দুজনে 'সরি' হচ্ছিল। শেষে সুখেনের মনে হল, এটা প্রতিবার ঘটনাচক্রে ঘটছে না। মেয়েটির সক্রিয় ভূমিকা আছে এই ক্ষণিক স্পর্শের। ভাব জমাতে চাইল সুখেন। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল। দু-চারটে কথার পরই ইণ্টারভাল হল। মেয়েটি ওকে বাইরে ডাকল। সুখেন বেরিয়ে এল। মেয়েটি বলল, বারে বসবে? ও-সব ছাই-ভস্ম খাও?

সুখেন কায়দা করে বলেছিল, মনের মত সঙ্গী পেলেই খাই।

মেয়েটি গ্রীবাভঙ্গী করে বললে, তবে তো মুশকিল। এর পরের প্রশ্নটা সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে সৌজন্যে বাধছে।

সুখেন বলেছিল, নাই বা প্রশ্ন করলে—ব্যবহারেই জবাব দেব। এস—

দুজনে দুটি ড্রিংকস নিয়েছিল। মেয়েটি সফ্‌ট ড্রিংক নেয়নি কিন্তু। সুখেন অনায়াসে মেয়েটির জাত নির্ণয় করল। শিকার ধরতেই এসেছে। বাকি সিনেমাটুকু ওরা দেখেনি। ওখান থেকেই চলে এসেছিল হোটেলে। মেয়েটির ঘর বুক করাই ছিল। বোঝা গেল সে পাকা ব্যবসায়ী!

সুখেন স্বীকার করেছে—হ্যাঁ, রীতিমত অর্থমূল্যে মেয়েটির দেহ সে উপভোগ করেছে। রাত সাড়ে দশটার সময় সে যখন হোটেল ছেড়ে চলে যেতে চায় তখন মেয়েটি ওর কাছে শর্তের বাইরে আরও একশ টাকা দাবী করে। সুখেন রাজী হয় না। কিছুটা কথা-কাটাকাটি। শেষে সুখেন রাগ করে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে চায়—দেখে দরজায় ইয়েল-লক। মেয়েটি ঢুকবার সময় ঠেলে বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু এখন চাবি ছাড়া তা খোলা যাবে না। চাবিটা সে কোথায় রেখেছে সুখেন তা নজর করে দেখেনি। সুখেন বলে, দরজা খুলে দাও! তোমার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল তার পাই পয়সা আমি মিটিয়ে দিয়েছি।

মেয়েটি বলে, না। তুমি আমাকে রেপ করেছ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি এখনি চিৎকার করে লোক জড়ো করব। আরও একশ টাকা, ছাড়, ছেড়ে দেব।

এরপর অল্প কথা-কাটাকাটি। সুখেন জোর করে এখানে-ওখানে হাতড়াতে থাকে।—অপহৃত চাবিটার খোঁজে। হাত কাড়াকাড়ি! মেয়েটি একসময় ওর হাতে কামড়ে দেয়—কামড়ানোর দাগটা সে দেখায়—সুখেন ওকে আচমকা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। মেয়েটি উল্টে পড়ে। ওর মাথাটা শ্বেতপাথরের টেবিলের কোণায় ভীষণ জোরে ধাক্কা খায়। সুখেন ভেবেছিল আঘাত সামান্য—ওর জ্ঞান ফিরবে একটু পরেই। চাবিটা সে খুঁজে পায়। ও ঘর ছেড়ে চলে যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ খেয়াল করে দেখেনি যে জামা-প্যাণ্ট খুলবার সময় ওর মানিব্যাগটা ঐ ঘরেই পড়ে গিয়েছিল—

এই হচ্ছে সুখেনের গল্প।

: আই সি! এখন ওর স্টেটমেণ্টে কোথায় কোথায় গলদ দেখলে তুমি?

: আমার প্রশ্নের জবাবে সুখেন বলতে পেরেছে লাইট-হাউসে কাল কি বই হচ্ছিল। সে স্বীকার করেছে ইতিপূর্বে ঐ ফিল্মটা আগে দেখেনি। ছবিটার গল্পের কথা আমি প্রশ্ন করেছিলাম—তার জবাবে ও এমন সিকোয়েন্সের কথা বলেছে যা ইন্টারভালের পরে দেখানো হয়। এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, গতকাল সন্ধ্যায় সে লাইট-হাউসে যায়নি ; আগেই ও ছবিটা আদ্যন্ত দেখেছে। ইন্টারভালে উঠে গেলে তার পরবর্তী সিকোয়েন্স সে কেমন করে জানল?

: ভেরি গুড! আর কিছু?

: দশটা দশে ও পার্কিং জোন থেকে গাড়ি নিয়ে বার হয়। দারোয়ান বলেছে, ঐ সময়ে—অর্থাৎ দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে একা কোন সাহেব গাড়ি নিয়ে বার হয়নি। যে চার-পাঁচজনের কথা ওর মনে পড়ছে তারা সকলেই ছিল যুগলে অথবা সদলবলে। একা কোন অল্পবয়সী ছেলে গাড়ি বার করেনি।

: এনিথিং এল্‌স্‌?

: দশটা দশে ও হোটেল থেকে বার হয়, বারোটা দশে আলিপুরে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে সে নিশ্চয় তার বন্ধুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। না হলে এতটা সময় লাগল কেন?

নির্মল বলে, কোন ফাঁকা জায়গায় বসে মনটাকে হয়তো শান্ত করছিল।

অজিত গুপ্ত বলেন, ছেলেটার ব্যাকগ্রাউণ্ড কী? কোন অতীত ইতিহাস আছে?

: বড়লোকের ছেলের মামুলি ইতিহাস। পড়াশুনায় ভাল নয়, বাপ তিন চারটে প্রাইভেট টিউটার রেখে কর্তব্য শেষ করেছেন। ছেলেটা মুখচোরা, লাজুক প্রকৃতির। বন্ধু-বান্ধব যা আছে সব বকাটে ধরনের। মদ খায়, সিগ্রেট খায়, অস্থানে-কুস্থানে যায়—কিন্তু পাড়ার মেয়েদের পিছনে লাগে না। মস্তানি করে না—

জীমূতবাহন তাঁর সিগারে আগুন দিতে দিতে বললেন, মিস্টার গুহ, আপনি সব কথাই বলেছেন, আসল খবরটা ছাড়া। ওর গাড়ি সার্চ করে—

: ও হ্যাঁ। আয়াম সরি। ওর গাড়ি সার্চ করে আমরা একখানা নিষিদ্ধ বই পেয়েছি—নিষিদ্ধ নয়, মানে ঐ 'সাগর-সঙ্গমে'—যেটা নিয়ে বিজয়বাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অজিত গুপ্ত বলেন, আই সি! সেটা ওখানে কেমন করে এল? সুখেন কী বলছে?

: স্বীকার করেছে বইটা তার ; কিন্তু কোথায় কিনেছে তা বলছে না।

জীমূতবাহন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, লুক হিয়ার জেণ্টেলমেন। মনোহর কানোরিয়া আমার বিশেষ পরিচিত, বন্ধু শ্রেণীর। একথা ঠিক নয় যে, সে পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহারের দিকে নজর দেয়নি। সুখেন কানোরিয়াকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। একথা ঠিক নয় যে, ছেলেটি মদ খায়, প্রস্‌কোয়ার্টার্সে যায়, বা সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করে। আপনি ঠিকই বলেছেন—ছেলেটি লাজুক, মুখচোরা, নিরীহ প্রকৃতির। তাহলে সিনেমা হলে সে ঐ মেয়েটির—ইয়েস, কাল সন্ধ্যায় ঘটনাচক্রে সে ঐ মেয়েটির ফাঁদে পা দেয়। জীবনে প্রথম তার পদস্খলন হয়। বাট হোয়াই? কেন? কী কারণে?

চুরুটটা আবার ঠোঁটের ফাঁকে ধরিয়ে তিনি তিনজন শ্রোতার দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে দেখেন। তাঁরা কেউ কোন কথা বলেন না—জীমূতবাহন বসু, এম. পি.—যাঁর তুঙ্গে এখন বৃহস্পতি, দিল্লি থেকে কলকাতা যাঁর প্রভাবে বেপথুমান—তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত

বাণী শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।

: তার একমাত্র হেতু ঐ 'পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার'—ঐ অশ্লীলতম গ্রন্থটা! ঐ বইটা পড়েই একজন উনিশ বছরের কলেজে পড়া ছোকরার মাথা ঘুরে গেছে—যে ছেলে এতদিন ছিল লাজুক, মুখচোরা, নিরীহ প্রকৃতির—আয়াম ইউজিং য়োর ঔন ওয়র্ডস্ গুহ —সে ছেলে এমন বেপরোয়া, ব্যভিচারী হয়ে উঠল কেন? তার একটি মাত্র জবাব : 'সাগর-সঙ্গমে'! জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! ঐ বইটা সমাজের কতখানি ক্ষতি করতে পারে তা আমরা হাতে-কলমে প্রমাণ করব। ডু য়ু গেট মি মিস্টার নিয়োগী?

নিয়োগী মাথা নেড়ে জানায় সে বুঝেছে।

: আপনাদের কারও মনে এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ আছে?

তিনজনেই নীরব।

: সো উই এগ্রি। আমরা সবাই একমত।—টেবিল থেকে টেলিফোনটা তুলে কি-একটা নম্বর ডায়াল করেন। কথা শুরু হতেই বোঝা যায় তিনি শিল্পপতি মনোহর কানোরিয়াকে ফোন করছেন। তাঁর পুত্রের কথা সব শুনেছেন বললেন জীমূতবাহন, যোগ করলেন এই বলে যে, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুখেন এবং তদীয় পিতার সম্মান রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। বলা বাহুল্য, ও প্রান্ত বিগলিত হলেন এ সংবাদে। জীমূতবাহন আলাপচারী শেষ করলেন এই কথা জানিয়ে যে, তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই মনোহরের ডেরায় পদধূলি দিতে আসছেন।

টেলিফোনটা রিসিভারে নামিয়ে রেখে উনি বিমান গুহকে বললেন, ইন্সপেক্টর, আপনার আসার দরকার নেই। আপনাকে দেখলেই সেই সুখেন ছোকরা হোস্টাইল হয়ে যাবে। আপনিই তাকে কাল রাত্রে ধরেছিলেন।

অজিত গুপ্ত বলেন, ঠিক আছে। গুহ আমাদের সঙ্গে যাবে না। আর কিছু?

জীমূতবাহন বলেন, প্রসিকিউশান উইটনেস্ কে কে হচ্ছেন?

নির্মল বললে, আমরা এখনও কিছু স্থির করিনি।

: কিন্তু দেরি করলে তো চলবে না। ভাল কথা, নির্মল, তোমার সঙ্গে তো ডক্টর আনন্দময় রায়ের আলাপ আছে—উনি একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় লোক, দর্শন এবং আইন দুটি বিষয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত—তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনে সপ্তাহে সপ্তাহে বক্তৃতা দেওয়ায় তাঁর একটা পাবলিক ইমেজও আছে। তাঁকে সাউণ্ড করে দেখেছ?

: দেখেছি স্যার। তাঁর সঙ্গে আমার প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছে। তাঁকে এক কপি 'সাগর-সঙ্গমে' পড়তেও দিয়ে এসেছি।

: কী বলছেন উনি?

: বইটা এখনও উনি শেষ করেননি।

: সে কথা নয়, বইটা পড়লে উনি সেটাকে চূড়ান্ত অশ্লীল বলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন—সুতরাং প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে উনি বাদীপক্ষের এক নম্বর সাক্ষী হতে রাজী? আফটার অল—আইন বিষয়ে উনি একজন অথরিটি। ম্যাজিস্ট্রেট ওঁর কথাতে প্রভাবান্বিত হবেই। আপীলেও—

: না স্যার, সে কথা কিছু হয়নি।

: তবে হোক।—টেলিফোনটা তুলে উনি নির্মলের দিকে বাড়িয়ে ধরেন। বলেন,

আমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই---যখন তাঁর সুবিধা হবে। আমরা তিনজন। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কর।

নির্মল নিয়োগীকে নোটবই দেখতে হল না। মিনতি রায়ের ফোন নম্বর তার মস্তিষ্কের একটা খোপে সযত্নে সঞ্চিত। ও প্রান্তে রিঙিং টোন; তারপর : হ্যালো, আনন্দ রায় বলছি!

: নমস্কার স্যার। আমি নির্মল।

: বল নির্মল। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু? মিনতিকে ডেকে দেব?

: না স্যার, দরকারটা আপনার সঙ্গে···মানে সেই 'সাগর-সঙ্গমে' মামলার ব্যাপারে। ইয়ে হয়েছে···আমি এখন মিস্টার জীমূতবাহন বসু, এম. পি.-র বাড়ি থেকে কথা বলছি। মিস্টার বসু এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান—মানে উনি একলা নয়, আমার 'বস' মিস্টার অজিত গুপ্তও থাকবেন। আপনি স্যার, কখন সময় দিতে পারবেন?

জবাবে আনন্দময় বোধহয় অনেক কিছু বললেন। কারণ নির্মল অনেকক্ষণ একটানা শুনেই গেল। তারপর টেলিফোনটা নামিয়ে বললে, উনি কেসটা ডিসকাস করতে রাজী। আজ সন্ধ্যা পাঁচটায়।

: হুঁ। কিন্তু এতক্ষণ উনি কী বলছিলেন—জানতে চান জীমূতবাহন।

: ঐ বইটার কথাই, মামলার বিষয়েই।

: বইটা উনি শেষ করেছেন?

: শুরুই করেননি বললেন।

## নয়

রবিবারের সকাল। আলিপুর রোডে প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষ। ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরে চারিটি প্রাণী। গৃহস্বামী মনোহর কানোরিয়া, তাঁর পুত্র এবং ব্যারিস্টার এ.কে.শর্মা। আর উপস্থিত আছে—অন্তরা। ওঁর শ্যালিকা। এই গোপনতম আলোচনা-চক্রে অন্তরাকে থাকতে দেবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না মনোহরের—হাজার হোক ও স্ত্রীলোক, আলোচনায় যৌন প্রসঙ্গ উঠতে পারে। তাছাড়া মেয়েমানুষের পেটে নাকি কথা থাকে না। অন্তরা এ পরিবারভুক্ত—বিশ্বাসঘাতকতা সজ্ঞানে সে করবে না, তা হলেও মেয়েমানুষের মন তো। তবু মনোহর একরকম বাধ্য হয়েই অন্তরাকে ডেকে এনেছেন এই গোপন মন্ত্রণা কক্ষে। ছেলেটা একমাত্র তার কথাই কিছুটা শোনে। সুখেনকে সামলে রাখতে হলে অন্তরা অপরিহার্য। তাই অন্তরা বসে ছিল সুখেনের পাশে, একই সোফায়। তার একখানা হাত আলতোভাবে পড়ে আছে সুখেনের পিঠে।

কানোরিয়া বলছিলেন, তা কেমন করে হবে মিস্টার শর্মা? সুখেন যে পুলিসের কাছে তার জবানবন্দী দিয়ে বসে আছে। সর্বসমক্ষে সে স্বীকার করেছে—

শর্মা বাধা দিয়ে বলেন, আপনি লীগ্যাল ইম্প্লিকেশনটা বুঝতে পারছেন না। পুলিসের কাছে জবানবন্দী দেওয়া এক জিনিস আর হলফনামা দিয়ে কোর্টে জবানবন্দী দেওয়া আর এক জিনিস। সুখেন অনায়াসে বলতে পারে সে সময় সে উত্তেজিত ছিল, তার মাথার ঠিক ছিল না, বন্ধুকে বাঁচাতে সে মিথ্যা কথা বলেছে।

সুখেন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বন্ধু-ফন্ধু কেউ নেই। আমার মাথার ঠিক তখনও ছিল,

এখনও আছে। আমি যা বলেছি, আদ্যন্ত সত্যি কথা বলেছি। ওরা যা পারে করুক। জেল দিতে চায় দিক—আমি গিল্‌টি প্লীড করব।

মনোহর করুণভাবে অন্তরার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। অন্তরা বাঁ হাতে সুখেনকে বেষ্টন করে ওর কানটা নিজের মুখের কাছে টেনে আনে। কানে কানে কিছু বলে। সুখেন জবাব দেয় না। গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

শর্মা তাঁর হারানো কথার খেই খুঁজে পান, সুখেন সব কথা এখন স্বীকার করে বলতে পারে কোন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বলতে পারে, তার বন্ধুই সব ব্যবস্থা করেছিল—বলতে পারে, বন্ধুই মেয়েটিকে আঘাত করেছে এবং বন্ধুই মেয়েটিকে এঞ্জয় করেছে—

: দ্যাটস্ নট কারেক্ট! কেন মিথ্যা কথা বলব আমি? আমিই সব কিছু করেছি। আমি একা। বলছি তো—জেল যেতে আমি রাজী। যা সত্য তা—

বাধা দিয়ে শর্মা বলেন, বেশ, তুমি যা বলছ তা আমরা মেনে নিচ্ছি—তুমি একাই ছিলে, একাই সব কিছু করেছ; কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার তো তোমার আছে। আত্মরক্ষার খাতিরে তুমি নতুন কথা বলতে পার। তোমার সেই নতুন কথাই হবে নতুন সত্য!

: আমি বানিয়ে বানিয়ে নতুন সত্য সৃষ্টি করব?

: আত্মরক্ষার তাগিদে। ইয়েস।

: যা ঘটেছে তাই কি সত্য নয়? সত্য কি কেউ সৃষ্টি করতে পারে?

: পারে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র সবাই সে কথা বলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যা রচিবে তাই সত্য, কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান,অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন।' শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী বলেছেন, 'আমি সত্য সৃষ্টি করি'।

অন্তরার বি. এ.-তে বাঙলায় অনার্স ছিল। তার ইচ্ছে করছিল—উঠে দাঁড়ায়। হলঘরটা অতিক্রম করে ঐ ব্যারিস্টার শর্মার কাছে চলে যায়, এবং তাঁর গালে ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে আবার ফিরে এসে নিশ্চুপ বসে পড়ে সোফায়, সুখেনের পাশে। আসলে সে কিন্তু সে-সব কিছুই করল না। সুখেনের কানে কানে কী যেন বলল শুধু।

মনোহর কানোরিয়া বললেন, কিন্তু খোকা যে কিছুতেই ওর বন্ধুর নামটা স্বীকার করছে না। আর সে হারামজাদা তো এমন ন্যাল্যা-ক্যাবলা নয় যে, মানিব্যাগে নাম খোদাই করাবে—আর প্রস্-কোয়ার্টার্সে ফেলে রেখে বাড়ি যাবে—

সুখেন দাঁড়িয়ে পড়ে। তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। অন্তরা তাকে দুহাত ধরে জোর করে বসিয়ে দেয় ফের। কঠিন স্বরে তার জামাইবাবুকে বলে, আপনি যদি এমন করে বলেন, তবে কিন্তু আমরা উঠে যাব।

স্পষ্টই সে তার বোনপোর পক্ষ নিয়েছে। এবার জ্বলে উঠল মনোহরের চোখ দুটো। তিনিও কিন্তু সামলে নিলেন নিজে থেকেই। শর্মা বললেন, ইয়েস মিস্টার কানোরিয়া! আমিও অন্তরা দেবীর সঙ্গে একমত। উত্তেজিত হবার কারণ অবশ্য যথেষ্ট আছে—কিন্তু আপনার মতো প্রবীণ অভিজ্ঞ লোকের কাছে আমরা আরও সহনশীলতা আশা করি। ওয়েল, যে কথা হচ্ছিল—সুখেন গিলটি প্লীড করতে চাইছে। কিন্তু অপরাধটা কী? মেয়েটি মারা যায়নি এখনও। জ্ঞানও ফিরে আসেনি তার। ঘটনা এখন তিন দিকে বইতে পারে। এক নম্বর, অজ্ঞান অবস্থাতেই মেয়েটির মৃত্যু হল। সে-ক্ষেত্রে সুখেন যা বলবে

তা করোবরেট হবার আশা কম। দু-নম্বর, মেয়েটির জ্ঞান ফিরল, একটা 'ডাইং ডিক্লারেশন' দিল এবং মারা গেল। সে-ক্ষেত্রে কেসটা হবে কাল্‌পেব্‌ল্‌ হোমিসাইড এবং সে-ক্ষেত্রে মেয়েটির মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর মূল্য হবে সব চেয়ে বেশি। সে-ক্ষেত্রে মেয়েটি যদি সুখেনের কোন বন্ধুর নাম উচ্চারণ করে তবে সুখেন চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারবে না—শর্মা এখানে থামলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখলেন কিশোর অপরাধীর দিকে। সে গোঁজ হয়ে বসে আছে। মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি।

: তৃতীয়তঃ, মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বেঁচে উঠতেও পারে। মেয়েটা কলগার্ল। টাকার লোভে দেহ বেচে বেঁচে আছে। তাকে যথেষ্ট টাকা খাওয়ালে সে হয়তো একটা নতুন গল্প ফাঁদবে, বলবে—হ্যাঁ, সুখেন তার ঘরে এসেছিল। বসেছিল, মানিব্যাগ বার করে সিগ্রেট কিনতে পয়সাও দিয়েছিল—আর কিছু করেনি। তার সঙ্গে মারামারি হয়েছিল অন্য একটি ছেলের। তার নাম সে বলবে না। সে-ক্ষেত্রে সুখেনের বিরুদ্ধে অ্যাটেম্প্‌ট্‌ টু হোমিসাইড-এর চার্জটাও টিকবে না। মেয়েটির বিরুদ্ধে অসৎ জীবন যাপনের একটা চার্জ হয়তো খাড়া করা যায় ; সেটা পুলিস ইচ্ছা করলে চেপেও যেতে পারে—আপনি প্রভাব খাটালে। বড়জোর কিছু ফাইন হয়তো হবে। সেটা আপনি দিতে পারেন। নয় কি?

মনোহর জবাব দিলেন না, বাহুল্য বোধে। তাঁর সুনাম, প্রতিপত্তি সবকিছু আজ ধূলিসাৎ হতে বসেছে। তার পরিবর্তে দুশ পাঁচশ ফাইনের টাকা তিনি দিতে রাজী কিনা এ প্রশ্নটাই বাহুল্য।

শর্মা সুখেনের দিকে ফিরে বললেন, সুখেন, তোমাকে আমি হাফ-প্যান্ট পরা অবস্থা থেকে দেখছি। আমি তোমার বাবার ব্যারিস্টার ; শুধু সেই পরিচয়েই নয়, তোমার কাকাবাবু হিসাবেই বলছি—যে স্ট্যাণ্ড তুমি নিচ্ছ সেটা ভুল। ইচ্ছে করলেই তুমি তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে পার না। আমি অ্যানালিসিস করে সেটা এইমাত্র দেখালাম। ওয়েল, তোমার বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা আমাকে মুগ্ধ করেছে—আমি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছি। কিন্তু তুমি যেভাবে তাকে বাঁচাতে চাইছ, সে ধরা পড়লে হয়তো এভাবে তোমাকে বাঁচাতো না।

: কেমন করে জানলেন?

: বাঁচাতো?

: আলবৎ!

হাসলেন বিচক্ষণ ব্যারিস্টার শর্মা। বললেন, দেয়ার য়ু আর! সুখেন, তুমি হয়তো খেয়াল করে দেখনি। আমার জেরায় এইমাত্র স্বীকার করলে যে তুমি একা ছিলে না!

: আমি কিছুই স্বীকার করিনি।

: করেছ। রাগ ক'রো না সুখেন। স্বীকার তুমি করেছ। তোমার বন্ধুর অস্তিত্বটাই যদি অস্বীকার কর তুমি, তাহলে কেমন করে বলছ 'আলবৎ'!

সুখেন নিশ্চুপ।

: নাউ, নাউ মাই বয়! সত্য কথাটা স্বীকার করে ফেল। ঠিক যা যা ঘটেছে। এখানে তো কোন টেপ-রেকর্ডার নেই। ইচ্ছে করলে তুমি আবার সব অস্বীকার করতে পার। বন্ধুকে বাঁচাতে তুমি যদি চাও তাহলে সব কথা আবার অস্বীকার কর বরং। কিন্তু আমার জানা দরকার আসল ঘটনাটা কী ঘটেছিল—বল, সুখেন! প্লীজ!

সুখেন একচুল বিচলিত হল না। বললে, আমি প্রথমে যা বলেছি তাই সত্যি। আমি একা ছিলাম। আমিই মেয়েটাকে এঞ্জয় করেছি। আমিই তাকে ধাক্কা মেরেছি—

: এবং আমিই মানিব্যাগটা ওর ঘরে ফেলে এসেছি।—দাঁতে দাঁত টিপে পাদপূরণ করলেন মনোহর কানোরিয়া।

সুখেন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আর একবার তার পিতৃদেবের দিকে তাকালো।

অন্তরার মনে হল---ছেলে খুনী, ছেলে ব্যভিচারী, এ জন্য তার জামাইবাবু ততটা ক্ষুব্ধ নন—ছেলের একমাত্র যে অপরাধটা উনি ক্ষমা করতে পারছেন না—সেটা ঐ আত্মগোপন করবার অক্ষমতা! বাঃ ! আদর্শ পিতা বটে! অন্তরা স্থির করল---আর নয়, এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা হলেই সে এ বাড়ি ছাড়বে। এ পরিবেশে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দিদির জন্য দুঃখ করে কী লাভ? তার অর্থের তো অভাব নেই। মাহিনা করা নার্স রাখবে। জামাইবাবুকে সে ঘৃণাই করে মনে মনে। একমাত্র বন্ধন ছিল এই সুখেন--- ছেলেটাকে ও ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসে। সে যে কেন এমন সৃষ্টিছাড়া হয়ে উঠছে জানতে বাকি নেই অন্তরার। বস্তুত ঐ ছেলেটার মায়াতেই সে পড়ে ছিল এ বাড়িতে। তা সেই সুখেন এখন যে স্ট্যাণ্ড নিয়েছে---তার জেল হবেই। তাই যদি হয়, তবে অন্তরাও এ বাড়ি ছাড়বে।

এই সময়ে রুদ্ধদ্বারে কে যেন বাইরে থেকে টোকা দিল। অন্তরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন গৃহভৃত্য একটি ট্রে বাড়িয়ে ধরে। তাতে একটা ভিজিটিং কার্ড। সেটা দেখে মনোহর কানোরিয়া শর্মাকে বললেন, মিস্টার জীমূতবাহন বসু এবং কয়েকজন হাই-র‍্যাঙ্কিং পুলিস অফিসার এসেছেন। আসতে বলব?

: জীমূতবাহন বসু? এম.পি?

: হ্যাঁ—আমাকে ফোনে জানিয়েছেন, এ বিপদ থেকে আমার উদ্ধারের জন্য তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত।

: ভেরি ওয়েল। ওঁদের আসতে বলুন।

একটু পরে জীমূতবাহন, অজিত গুপ্ত এবং নির্মল নিয়োগী এসে বসলেন। সৌজন্য বিনিময়ের আগেই জীমূতবাহন মনোহরকে বললেন, এ মেয়েটি?

: আমার শালী। ও থাক। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

: না, ভয় পাওয়ার কি আছে? আমাদের ডিলিংস সব ফেয়ার অ্যাণ্ড অ্যাবাভ বোর্ড। আপনার বিপদের কথা সব শুনেছি। এঁদের সঙ্গে করেই এনেছি। আমি চাই না—এ নিয়ে একটা স্ক্যাণ্ডাল ছড়াক। এর ধাক্কা শেষ পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার ইণ্ডাস্ট্রিতে পর্যন্ত গিয়ে লাগবে। মিস্টার গুপ্ত—অজিত গুপ্ত, আমার সঙ্গে একমত। আমরা মামলাটা চালাতেই চাই না আদৌ।

অজিত গুপ্ত এত বড় কথাটা বেমালুম গিলতে পারলেন না। বললেন, এখনই সে কথা বলা যায় না স্যার। মেয়েটি যদি না বাঁচে—

: অফকোর্স! অনেক 'ইফ্' আর 'বাট' আছে এর মাঝখানে। আমি মোদ্দা এই কথা বলতে চাইছি—একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির পারিবারিক জীবনে কদর্ম নিক্ষেপ করার বাসনা পুলিসের আদৌ নেই। তার মানে এ নয় যে, দেশে আইন নেই। অ্যাম আই ক্লীয়ার?

কেউ জবাব দেয় না। জীমূতবাহন এবার সুখেনকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার

প্রতি কোন সহানুভূতি আমি জানাব না—কারণ আমি জানি, এ আঘাত সইবার তাগৎ তোমার আছে। তোমার জবানবন্দী আমি পড়ে দেখেছি—সোজা এবং সরল। আই অ্যাডমায়ার য়োর গাট্‌স্‌। ঘটনাচক্রে তুমি জড়িয়ে পড়েছ—কিন্তু বন্ধুকে তুমি ফাঁসাওনি।

: আমার কোন বন্ধু ছিল না। আমি একা ছিলাম।

: ঠিক আছে। তাই ছিলে। তোমার বন্ধুর প্রসঙ্গ আদৌ না তুলে আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই—তোমাকে এবং তোমার বাবাকে বাঁচাবার জন্যই—তুমি জবাব দেবে?

: আপনার প্রশ্নগুলো শুনলে বলতে পারব জবাব দেব কি না।

: তোমার গাড়ির ভিতর একখণ্ড 'সাগর-সঙ্গমে' বই পাওয়া গেছে। সেটা তুমি পড়েছ?

: পড়েছি।

: কবে?

: গতকাল দুপুরে।

: বইটি কোথা থেকে পেয়েছ? তুমি কিনেছ?

: না। বইটা আমাকে একজন পড়তে দিয়েছে।

: সে কে?

: আমি বলব না। তবে আমার সেই বন্ধু নয়।

জীমূতবাহন মাথা নেড়ে বলেন, সুখেন, তুমি জেরায় বিপদে পড়বে কিন্তু। বন্ধুর অস্তিত্বই তুমি স্বীকার করছ না, তাহলে 'সেই বন্ধু নয়' বলছ কেন?

সুখেন আড়চোখে অন্তরাকে একবার দেখে নেয়। আবার গোঁজ হয়ে বসে।

: ঠিক আছে! বইটা তোমাকে কে দিয়েছে সে কথা বলতে না চাও তো নাই বললে। তুমি বরং বল—বইটা পড়ে তোমার কী মনে হয়েছে? কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে?

: বইটা অশ্লীল।

: রাইট! বইটা 'অবসীন'। পড়ে তুমি উত্তেজনা বোধ করছিলে?

: হুঁ!

: এ জাতীয় অশ্লীল বই তুমি আগে কখনও পড়েছ?

: এত খেউর-অলা বই পড়িনি।

: এই বইগুলির মধ্যে তুমি কোন কোনটা পড়েছ? ফ্যানি হিল, ট্রপিক অব ক্যানসার, পীটন প্লেস, লেডি চ্যাটার্লির লাভার?

: একখানাও পড়িনি।

: আচ্ছা, এই বাঙলা বইগুলোর মধ্যে কোনটা পড়েছ? অচিন্ত্যের 'প্রাচীর ও প্রান্তর', বুদ্ধদেবের 'রাত ভোর বৃষ্টি', প্রবোধ সান্যালের 'দুই আর দুয়ে চার' কিংবা সমরেশ বসুর 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক'?

'রাত ভোর বৃষ্টি' পড়েছি। 'বিবর'ও পড়েছি।

: সে দুটো তোমার কাছে অশ্লীল মনে হয়েছিল?

: 'সাগর-সঙ্গমের' তুলনায় কিছুই নয়।

: আচ্ছা সুখেন, এবার বল—বইটা তো তোমার খুব অশ্লীল লাগল ; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কি হল?

সুখেন নীরব।

: তোমার মাসিকে উঠে যেতে বলব?

: না। মাসির কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নেই। আমি—আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। একটা—একটা—কী বলব? একটা মেয়েকে হাতের কাছে পেতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

: দ্যাট'স ইট। এ কথার মধ্যে মিথ্যা কিছু নেই তো? আদ্যন্ত সত্য?

: মিথ্যা কেন থাকবে?

জীমূতবাহন ঘুরে বসলেন। শর্মার মুখোমুখি। বললেন, মিস্টার শর্মা! আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এইটুকু স্বীকারোক্তি আমরা চাই। যা সূর্যোদয়ের মত সত্য, যা ও নিজে থেকে বলেছে।

: কী?—আরও স্পেসিফিক হতে চাইলেন ব্যারিস্টার শর্মা।

: আমরা মনে করি—আই মীন প্রসিকিউশান মনে করে, সুখেন কানোরিয়া একটা ঘটনাচক্রের শিকার—ভিকটিম্ অব দ্য সার্কামস্টান্স। ও সৎ বংশের সন্তান। লাজুক, নিরীহ, সৎ—ওর বিরুদ্ধে জুভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্সির কোন নজির নেই থানার রেজিস্টারে। ও ক্ষণিক উন্মাদনায় একটা অপরাধ করে বসেছে। সেই উন্মাদনাটার জন্য দায়ী ঐ বইটা, 'সাগর-সঙ্গমে'। এই ঘটনার জন্য দায়ী—হাড্রেড পার্সেন্ট দায়ী—ঐ অশ্লীল বইটা। সুখেনকে শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না—কিন্তু বইটাকে কোনক্রমেই ক্ষমা করা চলে না। অ্যাম আই ক্লীয়ার?

শর্মা মাথা নেড়ে বললেন, নট কোয়াইট। ঠিক বুঝলাম না—

: শুনুন। এই মামলাটা—অর্থাৎ সুখেনকে আসামী করে যে মামলাটা হবে তা আমরা এখন ঝুলিয়ে রাখছি। আমরা আদালতের কাছে সময় চাইব। বস্তুত তা আমাদের চাইতেই হবে, যতদিন না ঐ মেয়েটার ভালোমন্দ কিছু হয়—আই মীন, তার জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু আর একটা মামলা ইতিমধ্যে কোর্টে উঠেছে। কাগজে দেখে থাকবেন। সেকশান 292। ঐ 'সাগর-সঙ্গমে' বইটার ব্যাপারে। সেই মামলায় সুখেনকে সাক্ষী দিতে হবে। সে বলবে—এইমাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে যা বলল। বিনিময়ে পুলিস ওর মামলাটায় ওর অপরাধ যতটা সম্ভব লঘু করে দেখবে। মেয়েটি বেঁচে গেলে হয়তো কেস চালাবেই না। অ্যাম আই কারেক্ট?

এবার উনি প্রশ্ন করলেন অজিত গুপ্তকে। তিনি গ্রীবা সঞ্চালনে সম্মতি জানালেন।

শর্মা বললেন, জেন্টেলমেন্স এগ্রিমেণ্ট। আমার ক্লায়েন্ট রাজী।

কোথাও কিছু নেই রুখে উঠল সুখেন, না। আমি রাজী নই।

মহড়া নিলেন জীমূতবাহন : রাজী নও? কেন? তুমি তো নিজেই বললে—

: আপনার কাছে বলেছি। আদালতে বলব না। আদালতে আমি উঠব আসামী হয়ে। সাক্ষী দিতে নয়!

: কিন্তু কেন?

এবার কথা বলে অন্তরা। বলে, আমি বলছি। দেখুন, ওর এখন যা মনের অবস্থা, সব 'কেন'র জবাব ও এখনই দিতে পারবে না। আপনাদের প্রস্তাব ও শুনেছে, আমিও শুনেছি। আমরা পরামর্শ করে পরে আপনাদের জানাব। আপনারা অনুমতি করলে আমরা এখন যেতে পারি?

মনোহর কানোরিয়াকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। তিনি এ সংসারের কর্তা—ঐ দুর্বিনীত ছেলেটির জনক ; অথচ কেমন করে যেন রঙের টেক্কাটা চলে গেছে অন্তরার হাতে। কারও কোন অনুমতি না নিয়েই অন্তরা উঠে দাঁড়ায়। বোনপোর হাত ধরে টানে, আয় রে সুখেন!

ওরা চলে যায়। বাদ-বাকি সবাই নির্বাক বসে থাকেন।

## দশ

সারা রাত্রের মধ্যে দু-চোখের পাতা এক করেনি। চোখ দুটো করকর করছে। প্রদীপ অবশ্য বলেছিল, এখানেই কিছু খেয়ে নিয়ে লম্বা একটা ঘুম দে, আজ তো রোববার। ভাস্কর রাজী হয়নি। বলেছিল, না, এখন অনেক কাজ। তুই সলিলকে খবর দে। আমাদের অফিস-ঘরটা আজকেই সাজিয়ে ফেল। সোমবার সকালে আমরা যে যার অফিস গিয়ে রেজিগনেশান সাবমিট করে নতুন অফিসে চলে আসব। ইন্‌জাংশানটাকে ঠেকাতে হবে।

প্রদীপ বললে, তাহলে আর এক কাপ কফি খাওয়া যাক। দেখি, খবরের কাগজটা এসেছে কি না। বিজয়বাবুর গ্রেপ্তারের খবরটা কী ভাবে ছেপেছে দেখি—

কফি খেতে খেতেই এল সংবাদপত্র। ইংরেজি এবং বাঙলা। সব কাগজেই সংবাদটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। বইটির বিক্রয় বন্ধ করার জন্য পুলিস পক্ষ থেকে যে আবেদন করা হয়েছে তাও জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, সোমবার এ বিষয়ে নির্দেশ জারী হবে বলে আশা করা যায়।

প্রদীপ বললে, তার মানে অধিকাংশ দোকানেই আগামীকাল বইটা বিক্রি হবে না। প্রথমত, বিজয়বাবুর মত বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন এ খবরটা তারা পড়বে ; দ্বিতীয়ত, তিনি যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন সেটা জানবে না ; এবং তৃতীয়ত, ভাববে, সোমবার ফার্স্ট-আওয়ারে ইন্‌জাংশন জারী হলে বই বিক্রি করাটা হবে একেবারে সরাসরি আদালত-অবমাননা!

ভাস্কর সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, প্রদীপ! আরও একটা দুঃসংবাদ ছাপা হয়েছে কাগজের তিন নম্বর পাতায়।

দুজনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে একটি মেয়ের অচেতন দেহ আবিষ্কারের কাহিনী। মেয়েটির পূর্ণ পরিচয় নেই—নাম ডরোথি কাপুর। সংবাদে প্রকাশ, সন্দেহক্রমে বিখ্যাত শিল্পপতি মনোহর কানোরিয়ার পুত্র ঊনবিংশতি বর্ষীয় সুখেন কানোরিয়াকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে এবং জামিনে ছেড়ে দিয়েছে। সুখেন কানোরিয়া নাকি পুলিসের কাছে স্বীকার করেছে যে, সে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তার মোটরগাড়ি থেকে একখণ্ড 'সাগর-সঙ্গমে' নামক পুস্তকও উদ্ধার করা গেছে। এই বইটি অশ্লীল—এই অভিযোগে পুলিস নাকি একটি পৃথক মামলা এনেছে ফার্স্ট-ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীখগেন খাসনবিশের এজলাসে। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, সুখেন কানোরিয়া পুলিসকে বলেছে—ঐ অশ্লীল পুস্তকটি পাঠ করেই ক্ষণিক উত্তেজনায় সে এই জঘন্য সমাজবিরোধী কাজে অংশ নিয়েছিল।

প্রদীপ বললে, বাঃ! ভরাডুবি হতে যেটুকু বাকি ছিল তা করে গেল ঐ অকালপক্ক

সুখেন কানোরিয়া! তিনি ভাজা মাছের অপর পিঠটি কখনও দেখেননি—এই 'সাগর-সঙ্গমে' তাঁর মাছভাজাখানা উল্টে দিয়েছে!

ভাস্কর বললে, প্রদীপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এর পেছনে কারও হাত আছে। পুলিস নিজে থেকে এভাবে তোর পিছনে লাগবে কেন?

: কি জানি ভাই! জেনে শুনে তো কারও শত্রুতা করিনি।

: সে যাই হোক। আমি চলি। এখন আমাদের অনেক কাজ—

: বাড়িতেই যাচ্ছিস তো?

: না। আমি এখান থেকে প্রথমে যাব রেবার কাছে।

: রেবা? মানে তোর সেই মক্কেল? এই সাত-সকালে তার কাছে কেন?

: একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে। কাল সেই সিদ্ধান্তে এসেছি।

প্রদীপ হেসে বললে, কংগ্র্যাচুলেসন্স!

ভাস্করও হেসে বললে, সেম টু ইউ।

: কেন, আমাকে অভিনন্দন জানাবার আবার কি আছে? এ কথার মানে?

ভাস্কর গতকাল রাত্রে প্রদীপের কথাটা তাকে ফিরিয়ে দিলে : মানেটা তোর জানা। অনেকদিন পর হঠাৎ শুনলি তো, তাই ধরতে পারছিস না।

প্রদীপের অফিস থেকে বেরিয়েই একটা ফাঁকা মিনিবাস পেয়ে গেল। জানলার ধারে বসে ও মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। সকাল এখন মাত্র সাড়ে-সাতটা। এত সকালে তাকে দেখে রেবা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। আরও অবাক হবে ওর সিদ্ধান্তটা শুনে। 'সাগর-সঙ্গমে' বইখানা ও সঙ্গে করে এনেছে। ভাস্কর সেটা রেবাকে পড়তে দেবে। সে জানতে চাইবে রেবার কী মনে হল বইটা পড়ে। সেটা রসোত্তীর্ণ সাহিত্য, না পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার? নিশ্চয় রেবা বইটির সাহিত্যিক মূল্যটা প্রণিধান করবে—সে যেমন করেছে। রেবাও বাঙলা-অনার্সের ছাত্রী ছিল। আশ্চর্য, ঐ অপরিণতবয়স্ক ছোকরা কেমন করে বলল যে, ঐ বইটাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে ডরোথি কাপুরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত হতে? সত্যিই সে তা বলেছে, না পুলিসের প্যাঁচ? বইটি উত্তেজক, স্বীকার করতে বাধ্য ভাস্কর। তার নিজেরও চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটেছিল। কিন্তু সে দৌর্বল্য সে জয় করেছে—তাকে অভদ্র কোন কিছু করতে বইখানা প্ররোচিত করেনি। তবে এ কথা মানতে হবে—তার বয়স বেশি, অভিজ্ঞতা বেশি, ঐ সুখেন কানোরিয়ার মত চ্যাংড়া নয় সে। ভাস্কর একান্তভাবে প্রার্থনা করতে থাকে—রেবা যেন তার সঙ্গে একমত হয়। সে যেন পাঁকটাকে অস্বীকার করে পদ্মফুলটাকেই দেখতে পায়। রেবার সঙ্গে সে জীবনে জীবন যোগ করতে চলেছে—দৃষ্টিভঙ্গির সমতা এক্ষেত্রে একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

রেবা সেনের বাড়ির সামনে যখন সে পৌঁছলো তখনও আটটা বাজেনি। কলিং-বেল টিপতে যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনি ভাস্করের অপরিচিত। তার চেয়ে বছর পাঁচ-সাতের বড়ই হবেন বোধহয়। স্যুটপরা সুদর্শন যুবক। বললেন, কাকে চাই?

: মিসেস্ সেন। আছেন নিশ্চয়?

: আছেন। বসুন। কে এসেছেন বলব?

: ভাস্কর মুখার্জি।

আজ ভাস্কর বসে রইল বৈঠকখানায়। স্যুটধারী চলে গেলেন ভিতরে। অল্প পরে ফিরে এলেন রেবাকে সঙ্গে করে। রেবা খুশিয়াল হয়ে ওঠে : কী সৌভাগ্য! এত

সকালে?

ভাস্কর জবাব দেবার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আমি তাহলে চলি মিসেস্ সেন। দরকার হলে খবর দেবেন।—ভাস্করের দিকে দ্বিতীয়বার দৃকপাত না করেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

: কে উনি?—প্রশ্ন করে ভাস্কর।

রেবা মিটি-মিটি হাসছে। একটু থেমে জবাবে বললে, ধর তোমার রাইভাল! ডুয়েল লড়তে পারবে?

ভাস্কর বলে, পারব। যদি আশ্বাস দাও এঁকে বধ করার পরে আর কোন রাইভাল উইংসের ধার থেকে আবার টপাৎ করে বেরিয়ে আসবে না।

খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে রেবা। বলে, ঘাবড়াবার দরকার নেই। উনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

: এত সকালে কল দিয়েছ? শরীর ভাল তো?

এবারও বিচিত্র হেসে রেবা বললে, ভাল। ইন ফ্যাক্ট্ উনি আমার শরীরের খবর নিতে আসেননি, এসেছিলেন মনের খবর নিতেই।

: তার মানে উনি সত্যিই আমার রাইভাল?

: আমি যখন অভয় দিচ্ছি, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন?

: সোজা কথাটা স্বীকার কর রেবা। উনি কি তোমাকে বিয়ে করতে চান?

: না। শুধু আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে। উনি বিবাহিত।

: তবু তুমি লোকটাকে সহ্য কর?

: উপায় কি বল? এ জাতীয় বিপদে মেয়েদের রক্ষা করে তার স্বামী। আমার তো--

ভাস্কর বলে, জানি। সেই কথাই বলতে এসেছি এই সাত-সকালে।

: রিয়েলি? কি কথা?

: তোমার সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে যেতে রাজী। তবে তার আগে আমাদের দুজনকে একবার ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে যেতে হবে। কবে যাব আমরা?

ভেবেছিল রেবা খুশিয়াল হয়ে উঠবে। তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না কিন্তু। একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, আদৌ যাব কিনা স্থির হ'ক। তারপর তো 'কবে যাব' স্থির হবে।

ভাস্কর একটু আহত হল। বললে, তার মানে?

: তার মানে ছেলেরা প্রপোজ করে। মেয়েরা সম্মতি দেয়। তারপর বিবাহের দিন স্থির হয়।

: তুমি কি সম্মতি দিচ্ছ না?

: তুমি কি আমার সম্মতিটা জানতে চেয়েছ?

: এবার তো চাইছি—

আবার খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে রেবা। বলে, ওরে বাবা! বাবুর রাগ আছে ষোল আনা! একটু বস, চায়ের জলটা বসিয়ে দিয়ে আসি। ঝিটা নেই।

ভাস্কর কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল। তার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। কাব্যের ভাষায় যাকে বলে 'হৃদয়বীণা', তার তারগুলো কেমন যেন ঢিলে ঢিলে হয়ে গেছে। যেমনটি সে আশা করেছিল তেমনটি ঘটল না। প্রথমেই ঐ ডাক্তার ভদ্রলোক—ঝি নেই বাড়িতে—

তবু অর্গলবদ্ধ গৃহে ওরা ছিল দুজন। হোক ডাক্তার, তবু—তাছাড়া রেবা তো কই খুশিয়াল হয়ে উঠল না তার প্রস্তাবে? ঐ ডাক্তার ভদ্রলোক কি সত্যিই ভাস্করের প্রতিদ্বন্দ্বী? রেবার মন কি দ্বিখণ্ডিত? সে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেনি? রেবা তাহলে কেমনতর মেয়ে? ওর সাত বছরের ছেলেটাকে কেন নিজের কাছে রাখে না? সেটাই কি স্বাভাবিক হত না এই সদ্যোবিধবা নারীর পক্ষে? রেবা সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী—তার একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। নিঃসন্দেহে যৌন আকর্ষণ, কিন্তু ভাস্কর কি ভুল করছে? রেবার সঙ্গে তার সত্যিকারের মনের মিল হবে তো? সে কি কাল রাত্রে ঐ বইটা পড়ে উত্তেজনার বশে আজ বিবাহ-প্রস্তাব করে বসল? রাত পোহাতেই? যেমন করে ঐ সুখেন কানোরিয়া তড়িঘড়ি—

রেবা ফিরে এল। বসল মুখোমুখি। বললে, জান, কাল সারারাত ঘুমোইনি।

ভাস্কর একটু খোঁচা দেবার জন্য বললে, কেন? ডাক্তারবাবু কি সারারাত তোমার চিকিৎসা করছিলেন?

রেবা ওর গালে ঠোনা মেরে বললে, হিংসেটি ষোল আনা! না, একটা বই পড়ছিলাম। দারুণ বই!

ভাস্কর উৎসাহিত হয়, কী বই? যা সারারাত জেগে পড়তে হয়?

রেবা উঠে গেল। ড্রয়ার খুলে বার করে আনল বইটা।

ভাস্কর এক নজর দেখে বললে, দারুণ বই মানে? কী ধরনের দারুণ?

: ভীষণ সেক্সি! একেবারে পাগলা করে দেয়। নিয়ে যাও না। পড়ে ফেরত দিও। তবে লুকিয়ে প'ড়ো। বইটা প্রোসক্রাইবড!

মায়ের কাছে মাসীর গল্প। ভাস্কর শুধু বললে, কোথায় পেলে বইটা?

রেবা মুখ লুকিয়ে হাসল। তারপর চোখে চোখ রেখে বললে, সত্যি কথাই স্বীকার করব ; কিন্তু বল—রাগ করবে না?

: রাগ করব কেন? কোথায় কিনলে তাই তো জানতে চাইছি।

: কিনিনি। একজন কাল পড়তে দিয়েছিল।

: কে?

: ঐ যাঁকে একটু আগে দেখলে। ভদ্রলোক তাই সাত-সকালে জানতে এসেছিলেন বইটা পড়ে আমার কেমন মনে হয়েছে! রি-অ্যাকশনটা কী জাতের হল!

: কী বললে তুমি?

: বলেছি—'ভালগার'। বলেছি, এমন বই আমাকে পড়তে দেওয়া আপনার উচিত হয়নি। বইটা অপাঠ্য!

: সেইটেই তোমার সত্যিকারের মতামত!

: হ্যাঁ। তুমি পড়ে দেখ।

: বইটা যদি 'ভালগার' এবং অপাঠ্যই তবে আমাকে পড়তে বলছ কেন?

: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালগারিটি বলে কিছু নেই।

: আমরা কী স্বামী-স্ত্রী?

: আইনত না হলেও তাই নই কি? নিয়ে যাও বইটা।

: ভাস্কর বললে, দরকার হবে না, রেবা। বইটা আমিও কাল সারারাত ধরে পড়েছি। আমিও রাত্রে ঘুমোইনি। ইন-ফ্যাক্ট বইটা তোমাকে পড়তে দেব বলে সঙ্গে নিয়েই

এসেছি।

চোখ বড় বড় করে রেবা বললে—ও! তাই বল! তাই এত সাত-সকালে খিদের গুঁতোয় আমার কাছে এসে হাজির হয়েছ? আমারও এখন যে অবস্থা তোমারও তাই?

ভাস্কর চঞ্চল হয়ে বলে, কী অবস্থা? আমি তো নিজেকে উত্তেজিত মনে করছি না! আমি তো সেজন্য তোমার কাছে আসিনি!

রেবা ওর হাতটা টেনে নেয়। বলে, মনের অগোচরে পাপ নেই। আমি তোমার অবস্থাটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি ভাস্কর। 'পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ'-এর দরকার নেই--এস, ওপরের ঘরে। তুমিও জুড়োও, আমিও জুড়োই।

রেবা ওর হাত ধরে আকর্ষণ করে।

সেই মুহূর্তে ভাস্করের মনে হল : অপ্রকাশ গুপ্তের 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা অবসীন!

: আচ্ছা বাপু আচ্ছা। তোমার 'প্রপোজাল' আমি 'অ্যাকসেপ্ট' করলাম। যাব, তোমার হাত ধরে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে আমি যেতে রাজী। হল তো? এখন ওঠ। চল, ওপরের ঘরে যাই।

ভাস্করের ভীষণ কান্না পাচ্ছে। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, অপ্রকাশ গুপ্ত মারা গেছেন বটে, কিন্তু 'সাগর-সঙ্গমে' বইটাকে সে হত্যা হতে দেবে না। রেবা তার চোখের সামনে সেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যগ্রন্থটাকে পাঁকের মধ্যে টেনে ফেলছে! সে একা নয়—ভাস্করের হাত ধরে সে টানছে! তার সাহায্য চাইছে! ভাস্করও হাত মেলাক! দুজনে ঐ বইটাকে ওরা কৃমিকুণ্ডের পাঁকে চেপে ধরবে এবার! অবিবাহিত যুবক ভাস্কর মুখার্জি এবং সদ্যোবিধবা রেবা সেন!

: কী হল বল তো তোমার?

হঠাৎ ওর হাত ছাড়িয়ে ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। একটা কথাও বলে না। দ্বার খুলে বেরিয়ে আসে।

বাইরে প্রতীক্ষা করেছিল প্রভাত-সূর্যের আলো। পথে নামতেই সেই রৌদ্রালোকে অবগাহন স্নান করল ভাস্কর।

খোলা দরজার ফ্রেমে স্তম্ভিত রেবা একটা কথাও বলতে পারল না।

## এগারো

: তাহলে আর কী আলোচনা করব আমরা? আপনি বলছেন, আমি আপনাকে যে বইখানা দিয়ে গেলাম সেখানা আপনি পড়েই দেখেননি।

আনন্দময় মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, আমি দুঃখিত। সত্যিই তোমার রেখে যাওয়া বইটা আমি পড়িনি।

অজিত গুপ্ত আড়চোখে একবার জীমূতবাহনকে দেখে নিলেন। ওঁরা তিনজনে এসে জাঁকিয়ে বসেছেন আনন্দময়ের বৈঠকখানায়। 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা অশ্লীল কি না এ নিয়ে একটা 'অ্যাকাডেমিক' আলোচনায়—আনন্দময়ের—যাকে বলে 'এক্সপার্ট ওপিনিয়ন' নিতে।

অজিত গুপ্ত বলেন, আমি ভেবেছিলাম নির্মলের রেখে যাওয়া বইটা আপনি নাড়াচাড়া করেছেন।

: নাড়াচাড়া করিনি, তা তো আমি বলিনি।

: কিন্তু পড়েননি!

: না।

জীমূতবাহন বললেন, অথচ আপনি ও বিষয়ে আলোচনা করতে রাজী হলেন! নির্মলকে টেলিফোনে তো সেই রকমই বললেন! জাস্ট এ মিনিট! আইনের ফাঁকে আপনি পাশ কাটাচ্ছেন না তো ডক্টর রায়? নির্মলের রেখে যাওয়া বইটি আপনি পড়েননি বলছেন; কিন্তু আপনি কি তাহলে ঐ বই---ভারতী প্রকাশনীর 'সাগর-সঙ্গমে' বইটির অন্য কোনও কপি পড়েছেন?

: না।

নির্মল সোজা হয়ে বসে। বলে, স্যার, এবার বলুন---অপ্রকাশ গুপ্তের লেখা 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা আপনি পড়েছেন?

হো-হো করে হেসে উঠলেন আনন্দময়। বললেন, জেরা যখন করবে তখন ঠিক করে কর নির্মল! কী প্রশ্ন করছ, কী তার উত্তর হবে তা খেয়াল রেখো। ইয়েস, অপ্রকাশ গুপ্তের 'সাগর-সঙ্গমে' পড়েছি আমি এবং সে বিষয়ে তোমরা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাও বলে তোমাদের আসতেও বলছি।

অজিত গুপ্ত বলেন, গুড হেভেন্স! তার মানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাজেয়াপ্ত বইটার একটা কপি আপনার পড়া আছে! কতদিন আগে পড়েছেন?

: চল্লিশ বছর!

তিনজনে এতক্ষণে উৎসাহিত বোধ করেন। সতর্ক হন। অজিতবাবু বলেন, বইটা পড়ে সে সময় আপনার কি মনে হয়নি যে, বইটা 'অবসীন'? ওটা বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত?

: না। তা মনে হয়নি।

: অর্থাৎ জাস্টিস্ জনসনের রায়ের সঙ্গে আপনি একমত নন?

: না। বইটা সেদিন আদৌ 'অবসীন' মনে হয়নি আমার।

জীমূতবাহন বলেন, এবার একটু বিস্তারিত কথাবার্তা হ'ক। ঐ বইটাতে এমন শব্দ মুদ্রিত হয়েছে যা ছাপা বইতে কখনও থাকে না। পাবলিক ল্যাট্রিন ছাড়া সে শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় না। শুধু সেইজন্যই বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত নয়?

আনন্দময় বললেন, না। প্রথমতঃ, আপনার কথা ঠিক নয়। শব্দগুলি শুধুমাত্র পাবলিক ল্যাট্রিনের দেওয়ালেই ব্যবহৃত হয়, একথা সত্য নয়। শব্দগুলি অভিধানে নেই --কিন্তু তার অর্থ অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক লোকই জানে। সভ্য সমাজে শব্দগুলির ব্যবহার না থাকলেও—তথাকথিত ইতর সমাজে সেগুলি বহুল-ব্যবহৃত। লেখক যে পরিবেশের চিত্র এঁকেছেন—একটা বেশ্যালয়---সেখানে ঐ শব্দগুলি আদৌ অপরিচিত নয়। দ্বিতীয় কথা—শুধুমাত্র ঐ শব্দগুলির ব্যবহারের জন্য গ্রন্থটি অশ্লীল হতে পারে না। যেহেতু তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে একটা শব্দ অপ্রচলিত, অথচ অশিক্ষিত নিম্নবিত্তের মানুষের মধ্যে সুপ্রচলিত, তাই তার ব্যবহার গোটা বইটিকে অশ্লীল করে দিতে পারে না। আমি একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোধগম্য হবে: বাংলা তেরশ এক সনে রবীন্দ্রনাথ 'লোক সাহিত্য' রচনা করতে একটি সর্বজনবিদিত বাঙলা ছড়ার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। ছড়াটি শোনেনি এমন বাঙালী বিরল। তার শুরু 'আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার

বিয়ে—'। সেই ছড়ার চতুর্দশ লাইনে এসে রবীন্দ্রনাথ হোঁচট খেলেন। তিনি লিখলেন 'বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে। সেই-যে বোন—'—আর লিখতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন : "এখানে পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন তাঁহার পূর্ব ব্যবহার কোন ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণত, এরূপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না যাহা আমি অদ্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না। কারণ, তাহার মধ্যে কতকটা ইতরভাষা আছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণ রস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে 'ভর্তৃখাদিকা' বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই কলিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম : বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে/সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে।"...বুঝুন কাণ্ড! বাঙলা ছড়ার ঐ 'অতি নিরীহ ভাতারখাকী' শব্দটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য কত কসরৎ করতে হয়েছিল আশি বছর আগে। কেন? ঐ 'ভাতারখাকী' শব্দটা বাঙলাদেশের অসংখ্য গ্রামে লক্ষ লক্ষ মা-ঠাকুরমা ঘুম-পড়ানি ছড়ায় উচ্চারণ করেছেন---স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রাম্য মানুষ তা শুনেছে, কেউ কানে আঙুল দেয়নি; কিন্তু ছাপার হরফে 'ভাতারখাকী'কে হতে হবে 'ভর্তৃখাদিকা', অন্ততপক্ষে 'স্বামীখাকী'। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ইতর ভাষাকে অতিক্রম করে এখানে অনেক বড় হয়ে উঠেছে করুণ রস! সাহিত্যে ঐটি শেষ কথা জীমূতবাবু! 'নীতি'র চেয়ে বড় কথা 'রস'!

জীমূতবাহন বলেন, আমি কিন্তু আপনার যুক্তি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। 'ভাতারখাকী' শব্দটা আদৌ অশ্লীল নয়। 'সাগর-সঙ্গমে' ব্যবহৃত খিস্তির ভাষার তুলনায় 'ভাতারখাকী' তো পুজোর মন্ত্র।

আনন্দময় বললেন, ঐটাই তো মজা জীমূতবাবু—আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি—আজ আপনি বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দাঁড়িয়ে কিছুতেই অনুভব করতে পারবেন না—কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে প্রগতির ধ্বজাধারী রবীন্দ্রনাথ ঐ ছড়াটা আদ্যন্ত উদ্ধৃত করতে পারেননি। আজ আপনার কাছে সাগরসঙ্গমে-গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দগুলি যতদূর অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে, আশি বছর আগে ঐ 'ভাতারখাকী'ও সেই ব্রাহ্মসমাজীদের পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের কাছে ততখানি অশ্লীল বলেই মনে হয়েছিল।

জীমূতবাহন বলেন, তাই যদি সত্য হয় তাহলে অপ্রকাশ গুপ্তের কি উচিত ছিল না রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'ভাতারখাকী' শব্দের পরিবর্তে 'স্বামীখাকী' লেখা?

: অপ্রকাশ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথ নন। তিনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের লেখক হতে চেয়েছিলেন। তিনি যে পরিবেশের ছবি এঁকেছেন, যে নায়ক-নায়িকাকে জীবনে জীবন যোগ করে দেখেছেন, যাদের কথা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা বিচিত্রগামী হলেও তার ধারে কাছে যায়নি। ভাষা হবে ভাবের অনুগ। ঢাকার বেশ্যালয়ে তটিনী যে-ভাষায় কথা বলে না, বলত না, বলতে পারে না—যে মার্জিত ভাষায় আপনি আমি কথা বলি—তা তার

মুখে বেমানান। রবীন্দ্রনাথ কেন, অতিআধুনিকতার ধ্বজাধারী আলবার্তো মোরাভিয়া পর্যন্ত যে-সাহস দেখাতে পারেননি, অপ্রকাশ গুপ্ত তাই দেখিয়েছেন। 'দ্য উয়োম্যান অফ রোম' উপন্যাসে মোরাভিয়া তাঁর নায়িকার মুখের ভাষা স্থানে স্থানে মার্জিত করেছেন। সজ্ঞানে। তার জন্য তিনি অনুতপ্তও হয়েছিলেন ; লিখেছিলেন, "I cannot deny that women like Adriana do not usually speak as Adriana does, nor do they express the feelings and ideas she expresses. Nevertheless, I have attributed to her only those feelings and ideas which women like Adriana would express, if they had the verbal and mental power to express." [আমি অস্বীকার করতে পারি না—আদ্রিয়ানা যে-ভাষায় কথা বলেছে আদ্রিয়ানার মত মেয়েরা সচরাচর সে-ভাষায় কথা বলে না ; তাদের অনুভূতি অথবা মনের ভাব ও-ভাবে প্রকাশ করে না। তা হোক, আদ্রিয়ানার মত মেয়েরা পারলে যে-ভাষায় কথা বলত, বাচনিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হলে যেভাবে তাদের অনুভূতি ও মনের ভাব ব্যক্ত করত—সেই ভাবেই আমি আদ্রিয়ানাকে দিয়ে কথা বলিয়েছি।] তফাৎ এই—অপ্রকাশের তটিনী তার নিজের ভাষাতেই কথা বলেছে। তাই আপনার ধ্যানধারণা অনুযায়ী সেটা অশ্লীল মনে হচ্ছে।—ভারতীয় সংবিধান তার ঊনবিংশতিতম অনুচ্ছেদে যে বাকস্বাধীনতার কথা স্বীকার করেছে তটিনীর সেই বাকস্বাধীনতা ছিল, অপ্রকাশ সেই স্বাধীনতার স্বীকৃতি অনুসারেই সমাজের একাংশের চিত্র এঁকেছেন।

অজিত গুপ্ত বললেন, একটু অ্যানাক্রনিজম হয়ে গেল ডক্টর রায়। অপ্রকাশের গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল ১৯৩৫-এ। তখনও স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হয়নি।

: আমি জানি। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে ঐ বাকস্বাধীনতার ধারণাটা তো ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ল'র অনুকরণেই রচিত!

নির্মল বললে, আমি কিন্তু স্যার ঐ কয়েকটি শব্দের ব্যবহারের জন্যই বইটাকে 'অবসীন' বলছি না। সেটা অন্যতম কারণ হলেও আসল আপত্তি অন্যত্র। আমার আসল আপত্তি—বইটাতে কোন 'রিডীমিং ফীচার' নেই। সমাজের কোন কল্যাণ সাধনের জন্য বইটি লিখিত হয়নি, হয়েছিল কতকগুলি যৌন-অঙ্গ এবং যৌন-ক্রিয়ার অতি-বাস্তব বর্ণনা দিতে—উদ্দেশ্য বটতলামার্কা একটা পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য সৃষ্টি!

আনন্দমোহন বলেন, আমি মানতে রাজী নই। সত্যিকারের শিল্পী, লেখক, যাঁদের ব্যাপক অর্থে 'স্রষ্টা' বলা হয়—তাঁরা সমসাময়িক সমাজের চেয়ে কয়েক দশক এগিয়ে থাকেন। তাঁরা যা বলেন, সমকাল তা বুঝতে পারে না—তাঁকে দোষারোপ করে। এ সত্য আমরা যুগে যুগে অনুভব করেছি দর্শন, বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সক্রেটিস, আর্কিমিডিস, যীশু, ব্রুনো, ডারউইন, ফ্রয়েড থেকে শুরু করে এই অপ্রকাশ গুপ্ত তার শিকার! দর্শন-বিজ্ঞানের উদাহরণ থাক—সে আপনাদের জানা—আমি বরং অশ্লীলতার বিষয়েই উদাহরণ দিই : 1878 সালে সমাজসেবিকা দার্শনিক অ্যানি বেসান্তকে একটি আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়—তাঁর অপরাধ তিনি 'জন্মনিরোধের' প্রচার করেছিলেন! এখন সরকার ঐ জন্মনিরোধের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। ফরাসী ঔপন্যাসিক বোদেলেয়ারের 1859 সালে লেখা একটি গ্রন্থ ফরাসী সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, লেখককে শাস্তি দিয়েছিলেন। তার নব্বই বছর পরে আর

একজন সেই গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ করেন—সেবার বিচারকেরা শুধু বইটিকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, তার লেখক বোদেলেয়ারকে শাস্তি দেওয়া যে অন্যায় হয়েছিল তা অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেন। তার ফলে ফরাসী সরকার সেই স্বর্গত সাহিত্যিকের ছবি একটি ডাক-টিকিটে ছাপিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। 'অশ্লীলতা'র ধারণা সম্পূর্ণ দেশকাল-নির্ভর। প্লেটো 387 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বলেছিলেন, হোমারের রচনা বহুলাংশে অশ্লীল। 1953 সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে মেরী স্টোপস-এর রচনা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, 1963তে কিনষের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার ইন হিউম্যান ফিমেল' বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। অথচ এই গ্রন্থ—আপনারা জানেন—যৌন সাহিত্যে বিশ্বের সম্পদ! বোস্টনের বিচারালয়ে একে একে যে গ্রন্থগুলি বাজেয়াপ্ত হয়েছে সেগুলিও বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ : বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'হোয়াট আই বিলিভ', হেমিংওয়ের 'দ্য সান অলসো রাইজেস', এবং বোকাসিওর 'ডেকামেরন'। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিচারক বলেছিলেন—ঠিক যে-কথা এইমাত্র তুমি বললে নির্মল : ওতে কোনও 'রিডীমিং ফীচার' নেই। সমাজের কোনও কল্যাণসাধনের জন্য বইটি লেখা হয়নি, ওটা বটতলামার্কা একটা পর্নোগ্রাফিক সাহিত্যসৃষ্টি।

অজিত গুপ্ত বললেন, ডক্টর রায়, আপনি যেমন উদাহরণ দিলেন, ঠিক তেমনি উল্টো উদাহরণও আমি দিতে পারি। দেখাতে পারি—এ জাতীয় গ্রন্থ সমাজের ক্ষতিই করেছে বেশি। ১৯৫৩ সালে—ঠিক সে সময় আয়ার্ল্যাণ্ডে মেরী স্টোপস-এর রচনা বাজেয়াপ্ত হল বলে আপনি দুঃখ প্রকাশ করলেন—সেই সময় অসলোতে একটি আন্তর্জাতিক পুলিস কমিশন বসেছিল—তাতে বিশ্বের বিভিন্ন আরক্ষা-বিভাগের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্তের একটি হচ্ছে : যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যৌন অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম মূল কারণ যৌন-গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার। বলা হল, Filthy literature is the great moral wrecker. It is creating criminals faster than jails could be built. [কেদাক্ত সাহিত্য সমাজনীতির সবচেয়ে বড় কালাপাহাড়। তাতে সমাজবিরোধী অপরাধীরা এত দ্রুতহারে জন্মাচ্ছে যে, জেলখানার নির্মাণকার্য তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না।]

আনন্দময় বললেন, আমি তা অস্বীকার করছি না মিস্টার গুপ্ত। ঐ তথ্যের সবচেয়ে বড় কথা 'ফিলথি লিটারেচার'—কেদাক্ত অশ্লীল সাহিত্য। 'সাগর-সঙ্গমে' যে তাই, তা আগে প্রমাণিত হ'ক।

গুপ্ত-সাহেব বললেন, আপনি আজকের কাগজ দেখেছেন?

: না। এখনও দেখিনি। কেন?

অজিত গুপ্তের ইঙ্গিতে নির্মল তার ফোলিও ব্যাগ খুলে খবরের কাগজের তিন নম্বর পৃষ্ঠাটা মেলে ধরে—ডরোথি কাপুরের হত্যার সংবাদ। সেই যেখানে ছাপা হয়েছে সুখেন কানোরিয়ার স্বীকৃতি—'সাগর-সঙ্গমে' বইটা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই ঘৃণিত কাজে।

আনন্দময় সংবাদটা পড়লেন। কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে কাগজখানা ফেরত দিলেন। জীমূতবাহন বলেন, এর পর আপনি কী বলবেন?

ম্লান হাসলেন আনন্দময়। বললেন, কিছু বলব না।

: কিন্তু আমরা সে কথা শুনব কেন? 'সাগর-সঙ্গমে' কী ভাবে সমাজের ক্ষতি

করছে তা জেনেও কেন আপনি নীরব থাকবেন? আপনি প্রমাণ চেয়েছিলেন, আমরা প্রমাণ দাখিল করেছি। এখন আপনি বলুন—বইটা অশ্লীল, না না?

আনন্দময় বললেন, আমি বিচারক ছিলাম জীমূতবাহনবাবু। আমার কাছে এটা প্রমাণ নয়—এটা একটা স্টেটমেণ্ট। ছেলেটির হতে পারে, পুলিসের হতে পারে, সাংবাদিকের হতে পারে। তার সত্য-মিথ্যার যাচাই হয়নি।

: ধরুন যদি আমরা আপনাকে 'স্যাটিসফাই' করতে পারি—সুখেন কানোরিয়া ঐ বইটা পড়েই উত্তেজিত হয়ে এ-কাজ করেছে? তখন কি আপনি স্বীকার করবেন বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত?

আনন্দময় দুই চোখ বুজে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, ইয়েস! তখন আমি স্বীকার করব যে, বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত!

: আমরা কি আশা করব—আপনি এই মামলায় সে ক্ষেত্রে বাদী-পক্ষের হয়ে সাক্ষী দিতে রাজী হবেন?

আবার আনন্দময় নীরব। ভেবে নিয়ে বললেন, না। হব না। আপনারা আর কারও দ্বারস্থ হন।

: কিন্তু আপনি যদি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন—বইটা অশ্লীল, তা সমাজের ক্ষতি করতে পারে, করছে, সেটা বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত—তাহলে কেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না?

আনন্দময় বললেন, দেখুন জীমূতবাহনবাবু—আমাকে কাঠগড়ায় তুললে আপনাদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। আপনারা আমাকে দিয়ে যা বলাতে চাইবেন আমি তো তা বলব না। আমি বলব যা আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। হয়তো দেখবেন ডিফেন্স আমার মুখ দিয়ে এমন সব তথ্য বার করে নিয়েছে যাতে আপনাদের উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হবে।

: তা কেমন করে হবে? আপনি তো বিশ্বাস করেন বইটা অশ্লীল।

: সাবজেক্ট টু কণ্ডিশান সুখেনের স্টেটমেণ্টটা অভ্রান্ত।

: সেটা সুখেন নিজমুখে স্বীকার করবে কাঠগড়ায় ওঠার আগে।

: আমার কাছে সেটাও যথেষ্ট নয়! আমি হয়তো চাইব তাকে আগে 'ক্রশ' করতে। জেনে নিতে চাইব, সে সত্যকথা বলছে, না পুলিসের নির্দেশ মত বলছে।

অজিত গুপ্ত বলে, ঠিক আছে স্যার! এখনই আমরা আপনার কাছে কথা আদায় করতে আসিনি। কেসটা চলুক। আপনার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখব; যদি আপনি নিজেই 'কনভিন্সড' হন, তখন নিশ্চয় আপনি সাক্ষী দিতেও রাজী হবেন।

আনন্দময় হেসে বললেন, এগ্রীড!

## বারো

'মুখার্জী অ্যাণ্ড লাহিড়ী'র ল-অফিস। আসলে ভারতী প্রকাশনীর একটি অব্যবহৃত ঘর। দুখানি টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, র‍্যাকে কিছু আইনের বই, মাথার উপর ফ্যান এবং টেবিলের উপর টেলিফোন। অফিসের বয়স এক সপ্তাহও হয়নি। সলিল লাহিড়ী ছাড়পত্র পেয়ে এখানে জাঁকিয়ে বসেছে। ভাস্করের পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি—

মিত্র অ্যাণ্ড মিত্রের সিনিয়র পার্টনার সুকোমল মিত্র কিছুতেই ওকে ছাড়তে রাজী নন—বলেছেন, 'তোমাকে তিন মাসের বিনা মাইনেয় ছুটি দিচ্ছি। তারপর তুমি এসে আমাকে বল, তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে চাও কি না।' ভাস্কর তাতেই রাজী হয়েছে।

কাজ চলছে জোর কদমে। নূতন লোক একটিও নিয়োগ করতে হয়নি এখনও। ভারতী প্রকাশনীর কর্মচারীদের কয়েকজন ওদের অফিসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একজন কেরানি, একজন টাইপিস্ট এবং বেয়ারা রতন।

ইতিমধ্যে সাময়িক ইন্‌জাংশন-অর্ডার বার হয়েছে—আসলে হত না, হল ঐ সুখেন কাঞ্জোরিয়ার স্বীকৃতিটায়—অন্তত ভাস্করের তাই বিশ্বাস। ফলে কলকাতা এবং মফঃস্বলের অসংখ্য দোকানে, দোকানের গুদামে স্তূপাকার বইয়ের বাণ্ডিল জমে আছে। একখানি বইও বিক্রয় হয়নি। ক্রমাগত টেলিগ্রাফ আর চিঠি আসছে, কলকাতার নানান দোকান থেকে—কী হল? শেষ পরিস্থিতিটা কী? বই তাঁরা রাখবেন, না ফেরত পাঠাবেন? গ্রাহকদের কী বলবেন? অথচ কী আশ্চর্য! এ পর্যন্ত একজন মাত্র গ্রাহকও বলেননি—বই যদি দিতে না পারেন মশাই, তবে টাকা ফেরত দিন! সকলেই একটা শেষ হেস্তনেস্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী। প্রদীপ বলছে, বই ছাপাতে যা খরচা হয়েছে তা তো সে পেয়েই গেছে, এমন কি তার লাভের অঙ্ক ইতিমধ্যে আকাশ-ছোঁয়া! কিন্তু মামলায় যদি হারে তবে প্রত্যেকটি গ্রাহককে টাকা ফেরত দিতে হবে তাকে—অর্থাৎ সে দেউলিয়া হয়ে যাবে। ত্রিশ হাজার বই, বিশ টাকা দাম—অর্থাৎ ছয় লক্ষ টাকা।

যশোদারঞ্জন পরপর তিনখানি টেলিগ্রাফ করেছেন। প্রদীপ জবাবে শুধু জানিয়েছে : ব্যস্ত হ'য়ো না। ব্যবস্থা যথোচিতভাবে করা হচ্ছে।

যশোদারঞ্জন শেষ টেলিগ্রাফে এক কপি বই চেয়ে পাঠিয়েছেন। এবার জবাবে প্রদীপ জানিয়েছে—বইটি হস্তান্তর করা বে-আইনী! আদালতের ইন্‌জাংশন আছে। বলা বাহুল্য, যশোদারঞ্জন সে জবাবে ভিসুভিয়াসে রূপান্তরিত হয়ে প্রহর গুনছেন!

তবে নাকি কোন কিছুই একেবারে নিরাশাব্যঞ্জক হতে পারে না। লেডি ম্যাকবেথের মত শয়তানীর অন্তরেও লুকিয়ে থাকে একটি কন্যাহৃদয়! এত অন্ধকারেও একটু আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা গেছে। ঢাকা থেকে ইয়াকুব একটি চিঠি পাঠিয়েছে। জানিয়েছে—তার অনুসন্ধান-কার্য ফলপ্রসূ হয়েছে। সে প্রথম প্রকাশনার প্রকাশক আবদুল রেজ্জাককে খুঁজে বার করেছে। সত্তর বছরের বুড়ো। সে অপ্রকাশ গুপ্ত সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিতে পেরেছে। অপ্রকাশ তার পরিচিত। তার উপপত্নী তটিনীর সঙ্গে আবদুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বলেছে, ঐ বারাঙ্গনা তটিনীর কাছ থেকেই সে পাণ্ডুলিপিটা কিনেছিল—কপিরাইট—নগদ একশ টাকায়। টাকাটা সে তটিনীর হাতে দেয়নি, দিয়েছিল মহিউদ্দীনের হাতে। মহীউদ্দীন ছিল ঐ রূপোপজীবিনীর তবল্‌চি। আবদুল রেজ্জাক নিশ্চিতভাবে জানে—অপ্রকাশ গুপ্ত মারা গেছেন 30.1.1930-এ। 'সাগর' কোন বাস্তব লোক নয়, অপ্রকাশের কল্পিত চরিত্র। অপ্রকাশের কিছু চিঠি তার কাছে আছে। গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে সে শর্তসাপেক্ষে এ-মামলায় সাক্ষ্য দিতে আসতে রাজী। শর্তগুলি প্রাঞ্জল—তাকে প্লেনে ঢাকা-কলকাতা এবং কলকাতা-ঢাকা করতে দিতে হবে, কলকাতায় তার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সে নগদ এক হাজার টাকা নেবে। ইয়াকুব জানতে চেয়েছে, এই শর্তে সে আবদুলকে প্লেনে তুলে দেবে কিনা।

প্রদীপের জবানীতে ভাস্কর তাকে জানিয়েছে—সব শর্তই মেনে নেওয়া হল। আবদুলের সাক্ষ্য এবং অপ্রকাশের চিঠি এ মামলায় অমূল্য সম্পদ।

প্রদীপ জানতে চায়, তুই এটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছিস কেন?

: বুঝলি না? আমরা প্রমাণ করতে চাইছি অপ্রকাশ একটা জীবনসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন—টাকার লোভে খিস্তি-খেউড়ে ভরা কোনও অশ্লীল বই লেখেননি। শুধু প্রমাণ করতে নয় প্রদীপ, এটা আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছি। আমার খুব আশা হচ্ছে ঐসব চিঠি থেকে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার মালমশলা আমি পাব। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখ, লেখক মারা গেছেন ত্রিশ সালের জানুয়ারীতে—বইটি প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েক বছর পর। লেখক যদি টাকার অভাবে, অর্থের প্রয়োজনে লিখতেন তাহলে নিশ্চয় তাঁর জীবদ্দশায় বইটি বেচতেন। তা তিনি বিক্রি করেননি। বইটার কপি-রাইট বেচেছে ঐ তটিনী, লেখকের মৃত্যুর পরে। হয়তো অর্থের প্রয়োজনে ; কিন্তু লেখকের মূল-প্রেরণা অর্থাগম ছিল না। ঈস! যদি তটিনীর খোঁজ পেতাম! উনিশ শ ত্রিশে তার বয়স ছিল ত্রিশ, তার মানে এখন তার বয়স পঁচাত্তর—যদি বেঁচে থাকে!

সলিল বললে, বিটুইন আওয়ার্সেল্ভস। আমি ভাই স্বীকার করছি—বইটাকে আমি অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। আমিও না, প্রমীলাও না। আমাদের দুজনের কাছেই লেখাটা ভালগার লেগেছে!

ভাস্কর যেন আহত হল। বললে, তবে তুই এ মামলা লড়তে রাজী হলি কেন?

: কী আশ্চর্য! ওকালতি করতে হলে এটা তো করতেই হবে!

: কোন জিনিসটা তোর কাছে বা তোর বউয়ের কাছে স্পেসিফিক্যালি অশ্লীল মনে হয়েছে? ভাষা? বিষয়বস্তু?

: ভাষা তো বটেই। বিষয়বস্তুও। সবচেয়ে কি ভালগার লেগেছে জানিস? ওদের বয়সের পার্থক্যটা।

: তার মানে!

: তটিনীর বয়স ত্রিশ, সাগরের বয়স বাইশ! তটিনী ওর বড় বোনের মত!

ভাস্কর বিরক্ত হয়ে বললে, এ-কথার কোন মানে হয়?

: হয় না? তটিনী একটা সাতঘাটের জল খাওয়া মেয়ে। সে প্রেম করছে একটা প্রায়-নাবালকের সঙ্গে! ছেলেটাকে হাতে ধরে শেখাচ্ছে!

: সো হোয়াট?

: জিনিসটা দৃষ্টিকটু নয়? তারপর ছেলেটা যদি স্বাভাবিক হত তাহলেও না হয় সহ্য করা যেত—কিন্তু লেখক দেখাচ্ছেন ছেলেটা অস্বাভাবিক—অ্যাবনর্মাল!

ভাস্কর বললে, দ্যাখ সলিল—ঐ গল্পে দুজনেই যদি স্বাভাবিক হত, নর্মাল হত, তাহলেই বরং বইটা আমার কাছে অশ্লীল মনে হত। ঐ অস্বাভাবিকত্ব আছে বলেই কাহিনীতে একটা সমস্যা আছে—তাই তার আলোচনাটা প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয়। ছেলেটি যদি হত ত্রিশ বছরের একজন স্বাভাবিক যুবক, মেয়েটি বাইশ বছরের একটি স্বাভাবিক যুবতী—তাহলে ওদের ঐ মিলন-বর্ণনাটা আমার কাছে ভালগার মনে হত। বলতাম—কাহিনীর প্রয়োজনে, সমস্যাটা বিশ্লেষণে অত নিখুঁত বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক, অবাঞ্ছনীয়। এ কথা একদিন তোদের বলেছিলামও। আমার মতে 'বিদ্যাসুন্দর' অশ্লীল—কারণ সে মিলন-বর্ণনা বাদ দিলেও কাহিনীর সূত্র ব্যাহত হত না। বিদ্যার গর্ভসঞ্চার—যেটা ওর

পরবর্তী অধ্যায়—তা আমরা বুঝে নিতাম। আর এই কারণেই 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' আমার কাছে অশ্লীল মনে হয়নি। সেখানে ঐ ফোর লেটার্ড ওয়ার্ডসগুলো ছিল আবশ্যিক!

সলিল এ তর্ক থামিয়ে বললে, ঠিক আছে বন্ধু! তুমি লড়ে যাও। আমি পিছনে আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস—শত্রুপক্ষের ঐ দুর্গটাকে আমাদের এখনই আক্রমণ করা উচিত। ঐ কানোরিয়ার দুর্গ। সুখেন কানোরিয়াকে বাজিয়ে দেখতে হবে।

প্রদীপ বললে, সে ব্যবস্থা আমরা করছি। কানোরিয়ার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য একজন গোয়েন্দাকে লাগিয়েছি। অনেক কিছুই জানা গেছে—কিন্তু ভাস্কর বলছে সেসব তথ্য আমাদের ঠিক কাজে লাগবে না।

ভাস্কর বললে, ও বাড়িতে দুটি মাত্র ছিদ্রপথ। এক নম্বর সুখেন কানোরিয়া। সে বস্তুত গৃহবন্দী। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব। দু নম্বর ছিদ্র ঐ অন্তরা নামে মেয়েটি। মেয়েটাকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না।

: চেষ্টা করে দেখেছিস?

: করিনি? বারে বারে—টেলিফোনে। ও কোনও বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে রাজী নয়।

: নিজের পরিচয় দিয়েছিলি?

: পাগল! সংবাদপত্রের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিলাম।

এই সময় পিয়ন রতন এসে জানালো একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী দেখা করতে চান।

অনুমতি পেয়ে যিনি দেখা করতে এলেন দর্শনমাত্রই তাঁকে চিনতে পারল ভাস্কর—সেই রেবা সেনের বাড়িতে দেখা ডাক্তারবাবু। বললে, বসুন। বলুন?

ডাক্তার ভদ্রলোক প্রদীপ এবং সলিলকে দেখে বললেন, আমার কথাটা একটু গোপনীয় ছিল।

: এঁরা আমার সহকর্মী। আমাকে যা বলতে এসেছেন, এঁদের তা আমাকে জানাতে হবে।

: মাফ করবেন, আমি কোনো অফিসিয়্যাল ব্যাপার আলোচনা করতে আসিনি। আমি আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি কথা বলতে চাই, ভাস্করবাবু!

ভাস্কর ইতস্তত করে। ডাক্তারবাবু বলেন, আপনার হাতে যদি সময় থাকে তবে আসুন, আমরা সামনের চায়ের দোকান থেকে দু কাপ চা খেয়ে আসি।

উঠে পড়ে ভাস্কর : আমার আপত্তি নেই। চলুন।

ওরা অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকল সামনে চায়ের দোকানে। নিভৃততম এক কোণায় বসল দুজনে। দুটো চায়ের অর্ডার দিল। ডাক্তারবাবু বললেন, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন আশা করি।

: তা পেরেছি, যদিও আপনার নামটা আমি জানি না।

: আমার নাম ডক্টর অতুলকৃষ্ণ মৈত্র।—একটি নামাঙ্কিত কার্ড তিনি হস্তান্তরিত করেন। দেখা গেল, তাঁর পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রিও আছে। ভাস্কর বললে, এবার বলুন, আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার?

: আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন তা আমি জানি না; আমি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর রাখি।

: ভাল কথা। না, আমি আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, আপনি মিসেস সেন-এর চিকিৎসক।

: এবং পাণিপ্রার্থী।

: সেটা এইমাত্র জানলাম। আপনি বিবাহিত কি না—

: আমি অবিবাহিত।

: আই সী।—গম্ভীর হয়ে গেল ভাস্কর।

কে মিথ্যা কথা বলেছে? রেবা সেন, না অতুলকৃষ্ণ?

: আমি আপনার কাছে দু-একটি সংবাদ জানতে এসেছি। বিনিময়ে আপনার প্রয়োজনীয় সংবাদও কিছু জানাতে এসেছি। গিভ অ্যাণ্ড টেক—ফেয়ার ডীল।

: কী সম্বন্ধে জানতে চান এবং কী বিষয়ে জানাতে চান?

: জানতে চাই মিসেস রেবা সেন সম্বন্ধে এবং জানাতে চাই সুখেন কানোরিয়া সম্বন্ধে।

: সুখেন কানোরিয়া সম্বন্ধে আপনি কেমন করে জানলেন?

: আমি তার চিকিৎসা করেছিলাম।

: আপনি কানোরিয়া পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক?

: না।

: তাহলে হঠাৎ কোন্ সূত্রে—

বাধা দিয়ে অতুলকৃষ্ণ বলেন, মাফ করবেন, আপনি একতরফা প্রশ্নই করে যাচ্ছেন। আমার প্রস্তাবে আপনি রাজী কিনা তা এখনও বলেননি।

ভাস্কর একটু ভেবে নিয়ে বললে, মোটামুটিভাবে আমি রাজী। তবে আপনার প্রশ্নটা না শুনলে তার জবাব দেব কি না বুঝে উঠতে পারছি না।

চা এসে গেল। অতুলকৃষ্ণ তাঁর চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, অল রাইট। আমিই আগে প্রশ্ন করছি; কিন্তু একটি শর্তে—একটি নয়, দুটি শর্তে। প্রথম শর্ত হচ্ছে, আপনি ইচ্ছে করলে জবাব নাও দিতে পারেন, দিলে সত্য কথা বলবেন। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, আমাদের এ কথোপকথন কোনদিন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। আমার তরফে আমি এ শর্তে রাজী। আপনি এ শর্ত মেনে নিচ্ছেন?

ভাস্কর দেখল ভদ্রলোক খুব মেথডিকাল। বললে, মেনে নিলাম।

: মিসেস সেনকে কি আপনি বিবাহ করতে ইচ্ছুক?

: জবাব দেব না।

: আপনি কি তাঁর কাছে বিবাহ প্রস্তাব করেছেন?

: জবাব দেব না।

অতুলকৃষ্ণ মাথা ঝাঁকিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গুছিয়ে নিয়ে বলেন, শুনুন মিঃ মুখার্জি—আমি আমার তাস টেবিলে বিছিয়ে দিচ্ছি। তারপর আপনি বরং জবাব দিন। প্রথম কথা, আমি মিসেস সেনের কাছে বিবাহ প্রস্তাব করেছি, তিনি সম্মত হয়েছেন। আমি এ পর্যন্ত ওঁর পিছনে যথেষ্ট টাকা খরচ করেছি, কখনও ফি নিইনি। বিবাহের পর কাশ্মীর বেড়াতে যাবার জন্য টিকিট পর্যন্ত কেটেছি। কিন্তু আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে আমি ভুল করছি। আমার প্রথম সন্দেহ হয় একজন আর্কিটেক্ট ভদ্রলোককে দেখে। তিনি নাকি ওঁর বাড়ির প্ল্যান করে দিচ্ছেন। বাই দ্য ওয়ে—উনি লেক-টাউনে একটা

জমি কিনেছেন, জানেন?

: খবরটা সত্য নয়। সাক্সেশন সার্টিফিকেট পাবার পর—

: পর নয়, আগে। এ জমি বেনামীতে অনেক আগেই কেনা—

: তাহলে আমি জানি না। যা হোক, তারপর?

: আমার দ্বিতীয় সন্দেহ হল আপনাকে দেখে। মাফ করবেন ভাস্করবাবু, আমি বাধ্য হয়ে আপনার পিছনে কিছু গোয়েন্দাগিরিও করেছি। নিজের স্বার্থে—

: তাতে আমি কিছু মনে করছি না। আমি যা করেছি তার মধ্যে গোপন কিছু নেই।

: ভেরি গুড! এবার আপনি আমার প্রথম প্রশ্ন দুটির জবাব কি নতুন করে দেবেন?

: দেব। তার আগে একটি প্রতিপ্রশ্নের জবাব দিন, ডক্টর মৈত্র। আপনি বলছেন আপনি অবিবাহিত—এ সংবাদ মিসেস সেন সন্দেহাতীত ভাবে জানেন?

: অফকোর্স! না হলে সে এতদূর অগ্রসর হত না—

ভাস্করের ইচ্ছা হচ্ছিল প্রশ্ন করে—'কতদূর'? সেটা ভদ্রতায় বাধল। তাই বলল, সে-ক্ষেত্রে আপনার প্রথম প্রশ্ন দুটির জবাব আমি নতুন করেই দিচ্ছি, ডক্টর মৈত্র। না, আমি মিসেস সেনকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক নই এবং হ্যাঁ, আমি বিবাহ প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, আর তা গৃহীতও হয়েছিল।

অতুলকৃষ্ণ অনেকক্ষণ জবাব দিলেন না। তাঁর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শেষে বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রথম সিদ্ধান্তটা কি এইমাত্র নিলেন?

: ঠিক তা নয়। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা এইমাত্র নিলাম বটে! ফর য়োর ইনফরমেশন ডক্টর, আমাদের হনিমুন স্পটটাও ছিল কাশ্মীর—তবে টিকিট আমি কাটিনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অতুলকৃষ্ণের। হাসলেন উনি। বললেন, আমার যা জানবার তা আমি জেনেছি। আপনি আমার অশেষ উপকার করলেন। এবার কিছু প্রত্যুপকার করি। ঐ 'সাগর-সঙ্গমে' বইটার বিষয়ে আপনি যে ডিফেন্স কাউন্সেল তা আমি জানি; আমি এও জানি যে, সুখেন কানোরিয়ার যাবতীয় তথ্য আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানাচ্ছি—আমি সুখেনের চিকিৎসা করেছিলাম বছরখানেক আগে। ছেলেটি স্বাভাবিক নয়—সে আরোগ্যলাভ করেনি।

: তার অসুখটা কী ছিল?

অতুলকৃষ্ণ মাথা নাড়েন, আয়াম সরি মিস্টার মুখার্জী, আমার প্রফেশানাল এথিক্স এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমাকে বারণ করছে।

: অন্তত বলুন অসুখটা শারীরিক না মানসিক?

: মানসিক।

: মনোহর কানোরিয়া জানেন?

: না।

: সুখেন স্বয়ং এসেছিল আপনার কাছে চিকিৎসা করাতে?

: না। তার মাসি তাকে নিয়ে এসেছিল। চেনেন নিশ্চয়—অন্তরা দেবী।

: ওর অস্বাভাবিকতাটা কী জাতীয়?

অতুলকৃষ্ণ আবার মাথা নাড়েন : হি ওয়াজ মাই পেসেন্ট।

ভাস্কর হাসল। বললে, ঠিক আছে, তবে এ কথাও বলি ডক্টর মৈত্র—পাল্লাটা সমান সমান হল না। আমি আপনাকে যা দিলাম তার তুলনায়—

: জানি! ওয়েল। আর একটা উপকার আপনার করছি। আমি স্বীকার করছি—আপনি যে খবর আমাকে বলেছেন তার তুলনায় আমি আপনাকে বিশেষ কিছুই দিতে পারিনি। কী করব বলুন? প্রফেশনাল এথিক্স। তবে একটা উপকার আপনার করছি। আজ পাঁচটার সময় মিস অন্তরা বোস আমার চেম্বারে আসবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আপনি ঠিক ঐ সময় যদি আসেন তবে তাঁর দেখা পাবেন। আমার ভিজিটার্স রুমে। এর পর প্রদীপবাবুর ভাগ্য আর আপনার হাতযশ!

: ভেরি গুড। অন্তরার সঙ্গে যদি আলাপ হয় তবে আমি স্বীকার করব পাল্লা সমান-সমান হয়ে গেল।

: উঠুন তাহলে। যাওয়া যাক।

## তের

অতুলকৃষ্ণের কাছে বিদায় নিয়ে অফিসে ফিরে এসে দেখল প্রদীপ তখন টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ভাস্করকে দেখতে পেয়েই টেলিফোনে বললে, এই যে, একটু ধর, ভাস্কর এসে গেছে। টেলিফোনটা ওর হাত থেকে নিয়ে ভাস্কর শুনল উমার কণ্ঠস্বর। বললে, কি রে? ফোন করছিস কেন?

: আচ্ছা ছোড়দা, তুই কী? মানুষ না জন্তু?

: এ প্রশ্নটা তো ভেবে দেখিনি। কেন?

: তুমি আজ পাঁচদিন হল মিত্র-কোম্পানি ছেড়ে নূতন অফিস খুলে বসেছ, অথচ এতবড় খবরটা বাড়িতে কাউকে বলনি?

: এতবড় খবর! খবরটা 'এতবড়' কিছু নয়।

: তাই বলে আমাকেও বলবে না?

ভাস্কর লক্ষ্য করল উমা 'তুই' ছেড়ে 'তুমি' ধরেছে। অভিমান করতে পারে বটে উমা। ওদের ভাই-বোনের মধ্যে গোপনীয়তার অবকাশ অল্প। সংসারের মরুভূমিতে ভাস্করের কাছে উমা একটা মরূদ্যান! বললে, কেন বলব তোকে? তুই সব কথা আমাকে বলিস?

: বলি না? কী বলিনি?

: আমার নামে একটা রেজিস্টার্ড বুকপোস্ট এসেছিল। তুই বইটা নিয়েছিস, পড়েছিস, বেমালুম গাপ্ করেছিস। বল সত্যি কি না!

ও প্রান্তে নীরবতা।

: কি রে? লাইনে আছিস?

: আমি মাপ চাইছি ছোড়দা। বইটা তোর ড্রয়ারে আছে।

: চেপে গিয়েছিলি কেন?

: তুই টেলিফোনে জানতে চাইছিস তাই সুবিধা হল। মুখোমুখি স্বীকার করতে পারতুম না। বইটা ভীষণ ইয়ে—

মাঝপথেই উমা থেমে পড়ে।

ভাস্কর বলে, বুঝলাম। কিন্তু উমা, তুই কি জানিস ঐ বইটা নিয়ে একটা মামলা—

: জানি। সেইজন্যেই নাকি তুই চাকরি ছেড়েছিস! শোন ছোড়দা—ইতিমধ্যে অনেক

ব্যাপার ঘটে গেছে আমাদের বাড়িতে। তুই বাড়িতে আসার আগে সব কথা তোকে জানাতে চাই। বিকাল পাঁচটার সময় তুই আমাদের বাড়ির সামনের ঐ পেট্রোল পাম্পটায় আসতে পারবি?

: আসব। তবে পাঁচটায় নয়। ধর সাড়ে ছটায়।

: অত দেরি হবে কেন? আবার সেই রেবা সেনের কাছে যাবি বুঝি?

: তুই নাম জানলি কি করে? আমি তো বলিনি।

: আমি অনেক কিছু জানি। আজই জেনেছি। তোকে সব কথা বলব। তাহলে সাড়ে ছটায়?

: হ্যাঁ।—টেলিফোনটা সে নামিয়ে রাখে।

প্রদীপ বলল, কিরে ভাস্কর, তোর হোম-ফ্রন্টেও লড়াই শুরু হয়ে গেছে মনে হচ্ছে?

ভাস্কর বললে, তাইতো দেখছি। উমা এত খবর পেল কোথা থেকে?

অফিস থেকে বেরিয়ে ঠিক পাঁচটা বাজার মিনিট পনের আগে ভাস্কর এসে পৌঁছালো ডাক্তার অতুলকৃষ্ণের চেম্বারে। অপেক্ষাগারে জনা চার পাঁচ বসে ছিলেন। তার মধ্যে একজনই ছিলেন বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের অবিবাহিতা বাঙালী মহিলা। শ্যামবর্ণা, একহারা, লম্বা—বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। সাজ-পোশাকে উগ্রতা নেই—কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ ; চোখে চশমা। ভাস্কর গিয়ে তাঁর মুখোমুখি বসল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক পড়ল মেয়েটির। সে ঢুকল ভিতরে এবং মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে এল। ঘর ছেড়ে পথে নামতেই ভাস্কর তাঁকে পিছন থেকে ডাকল, অন্তরা দেবী!

ভাস্করকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মেয়েটি বললে, আপনি আমাকে ডাকলেন?

: হ্যাঁ!

: আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। কোথায় দেখেছি বলুন তো?

: দেখেননি কোথাও, তবে কণ্ঠস্বর শুনেছেন। টেলিফোনে। দু-তিন বার—

: বুঝেছি। আপনি সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক?

: আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। তবে আমি সাংবাদিক আদৌ নই। আমার নাম ভাস্কর মুখার্জী। 'সাগর-সঙ্গমে' বলে যে বইটার বিরুদ্ধে একটা মামলা চলছে—

: আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার দুঃসাহসে! কেন এভাবে আমাকে পিছন থেকে ডাকলেন বলুন তো?

: আপনি টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হননি ; কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলার অত্যন্ত প্রয়োজন আমার।

: আপনার প্রয়োজন থাকলেই যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হব এ ধারণা হল কেন আপনার? নমস্কার—অন্তরা চলতে শুরু করে।

ভাস্কর মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে মেয়েটির সামনে এগিয়ে যায়। পথরোধ করে দাঁড়ায়। মেয়েটির চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। বলে, এর মানে কি? পথ ছাড়ুন।

: একটা কথা আপনাকে বলব, অন্তরা দেবী। তার পরেই পথ ছেড়ে দেব। কথাটা এই : ভেবে দেখেছেন, কোথায় এসে আপনার সন্ধান পেয়েছি? ডক্টর মৈত্রের চেম্বারে। আপনি কি চান সুখেনের চিকিৎসার কথাটা মনোহর কানোরিয়ার কর্ণগোচর হ'ক?

অন্তরা ওকে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। একটি মাত্র শব্দে মনোভাব ব্যক্ত

করল সে। বললে : ব্ল্যাকমেলিং?

: না অন্তরাদেবী, না। বিশ্বাস করুন, আপনার অথবা সুখেনের কোন ক্ষতি করবার দূরতম বাসনা আমার নেই। আপনাকে আমি কোন পারিবারিক রহস্য উদঘাটন করে বিশ্বাসহন্তা হতেও বলব না। আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই—ইচ্ছে করলে আপনি জবাব দেবেন না, এই শর্তে। ইন ফ্যাক্ট—আপনার আর আমার স্বার্থ এক—আমিও বিশ্বাস করি, বন্ধুকে বাঁচাতে সুখেন মরতে বসেছে। পারলে আমিও সেই তথাকথিত বন্ধুটাকে খুঁজে বার করতে পারব। আপনি কি আমাকে সে চেষ্টা করতে দেবেন না? সুখেনকে বাঁচাতে?

দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটা কামড়ে অন্তরা বললে, হঠাৎ সুখেনকে বাঁচাতে আপনার এত আগ্রহ?

: একটি মাত্র উদ্দেশ্য আমার—প্রমাণ করা সুখেন 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে একা এ কাজ করেনি। আমার স্বার্থ—আমার ক্লায়েন্ট। ঘটনাচক্রে আপনার বোনপোকে বাঁচাতে হচ্ছে আমাকে।

: কী জানতে চাইছেন আপনি বলুন?

: এখানে দাঁড়িয়ে সে কথা হয় না। রাস্তার ওপারে ঐ কোয়ালিটিতে গিয়ে বসবেন চলুন। দুটো কোল্ড্-ড্রিঙ্কস্ খেতে খেতে আমার যা জানবার জেনে নেব। কথা দিচ্ছি···যে প্রশ্নের জবাব আপনি দিতে চাইবেন না, তা জানতে চাইব না আমি।

: বেশ, চলুন।

শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে দুটি 'টুটিফ্রুটি' অর্ডার দিয়ে ভাস্কর বললে, বিশ্বাস করুন অন্তরা দেবী, আমি আপনার শত্রুপক্ষ নই। আপনার আর আমার একই গন্তব্যস্থল।

অন্তরা গম্ভীর হয়ে বললে, ভণিতা ছেড়ে যা জানতে চান প্রশ্ন করুন।

: না, মাপ করবেন। ভণিতা আমাকে একটু করতেই হচ্ছে। না হলে উত্তরগুলো আপনি সহজে দিতে পারবেন না। আমি সবার আগে আমার তাস টেবিলে চিৎ করে দিতে চাই—যাতে পরে আপনি আবার না বলেন আমি ব্ল্যাকমেলিং করেছি। প্রথম কথা—সুখেনের অসুখটা কী, কেন আপনি মনোহরবাবুকে না জানিয়ে তার চিকিৎসা করাচ্ছেন তা আমি জেনেছি; না না, ডক্টর মৈত্রকে দোষারোপ করবেন না। তিনি বলেননি। সে যাই হোক—এ কথা আমি গোপন রাখব; কিন্তু সুখেন যদি ঐ বইটার মামলায় তার সাক্ষ্যে বলে যে, ঐ বইটা পড়ে সে এ কাজ করেছে তাহলে ক্রশ এগ্‌জামিনে তাকে আমি ছিঁড়ে খাব। দ্বিতীয় কথা—আমি বিশ্বাস করি, বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য সুখেন এই মিথ্যা কথাটা বলছে। আমার লক্ষ্য সেই বন্ধুকে উদঘাটন করা। এইটুকু ভণিতা সেরে এবার প্রশ্ন করি—আপনার কাছে সুখেন কি আদ্যন্ত সত্য কথাটা স্বীকার করেছে? বন্ধুর নামটা বলেছে?

: না।

: আমি যদি সেই বন্ধুটিকে খুঁজে বার করে প্রমাণ করি যে, সুখেন একা এ অপরাধ করেনি, হয়তো সুখেন আদৌ এ অপরাধ করেনি, তাহলে আপনি খুশি হবেন?

অন্তরা একটু ভেবে নিয়ে বললে, হব।

: দ্যাটস্ ইট! এখন বলুন, সুখেন সে-রাত্রের ঘটনার কথা আপনার কাছে কী বলেছে, কতটা বলেছে।

: আমাকে সে নতুন কথা কিছুই বলেনি। সবাইকে যা বলেছে আমাকেও তাই বলেছে।

: বেশ। এবার বলুন, আপনি কি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন যে, সে সত্য কথা বলেছে?

: না। আমি সন্দেহাতীতভাবে জানি যে, সে মিথ্যা কথা বলেছে।

: সন্দেহাতীতভাবে কেমন করে তা জানলেন?

: আমি বলব না। বলতে পারি না। আমি সত্যবদ্ধ।

: ঠিক আছে। এই রকমই শর্ত ছিল। এবার বলুন, সুখেনের যে সব অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, তাদের মধ্যে কাকে কাকে আপনার সন্দেহ হয়?

: সুখেন যদি জানতে পারে যে, আমি সম্ভাব্য বন্ধুর নামের তালিকা আপনাকে দিয়েছি তাহলে সে আমাকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। সে চায় না তার বন্ধু ধরা পড়ুক।

: মানলাম। সুখেন যদি আত্মহত্যা করতে যায়, তাহলে তাকে আপনি বাধা দেবেন, না দেবেন না?

অন্তরা চমকে ওঠে। বলে, আত্মহত্যা মানে?

বন্ধুর প্রতি সুখেনের বিশ্বস্ততার একটা অর্থ হয়, আপনার-আমার কী গরজ তাকে বাঁচিয়ে সুখেনকে মারতে?

: সুখেন জানতে পারবে যে, আমি আপনাকে সম্ভাব্য নামটা বলেছি।

: সুখেন তা কোনদিন জানতে পারবে না। আপনি বলুন।

অন্তরা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। যাদের উপর আমার সন্দেহ হয় তাদের নাম বলছি, শুনুন।

ভাস্কর তার নোটবই বার করে চার-পাঁচটি নাম লিখে নিল। তারপর প্রশ্ন করে, মনোহরের সঙ্গে সুখেনের সম্পর্কটা কেমন?

: মাপ করবেন মিস্টার মুখার্জি, ওসব আলোচনা আমি করব না।

এই সময়ে বেয়ারা এসে দুটি পানীয় রেখে গেল টেবিলে। ভাস্কর বললে, নিন, খান।

অন্তরা হাসল। বললে, আপনি ধরে বেঁধে ব্ল্যাকমেলিং-এর ভয় দেখিয়ে আমার এজাহার নিচ্ছেন। আপ্যায়নের তো কোন প্রয়োজন নেই।

ভাস্কর আন্তরিক আহত হল। বললে, আমি ভেবেছিলাম—প্রথমটায় আপনাকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করলেও আপনি এ পর্যন্ত যা বলেছেন তা বন্ধু হিসাবেই আমাকে বলেছেন। যেহেতু আপনার আর আমার স্বার্থ এক। আমরা দুজনেই সুখেনকে বাঁচাতে চাই।

অন্তরা বললে, তাহলে ভুল ভেবেছেন। আমি আপনার বন্ধুত্ব আদৌ স্বীকার করছি না। আমি জানি, আপনার মক্কেলকে বাঁচাতে দরকার হলে সুখেনকে আপনি ছিঁড়ে খাবেন। সে-কথা আপনি নিজে মুখেই বলেছেন।

শীতল পানীয়টা অন্তরা সরিয়ে রাখল।

ভাস্কর তৎক্ষণাৎ নিজেরটা ঠেলে সরিয়ে দিল। একটা দশ টাকার নোট পূর্ণ পানপাত্রের তলায় চাপা দিয়ে বললে, সে-ক্ষেত্রে আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য

নেই। উঠুন, যাওয়া যাক।

অন্তরা তখনই উঠল না। বললে, আপনার কৌতূহল পুরোপুরি মিটেছে? আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন। এই ব্ল্যাকমেলিং-এর পর্যায়টা আমি আজ নিঃশেষ করে যেতে চাই।

ভাস্কর নিজেকে অপমানিত বোধ করল। বললে, আপনার ভয় নেই অন্তরা দেবী। এর পর আর কোন দিন আপনার পথে দাঁড়াব না। টেলিফোনেও বিরক্ত করব না। আচ্ছা চলি, নমস্কার!

অন্তরা পিছনে পিছনে আসছে কিনা ভাস্কর ফিরেও দেখল না।

## চোদ্দ

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি ।।২৫।।১২।।—ইতি তৃতীয় খণ্ড।"

অর্থাৎ "সেই অন্তরীক্ষে বহুবিধ শোভাসম্পন্ন এবং যেন হেমাভরণে ভূষিতা অথবা হিমালয়-দুহিতা উমাকে স্ত্রীমূর্তিতে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া···দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ঐ জ্যোতির্ময় যক্ষটি কে?"

তৃতীয় খণ্ডের শেষ শ্লোকে এসে থামলেন আনন্দময়। চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। তাইতো! এমন কেন হল? কী বলতে চাইছেন উপনিষদকার?

কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ড আজ শেষ হবার কথা। আজ সন্ধ্যায় আবার লেকচার আছে। কেনোপনিষদ্ চার খণ্ডে ভাগ করা—যেন চার অঙ্কের একটি নাটক। সর্বসমেত মাত্র চৌত্রিশটি শ্লোক। আজ শেষ হবে পঞ্চবিংশতিতম শ্লোকটি। প্রথম খণ্ডে জিজ্ঞাসুর মনে যে প্রশ্নগুলি জেগেছে তারই প্রতিফলন : মন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত থাকে—তারা তাদের প্রকৃত কর্তাকে প্রণিধান করতে পারে না, ভাবে দেহই বুঝি তাদের কর্তা। শ্রুতি বলছেন, সে ধারণা ভ্রান্ত—প্রাণ, মন, চক্ষু, শ্রোত্র দিয়ে তাঁকে অনুভব করা যায় না—তিনি অবাঙমানসগোচর। দ্বিতীয় খণ্ডে উপনিষদকার বললেন, যারা মনে করে ব্রহ্মকে জেনেছি, বস্তুত তারা তাঁকে জানে না। আর যাঁরা ব্রহ্মের সামান্যতম আশীর্বাদ লাভ করেছেন তাঁরা বোঝেন—তিনি এখনও অবিদিত, অপরিজ্ঞাত। তৃতীয় খণ্ড, যেটা আজ শেষ হবে তাতে কিছু নাটকীয়তা আছে। দেখা যাচ্ছে, একবার ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবাসুর-সংগ্রামে পরমেশ্বরের কৃপায় জয়ী হয়ে বিজয়লব্ধ অভিমানে আস্ফালন করছেন। ঠিক তুমি-আমি যেভাবে পরীক্ষায় পাস করে, চাকরিতে প্রমোশন পেয়ে, মামলা বা ইলেকশানে জিতে মাতামাতি করি। হঠাৎ দেবগণ দেখলেন—অদূরে এক আশ্চর্য জ্যোতিঃপুঞ্জ। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ সেই পরম রমণীয় জ্যোতির সমীপস্থ হয়ে তার স্বরূপ বুঝতে পারলেন না। জাতবেদ অগ্নি এবং মাতরিশ্বা বায়ুর গর্ব খর্ব হল। তখন স্বয়ং দেবরাজ সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হলেন। জ্যোতিঃপুঞ্জের সন্নিকটবর্তী হতেই অকস্মাৎ সেই জ্যোতির রূপান্তর ঘটল—তিনি এবার বহুবিধ শোভামণ্ডিত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা এক পরম রমণীয়া স্ত্রীমূর্তিতে রূপান্তরিত হলেন। সেই রমণীমূর্তিই ইন্দ্রকে বুঝিয়ে দিলেন—এই যে তোমরা অসুরদিগকে পরাজিত করেছ বলে আস্ফালন করছিলে এ তোমাদের শক্তিতে হয়নি ; এ

সেই সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরেরই কৃপার ফল। অতএব তোমরা মিথ্যা মোহ পরিত্যাগ কর—উচ্চারণ কর সেই স্তবমন্ত্র, যা সর্বপ্রথমে বলা হয়েছে: মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরণমস্তনিরাকরণং মেহস্তু! বল—আমি যেন ব্রহ্মাকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন।

কিন্তু কেন? কেন কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ডের শেষ শ্লোকে এই পরম রমণীয়া নারীমুর্তির আবির্ভাব ঘটল? সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ কি স্বয়ং এ নির্দেশ দিতে পারতেন না দেবরাজ ইন্দ্রকে? পরম 'পুরুষের' সন্ধান দিতে কেন পরমাপ্রকৃতির অবতারণা করলেন উপনিষদের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দ্রষ্টা? কই, 'নোয়া'র ক্ষেত্রে তো তার প্রয়োজন হয়নি? জেহোভা স্বয়ং অন্তরীক্ষ থেকে নোয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—প্লাবনের হাত থেকে কীভাবে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হবে। সিনাই পর্বতশিখরে মোজেস্‌ও সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অমনই এক জ্যোতিঃপুঞ্জের। সেই অপার্থিব অগ্নি স্বয়ং মোজেস্‌কে শিখিয়েছিলেন 'দশমহাবিদ্যা' মন্ত্র। তাহলে কেনোপনিষদের কবি কেন তাঁর নাটকে এনে ফেললেন ঐ পরম রমণীয়া নারীকে? কী বলতে চাইছেন উপনিষদকার? কেনই বা তিনি প্রথম শ্লোকে প্রার্থনা করেছিলেন—আমার বাক্-প্রাণ-চক্ষু-শ্রবণেন্দ্রিয় সমেত ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টি লাভ করুক, কেনই বা শেষ পর্যায়ে চরম সত্যকে শোনাতে চাইছেন পরম রূপবতী এক নারীমূর্তির মাধ্যমে? কেন? কেনেষিতং? কার ইচ্ছায়...

: দাদু!

হঠাৎ মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হল। আনন্দময়ের কানে গেল নাতনীর কণ্ঠস্বর। বইখানি তিনি মুড়ে রাখলেন। চোখ তুলে দেখলেন মিনতি তাঁর ইজিচেয়ার থেকে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে, লাজুক-লাজুক মুখে।

: কি রে? কী ব্যাপার? কিছু বলবি?

: হ্যাঁ, একটা স্বীকারোক্তি আছে।—মিনতি বসে পড়ে একটা টুলে। বলে, একটা অন্যায় করেছি, সকালবেলা তোমরা যে গোপন পরামর্শ করছিলে তা আমি সব শুনেছি। পাশের ঘর থেকে।

: হুঁ। গুরুতর অপরাধ!

: তুমি রাগ করনি বল?

: রাগ করিনি মানে? রীতিমত রাগ করেছি! পাশের ঘরে লুকিয়ে বসে আমাদের আলোচনা শোনা নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে তোর! আমি খুশি হতাম তুই যদি এ ঘরে এসে বসতিস—আলোচনায় যোগ দিতিস।

: আমি জানি তুমি খুব লিবারাল; কিন্তু ওঁরা অস্বস্তি বোধ করতেন। যৌন সাহিত্য এবং অশ্লীলতার বিষয়ে আলোচনা কতদূর যাবে তা তো জানতুম না।

আনন্দময় জবাব দিলেন না।

: একটা কথা দাদু—তুমি প্রথমে বললে, বইটা অশ্লীল নয়, পরে বললে তুমি স্বীকার করছ যে বইটা অশ্লীল—কোনটা তোমার সত্যিকারের মত?

: তুই তা বুঝবি না—বইটা তো তুই পড়িসনি?

: পড়েছি। নির্মল যে বইখানা রেখে গিয়েছিল সেখানা পড়েছি আমি। আমার কাছে কিন্তু বইটা অশ্লীল লেগেছে।

আনন্দময় সোজা হয়ে বসেন। বলেন, তাহলে তোর সঙ্গে আলোচনা হতে পারে।

: সেই জন্যেই তো এসেছি। আমি ব্যাপারটা তোমার কাছে বুঝে নিতে চাই। তোমার সঙ্গে সব বিষয়েই দেখেছি মোটামুটি আমার মতের মিল হয়। যে নাটক, যে গান, যে বই তোমার ভাল লাগে, দেখেছি মোটামুটি আমারও তা ভাল লাগে; আবার যেটা আমার খারাপ লাগে, দেখা যায় তোমারও তা খারাপ লেগেছে। অথচ এই একখানা বইয়ের ব্যাপারে তোমার আমার মতের মিল হল না কেন? তুমি আমাকে বুঝিয়ে বল তো, সাহিত্যে শালীনতার ঠিক মাপকাঠিটা কী? জানি, জবাবে তুমি বলবে সেটা দেশ-কাল-ব্যক্তিনির্ভর। আমি আজকের তারিখে, এই যোধপুর পার্কে তোমার মতটা জানতে চাইছি।

আনন্দময় বললেন, প্রথমেই বলি, ব্যক্তিটি আবার ঐ দেশকালনির্ভর অর্থাৎ আমার মতামত নির্ভর করবে দেশ-কালের মতামতের উপর। যেটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে শালীন মনে করব, অথচ বুঝব আমার আশপাশের সকলের চোখে সেটা অশালীন—আমাকে বলতে হবে সেটা অশালীন। কারণ রায়দানের আগে আমাকে মনে রাখতে হবে ঐ শিল্পকর্মটা আমি ছাড়া আরও অনেকের হাতে পড়বে; তাদের প্রতিক্রিয়া মনে রেখেই আমাকে মতামত দিতে হবে। প্রথমত সাহিত্যে রস বিচারের ভাল-মন্দ ধারণাটা রুচিগত এবং ব্যক্তিনির্ভর; সুনীতি-দুর্নীতির বিচার ব্যক্তিমানসের মধ্যে সীমিত নয়—সেটার সামাজিক বিচার দরকার; তেমনি সুরুচি-কুরুচির ধারণাটাও কিছুটা ব্যক্তিগত, কিছুটা সামাজিক। মোটকথা, রুচি নীতি এবং দণ্ডবিধি পরস্পর সম্পর্কবিমুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "এই যে আমাদের একটা আশ্চর্য দেহ এর ভিতরে আশ্চর্য কতকগুলো কল...এই কলগুলোর সম্বন্ধে ভগবানের যেন বিষম একটা লজ্জা আছে" (সৃষ্টি—সাহিত্যের পথে)। এটা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধারণা, রবীন্দ্রনাথের কালে মানুষেরা এই কথা বিশ্বাস করত, এই ভাবে ভাবত। তুমি আমি হয়তো বলব—কই বাপু? ভগবানের লজ্জা আছে বলে তো মনে হয় না। সভ্য মানুষ ছাড়া ঐ আশ্চর্য কলগুলোর ব্যবহারে জীব-জগতে কাউকে কোথাও তো লজ্জা পেতে দেখি না। নিঃসন্দেহে মানতে হবে—এই যে লজ্জার ভাব, আবরণ, গোপনীয়তা এর ধারণাটা প্রকৃতিতে নেই, আছে মানুষের সমাজব্যবস্থায়, সভ্য মানুষের তৈরী সেটা। জীব-জগতের বিবর্তনের মত এ বিষয়ে—ঐ যৌন অঙ্গ, যৌন ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির গোপনীয়তার বিষয়ে ধারণাটা যুগে যুগে, দেশে দেশে বিবর্তিত হয়েছে। আগেই বলেছি, দার্শনিক প্লেটো এক সময়ে মনে করেছিলেন হোমারের মহাকাব্য স্থানে স্থানে অশ্লীল; তিনি গ্রীক ছাত্রদের উপযোগী করে সে মহাকাব্য সংশোধনের কাজেও হাত লাগিয়েছিলেন। অথচ মজা হচ্ছে এই যে, সেই নীতিবাগীশ প্লেটো অধ্যাত্মমিলনতত্ত্বের যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি লিখেছেন—'ব্যাঙ্কুয়ে', তার সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "বাঙলায় এর কথায়-কথায় অনুবাদ করা চলে না, কারণ আদর্শনিষ্ঠ পাঠকদের কাছে তা ঘোর অশ্লীল গণ্য হবে।" এই ঘটনা যুগে যুগে একই ছন্দে ঘটেছে। যে রবীন্দ্রনাথ 'ভাতারখাকী' শব্দটা এড়িয়ে যাবার জন্য এক প্যারাগ্রাফ কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর 'চোখের-বালি'র বিনোদিনী এবং 'ঘরে বাইরে'র বিমলা সন্দীপের উপর কট্টর রুচিবাগীশদের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল একদিন। তাঁর 'পরিশোধ' কবিতাটি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "যদি-বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতি-নিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড় হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা

পড়ে গেল।" (তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে)।

মিনতি বললে, ক্ষুব্ধ হয়েই বলুন আর শান্ত হয়েই বলুন, আমার মনে হয় ঐ একটি ছত্রে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ের শেষ কথাটি বলেছেন।

: কারেক্ট। ঐ কথাই আর একটু ঘুরিয়ে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন প্রমথ চৌধুরী, "শ্লীলতা অশ্লীলতার বিচারের মাপকাঠি হবে মর‍্যালিটির নয়, বিউটির।" রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সত্য' বলেছেন, প্রমথ চৌধুরী তাকে 'সুন্দর' বলেছেন। এই যে দুটি ধারণা, কন্‌সেপ্ট্‌, 'সত্য' ও 'সুন্দর', এদের যোগসূত্র হচ্ছে 'শিব'! আমার মনে হয়, সাহিত্যের সেটাই মাপকাঠি হওয়া উচিত। কোনও রচনা অবসীন, অশ্লীল অথবা রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সেটা যাচাই করার ঐ তিনটিই হচ্ছে মাপকাঠি, অ্যাসিড টেস্ট। দেখতে হবে সে 'সত্য'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি না, সে 'সুন্দর'-এর উপাসনা করছে কি না, এবং তাতে মানবসমাজের কল্যাণ হবার সম্ভাবনা আছে কি না। 'শিব' লুকিয়ে আছে কিনা।

মিনতি বললে, কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, একটি সাহিত্য-কীর্তি বা শিল্প-কর্ম তোমার কাছে সত্য-শিব-সুন্দরের পরীক্ষায় পাস-মার্কা পেল; কিন্তু তুমিই তো একমাত্র পাঠক নও—আমি সে বইটার মধ্যে শুধু কুৎসিত রিরংসাপূর্ণ কতকগুলি চিত্রই দেখতে পেলাম—আমার মনে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল—এবং দেখা গেল আমিই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহলে?

: তাহলে সেটাকে বর্জন করতে হবে; কিন্তু সে কাজ সাহিত্য-সমালোচকের নয়, পুলিসের। দার্শনিক ক্রোচে বলেছেন, "সাহিত্যের বিচার সুন্দর-অসুন্দর নিয়ে। শ্লীল-অশ্লীলের বিচারটা সাহিত্য-রসিকের নয়, আরক্ষ্যা-বিভাগের—যাদের উপর দায়িত্ব আছে সমাজের মঙ্গল বিধানের।"

: সাহিত্য-সমালোচকের দায়িত্বও তো তাই—সমাজের মঙ্গল বিধান।

: মানলাম। তাই যে সাহিত্য 'অশ্লীল' বলে মনে করবেন তাকে তিরস্কার করবেন সমালোচক। নিশ্চয় করবেন।

মিনতি বলে, আমরা কিন্তু দাদু ঘুরে ফিরে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে এসেছি। ওর জবাবে আমাকে আবার সেই প্রশ্নটাই করতে হবে: সাহিত্যে 'অশ্লীল' বলে কোনটাকে মনে করব? অশ্লীল কী?

আনন্দময় বলেন, প্রচলিত অর্থে অশ্লীল কাকে বলব তার একটা মোটামুটি সংজ্ঞা আমাদের নির্দেশ করতে হবে; না হলে এ আলোচনা অগ্রসর হতে পারবে না: আইনের নজীর তুলবো না, আমি রুচির কথাই বলি: মনুষ্যেতর প্রাণীদের পশু-সমাজ যে বিষয়ে অলজ্জিত, মানুষের তাতে ভারি লজ্জা। মিল্টনের মহাকাব্যে ইডেন উদ্যানে আদম-ঈভের যে নগ্ন সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে—তার সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের কোটি কোটি নগ্ন-নায়িকার নগ্নতার তুলনা চলে না—কারণ আদম-ঈভ পরস্পরের নগ্নতার মধ্যে সে শিহরণ, সে রোমাঞ্চ অনুভব করেনি, যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে অন্যান্য নায়ক-নায়িকা। মজা হচ্ছে—ঐ যে একটা আবরণ সমাজ আরোপ করল, নরনারীর দেহের কোন কোন অঙ্গ গোপন করতে, ঐ যে কিছু কিছু শারীর-ক্রিয়াকে সাধারণ লোকচক্ষুর আড়াল করল—এতেই সাধারণ মানুষ হল কৌতূহলী। সেই কৌতূহলই খোরাক জুগিয়েছে সাহিত্যশিল্পে ঐ আবরণটি একটু খুলে ভিতরটা দেখার, দেখানোর। সেটাই

প্রেরণা জুগিয়েছে নর-নারীর নগ্ন মূর্তি গড়ার, যৌন মিলনদৃশ্যকে সাহিত্য এবং শিল্পে বারে বারে ফিরে ফিরে আনার। ঠিক যে কৌতূহলে বাসরঘরে উঁকি দেওয়াটায় অপরাধ হয় না, ফুলশয্যার রাত্রে কোন কৌতুকময়ীকে খাটের নিচে আবিষ্কার করলে বর-বধূ খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, রাগ করে না—সেই ক্ষমাসুন্দর চোখেই আবহমানকাল সমাজ ঐ আবরণ উন্মোচনের চেষ্টাটাকে—সাহিত্যে আর শিল্পে—স্বীকার করে নিয়েছে। ওতে অপরাধ হয় না—ওটা অশ্লীল নয়। তবে অশ্লীল কোনটা? সেই একই কথায় ফিরে আসব—যেখানে ঐ আবরণ উন্মোচনের তাগিদ কৌতুকের নয়; তা অবসীন এবং ইম্মরাল, তা শুধু আমাদের ঘৃণার উদ্রেক করে, বিরক্তি উৎপাদন করে।

এইখানে মনে রাখতে হবে 'অশ্লীল' এবং 'অসৎ' অর্থাৎ 'অবসীন' এবং 'ইম্মরাল' দুটি সমার্থক শব্দ নয়। অনেক সময় আমরা দুটোকে গুলিয়ে ফেলি—অশ্লীলকে ভাবি ইম্মরাল, ইম্মরালকে ভাবি অশ্লীল। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা বোঝা যাবে: মলমূত্রত্যাগ নিশ্চয়ই ইম্মরাল নয়, অশ্লীল; আবার পরকীয়া প্রেম সামাজিক বিধানে অবৈধ, ইম্মরাল,—কিন্তু তাকে অশ্লীল বলতে পারি না। সংক্ষেপে বলতে পারা যায়, প্রচলিত সভ্য সামাজিক বিচারে সাহিত্যে কতকগুলো জিনিস অগ্রাহ্য ইম্মরাল বলে, কতকগুলি 'অবসীন' বলে। ধর কয়েক প্রকারের নিষিদ্ধ যৌন সংসর্গ—ভ্রাতা ভগ্নীর, পিতা পুত্রীর, মাতা পুত্রের। এগুলি 'ইম্মরাল' এবং 'অবসীন'। তবু ঐ বিষয়বস্তু নিয়েও যথেষ্ট সাহিত্য রচিত হয়েছে। গ্রীক ট্রাজেডি 'অয়দিপাউস', জন ফোর্ডের 'দি পিটি শী ইজ এ হোর', (1639 খ্রীঃ অঃ অভিনীত—ভ্রাতা ভগ্নীর যৌন-মিলন বিষয়ে নাটক), টমাস মান-এর 'দ্য হোলি সিনার' ঐ বিষয়বস্তু নিয়েই লেখা এবং সেগুলি রসোত্তীর্ণ। দ্বিতীয়ত দেহের কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং যৌনসঙ্গমের কতকগুলি শারীর ক্রিয়া। তার কতখানি বলা যাবে, কতখানি বলা যাবে না তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে সীমারেখার পাঁচিল বারে বারে ভাঙা হয়েছে এবং গাঁথা হয়েছে। আজকের ইংরাজী উপন্যাসে ছাপার হরফে যে শব্দগুলি প্রচলিত—বাঙলা ভাষায় তা ছাপা চলে না। হেনরি মিলার, নরম্যান মেইলার অথবা উইলিয়াম বারোজ ইত্যাদি লেখক যেভাবে ঐ সব শারীর ক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিচ্ছেন তাতে বিবমিষার উদ্রেক হয়। সেগুলি সাহিত্যপদবাচ্য বলে আমি মানতে রাজী নই। তুই ওদের কোন লেখা পড়েছিস?

: হেনরী মিলারের 'ট্রপিক' সিরিজ পড়বার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। কিন্তু আমার প্রশ্ন—সেই বিচারে কেন তুমি অপ্রকাশ গুপ্তের ঐ 'সাগর-সঙ্গমে' উপন্যাসটাকে অপাঠ্য বলবে না?

: বলব না এই জন্য যে, সেটা পড়ে আমার গা-ঘিনঘিন করেনি, বিবমিষার উদ্রেক করেনি—অপরপক্ষে যে সমস্যা নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন সেটা আমার কাছে একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় বলে মনে হয়েছে, আমি বিশ্বাস করেছি ঐ অস্বাভাবিকত্ব, ঐ অ্যাবনর্মালিটি একটা উপন্যাসের আলোচ্য বস্তু হতে পারে, আমাদের ভাবাতে পারে!

: তার মানে 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' অথবা নবোকভের 'লোলিটা' তোমার কাছে অবসীন লাগেনি? কারণ সেখানেও উপজীব্য ছিল—অস্বাভাবিকত্ব?

: নিশ্চয় ও দুটি অশ্লীল নয়।

: আমার কাছে কিন্তু ঐ তিনটে বইই অশ্লীল—লরেন্স, নবোকভ এবং অপ্রকাশ গুপ্ত। ওঁরা অ্যাবনর্মালিটি নিয়ে আলোচনা করেছেন—

: অ্যাবনর্মালিটি, কিন্তু অ্যাবসার্ডিটি নয়, তাই নয়? নর্মাল দুটি ছেলেমেয়ে প্রেম করল, বিয়ে করল, তাদের বাচ্চা হল—এর মধ্যে সাহিত্যের উপাদান কোথায়? সে তো দিনপঞ্জিকা। লেডি চ্যাটার্লিজ যে যৌনসমস্যা সেটা অস্বাভাবিক হলেও অবাস্তব নয়; নবোকভের 'লোলিটা'র মূল উপজীব্য যৌনরসাত্মক বর্ণনায় নয়। সে-বর্ণনা স্বল্পপরিসর—'লোলিটা'র চমক বিষয়গত—অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী কন্যার জন্য পিতৃতুল্য হামবার্টের বিকৃত যৌনকামনা। আবার বলি—অস্বাভাবিক, কিন্তু অবাস্তব নয়। উপন্যাসের শেষ দিকে এই মনোবিকারের জন্য যে করুণ পরিসমাপ্তি, সুতীব্র বেদনাসঞ্চারী ভাষায় গাঢ়তা তা 'লোলিটা'কে রসোত্তীর্ণ সাহিত্যে পরিণত করেছে। অপ্রকাশ গুপ্তের 'সাগর-সঙ্গমে'ও সেই একই কথা : ছেলেটি স্বাভাবিক নয়, কিন্তু এমন অস্বাভাবিক রোগীর কথা অসম্ভবও নয়। অপরপক্ষে তটিনী স্বভাবিক—কিন্তু ঐ ছেলেটির সংস্পর্শে এসে প্রেমে পড়ে ঐ পোড়খাওয়া গণিকা প্রায় অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করেছে। সেটা অস্বাভাবিক, কিন্তু অবাস্তব কি?

: আমার তো মনে হয় অবাস্তব। একটি ত্রিশ বছরের প্রায়-প্রৌঢ়া গণিকা, যে মাত্র পনের বছর বয়স থেকে দেহ-ব্যবসায়ে লিপ্ত সে অমন একটি খোকা-নায়কের প্রেমে জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিল? অসম্ভব!

: দেবদাসের 'চন্দ্রমুখী' চরিত্রটা তোর কাছে বাস্তব মনে হয়?

: না, গল্পের খাতিরে মেনে নিয়েছি।

: এবারও না হয় তাই নিলি?

: এবার নিতে পারছি না অন্য কারণে। দেবদাস চন্দ্রমুখীর চেয়ে ছয় বছরের ছোট ছিল না। চন্দ্রমুখীর বাৎসল্য-রস জাগেনি। কিন্তু অপ্রকাশ সেভাবে তটিনী চরিত্রকে আঁকেননি। তুমি চল্লিশ বছর আগে বইটা পড়েছ দাদু; তুমি ভুলে গেছ। আবার পড়ে দেখ। তুমি আমার সঙ্গে একমত হতে বাধ্য।

আনন্দময় বললেন, বেশ আবার পড়ে দেখব।

আলোচনা এখানেই শেষ করে আনন্দময় উপনিষদখানা টেনে নিচ্ছিলেন। মিনতি বাধা দেয়। বলে, আজ থাক না দাদু। এস গল্প করি।

: কী গল্প করবি? কর!

: তোমার কথা বল। তোমার কালের কথা।

: সে তো সবই তুই জানিস।

: না, জানি না। সব জানি না। আবছা আবছা জানি। তুমি সন্ন্যাসী হয়েছিলে কেন?

: লোকে সন্ন্যাস নেয় কেন? সংসারে বীতরাগ হয়ে পরম সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। মনে করে, এ সংসারে সে চরম সত্যকে পাচ্ছে না—গুরুর সন্ধানে যায়।

: তুমিও গুরুর খোঁজে বেরিয়েছিলে?

: তা বলতে পারিস!

: পেয়েছিলে তাঁকে? তোমার গুরুকে?

: পেয়েছিলাম।

: কোথায়?

: কাশীতে। দশাশ্বমেধ ঘাটে।

: তিনি তোমার প্রশ্নের মীমাংসা করতে পেরেছিলেন?

: পেরেছিলেন।

: আশ্চর্য! কখনও তো তাঁর কথা বলনি আমাদের?

: তা যে বলা বারণ। বীজমন্ত্র গোপন রাখতে হয়। ও আলোচনা থাক মিণ্টু।

: আচ্ছা, তবে বরং বল কেন তুমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ল-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলে? চাকরিতে থাকলে হয়তো তুমি সুপ্রিম কোর্টে যেতে, যেতে না?

আনন্দমোহন বলেন, কি হলে কি হত সে আলোচনা থাক। বরং চাকরি কেন ছেড়েছিলাম সে গল্পটা শোনাই। তার মধ্যে একটা মজার প্লট আছে :

প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাশেষি। আনন্দমোহন তখন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেশনস্ জাজ। ওঁর আদালতে একটি বিচিত্র মামলা এল। আসামী একজন ডাক্তার। বাঙালী। বয়স বছর সাতাশ-আটাশ। একটা আধা-মিলিটারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। আধা-মিলিটারী এই অর্থে যে, হাসপাতালটা পুরোপুরি মিলিটারী অধীনে নয়। ও-অঞ্চলের কাছাকাছি মিলিটারী হাসপাতাল না থাকায় সেটা সামরিক কর্তারা আধা-আধি ভাগ বসিয়েছিলেন। অর্থাৎ হাসপাতালের একটি উইং নিয়ে সেখানকার শয্যাগুলি নিজ দখলে রেখেছিলেন। ঘটনাস্থল আসামে, কোহিমা ফ্রন্টের কাছাকাছি। মিলিটারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং পথ্য যোগান দিতেন—ঐ সিভিল হাসপাতালে রুগীদের সাময়িক চিকিৎসা করে তারা বহনযোগ্য হয়ে উঠলে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাদের দূরের মিলিটারী হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেই হাসপাতালের ডাক্তার হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন। মিলিটারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে সমস্ত ঔষধ ও পথ্য তিনি পেয়েছেন তা অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন। হাতেনাতে ধরা পড়ার পর মিলিটারী অফিসার ওকে পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছেই হস্তান্তরিত করেন—কারণ কোহিমা ফ্রণ্টে ইংরাজের অবস্থা তখন ভাল নয়; মিলিটারী কর্তৃপক্ষ ঐ হাসপাতালটা হাতছাড়া করতে চান না, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং শহরের প্রতিপত্তিশালী লোকদের সাহায্যও তখন তাঁর কাম্য। ডাক্তার ভদ্রলোক সামরিক সরবরাহ নাড়াচাড়া করার সুবিধা পেয়েছিল বটে, কিন্তু সামরিক আইনে তার বিচার হওয়াটা ঠিক নয়। তাই নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে ডাক্তারবাবুকে দায়রা সোপর্দ করা হয়েছে।

এই বিচারই আনন্দময়ের জীবনে শেষ বিচার। ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। বাদীপক্ষ, অর্থাৎ পুলিসের বক্তব্য ডাক্তার কালোবাজারে ঐ ঔষধ বিক্রি করেছেন। তাঁর চরম দণ্ড হওয়া উচিত। ডাক্তার তাঁর জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন—হ্যাঁ, তিনি মিলিটারী অফিসারের প্রেরিত ঔষধ সজ্ঞানে অন্যত্র ব্যবহার করেছেন—কিন্তু করেছেন ঐ হাসপাতালেরই অপর অংশে, যেখানে শায়িত ছিল অসামরিক হতভাগ্যের দল। যাদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারেননি সেই যুদ্ধের বাজারে। তিনি প্রচলিত আইন অনুসারে দোষী কি নির্দোষ জানেন না, কিন্তু মানবিকতার মালভূমিতে তিনি নির্দোষ।

বেশ ক'দিন ধরে বিচার চলেছে, কোর্ট-ইন্সপেক্টর শত চেষ্টা করেও প্রমাণ করতে পারছে না ডাক্তারবাবু কালোবাজারে ঐ ঔষধ বিক্রয় করেছেন। একাধিক সাক্ষী খাড়া করেছে সে; কিন্তু আনন্দময়ের মনে হচ্ছে সব সাজানো ব্যাপার। কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়—ঐ ডাক্তার ছোকরা যে স্বমুখে স্বীকার করছে সে স্বহস্তে ঔষধ রেজিস্টারে কারচুপি করেছে—এ-স্টোরের ঔষধ ও-স্টোরে নিয়ে গেছে রাতারাতি। আনন্দময়

ন্যায়াধীশ—এটা যে বিশ্বাসঘাতকতা তা তিনি অস্বীকার করেন কি করে? 'এ ব্রীচ অফ ট্রাস্ট'! তোমাকে আমি গচ্ছিত ধন রাখতে দিয়েছি—তুমি অঙ্গীকার করেছ আমার নির্দেশে, আমার প্রয়োজনে তা তুমি খরচ করবে, তার হিসাব দেবে। তোমার তো কোন অধিকার নেই সেটা কোনভাবে খরচ করে মিথ্যা হিসাব দাখিলের! আইনের পথ—ক্ষুরস্য ধারা ; একচুল বিচ্যুতি সে মানবে না। মানবধর্মের বৃহত্তর নির্দেশে প্রচলিত আইনকে ডিঙিয়ে যাবার অধিকার বিচারকের নেই—আইন বদলাতে হলে তা পরিবর্তন করবেন যাঁরা আইন প্রণয়ন করেন। বিচারক আইনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

এই বিচারের শেষাশেষি একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

লাঞ্চ-রিসেস-এর সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আনন্দময়ের মাথার ভিতর কেমন যেন টলে উঠল। এমন তাঁর আগে কখনও হয়নি। মনে হল আদালত-ঘরটা দুলছে—কোর্ট-ইন্সপেক্টর, ডিফেন্স-কাউন্সেল, আসামী, আদালতের ঘড়ি সবকিছু নিয়ে আদালতটা কাত হয়ে নিচে পড়ছে। হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন আনন্দময়। বাকিটা তিনি জানেন না, পরে লোকমুখে শুনেছেন।

একটা গণ্ডগোল। হায় হায়। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কেউ বলে—জল ; কেউ বলে—ডাক্তার। কোথাও কিছু নেই আসামীর কাঠগড়া থেকে বেড়া ডিঙিয়ে বিচারকের মঞ্চে লাফ দিয়ে পড়ল সেই তরুণ ডাক্তার। কোর্ট-পেয়াদা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছিল—তাকে দিল একটা প্রচণ্ড ধমক। মুহূর্ত-পূর্বে যে ছিল বিচারাধীন আসামী, সকলের করুণার পাত্র, সেই হয়ে গেল আদালতের সর্বময় কর্তা। বললে, ভিড় হটান, হাওয়া আসতে দিন। ডায়াস থেকে নেমে দাঁড়ান।—কোর্ট-ইন্সপেক্টরবাবুকেও রীতিমত ঠেলা দিয়ে নামিয়ে দিল। ঝুঁকে পড়ল বিচারকের উপর। কোর্টের বোতাম নিজে হাতে খুলে দিল। পরীক্ষা করল রুগীকে। বললে, সিরিয়াস কেস। এক্ষুণি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে পাঠান।

তারপরেই সে যে কাণ্ডটা করল তাতে কোর্ট-ইন্সপেক্টর বাধা না দিয়ে পারেননি। হুঙ্কার দিয়ে উঠল আসামী, শাট আপ! লোকটা মরে যাবে আর আপনি ফর্মালিটি করবেন!

বিচারকের টেবিলের একপাশে রাখা ছিল একগাদা ওষুধ। রীতিমত লেবেল-সাঁটা—পিপল্স্ এক্জিবিট নম্বর এক, দুই, তিন...। তারই একটা বেছে নিয়ে সে বিচারকের জন্য রাখা কাচের গ্লাসের জলে গুলে দিল। জোর করে খাইয়ে দিল অজ্ঞান মানুষটাকে—মুখ হাঁ করিয়ে। পিপল্স্ এক্জিবিট নম্বর ফাইভ হয়ে গেল একটা খালি শিশি।

আনন্দময় বেঁচে ওঠেন সে যাত্রা। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে ঐ এক দাগ ওষুধ তখনই তাঁর পেটে না পড়লে তিনি হয়ত বাঁচতেন না। আশ্চর্য ঘটনা!

আবার বিচারকের আসনে একদিন এসে বসলেন আনন্দময়। ডাক্তারবাবু আবার উঠে দাঁড়ালেন আসামীর কাঠগড়ায়। আবার শুরু হল বিচার—গচ্ছিত সম্পত্তি সেই সম্পত্তির মালিকের বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা কি আসামীর অন্যায় হয়নি? বিচার করে রায় দাও—কিন্তু এবার বিচার করতে বসে আনন্দময়ের মত বিচক্ষণ ন্যায়াধীশেরও সমস্ত মামলাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল। গচ্ছিত সম্পত্তিটা কী? পিপল্স্ এক্জিবিট নম্বর ফাইভ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—সেটা ছিল আদালতের কাছে দেওয়া গচ্ছিত সম্পত্তি। কে দিয়েছিল?—বাদীপক্ষ। বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত সেটা গচ্ছিত রাখার দায় ছিল আদালতের। আদালত অর্থে বিচারকের। শিশিটা এখন শূন্যগর্ভ! কে সেই গচ্ছিত সম্পত্তির অপব্যবহার

করল?—ঐ আসামী, যাকে শাস্তি দিতে তিনি বসেছেন বিচারকের আসনে।

কিন্তু!

ধরা যাক আনন্দময় জ্ঞান হারাননি। বাকশক্তি রুদ্ধ হয়নি তাঁর। তাহলে? তিনি কি বলতেন—খবর্দার! ঐ গচ্ছিত সম্পত্তিটা ব্যবহার কর না?

জিনিসটা কী দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত? যেহেতু রুগী হচ্ছেন বিচারক আনন্দময় রায়, জে—তাই ঐ শূন্যগর্ভ পিপল্‌স্ এক্‌জিবিট নম্বর ফাইভটার ব্যাপার চাপা দিতে হবে; আর যেহেতু কোহিমা ফ্রন্টের কাছাকাছি সেই অখ্যাত জনপদের আর্ত-রুগীর দল ডিস্ট্রিক্ট জাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি, তাই তাদের হাতের কাছে ওষুধ থাকা সত্ত্বেও তাদের মরতে হবে?

আনন্দময় এ বিচারের রায় দিতে পারেননি।

মহামান্য হাইকোর্টকে তাঁর সমস্যাটা সম্পূর্ণ জানিয়ে তিনি অব্যাহতি চেয়েছিলেন। না, এ মামলা থেকে নয়, চাকরি থেকে।

যোগ দিয়েছিলেন ল-কলেজে।

আর কোনদিন বিচার করেননি—আইনের বিশ্লেষণ করেছেন বাকি জীবন। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যাকাররূপেই আনন্দময়ের খ্যাতি—তিনি হতে পারেননি সুপ্রীম কোর্টের জাজ, অন্তত হাইকোর্টের রিটায়ার্ড চীফ্ জাস্টিস্!

আনন্দময় তাতে নিরানন্দ নন।

তিনি আনন্দময়।

## পনের

খবরটা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসল ভাস্কর। এমনটা যে ঘটতে পারে সে আশঙ্কাই করেনি। ইয়াকুবকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই—ভারতী প্রকাশনীর সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের কারবার; কিন্তু সে যা বলছে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ইয়াকুব ফিরে এসেছে। একা। আবদুল রেজ্জাক তার সঙ্গে আসেনি। সে নাকি হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে গেছে। হ্যাঁ—ভাস্করের নির্দেশমত সে আবদুলকে জানিয়েছিল—তাকে প্লেনে করে কলকাতা আনা হবে, তার খাওয়া-থাকার রাজকীয় আয়োজন করা হবে এবং তাকে প্রতিশ্রুত এক হাজার টাকাও দেওয়া হবে। আবদুল খুশি হয়েছিল শুনে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে খোঁজ নিতে গিয়ে শোনে, আবদুল কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করেছে। কোথায় গেছে, কেন গেছে, কেউ জানে না।

খবর শুনে এরা স্তম্ভিত। প্রতিবাদীর পক্ষে ঐ একটিমাত্র সাক্ষী হলেও হতে পারত। সে এমন কর্পূরের মত উপে গেল কেমন করে? কেন?

কেন, তা আবশ্য জানা গেল। সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছে প্রকাশ কর। সেই যে ছোকরাকে প্রদীপ প্রাইভেট গোয়েন্দা হিসাবে নিযুক্ত করেছে। ছোকরা কাজের ছেলে। কোথা থেকে এসব সংবাদ সে যোগাড় করছে বোঝা কঠিন; কিন্তু যোগাড় ঠিকই করছে। প্রকাশ কর বললে, আবদুল রেজ্জাক হচ্ছে বাদী পক্ষের সবচেয়ে জোরালো সাক্ষী। ইয়াকুবের আগেই, অথবা পরেই পুলিসের এজেন্ট তার পাত্তা পায়। আবদুল লোকটা হঠাৎ বুঝতে পারে তার বাজারদর অত্যন্ত চড়া। বেশি দরাদরি করতে সে

সাহস পায়নি। যেহেতু পুলিসের এজেন্ট বেশি অফার করেছে তাই সে ও-পক্ষেই ঢলে পড়েছে।

প্রকাশের বিশ্বাস—আবদুল বর্তমানে কলকাতায় আছে। তাকে তালিম দেওয়া হচ্ছে। আদালতে দাঁড়িয়ে যাতে সে একঝুড়ি মিথ্যা কথা বলতে পারে—অপ্রকাশ গুপ্তকে সে চিনত, লোকটা মাতাল, বদমায়েস, বেশ্যাপাড়ায় পড়ে থাকত এবং নেহাৎ টাকার প্রয়োজনেই সে ঐ বটতলা-মার্কা অশ্লীল বইটা লিখেছিল। অপ্রকাশের চিঠিপত্রের মধ্যে যেগুলি এই সিদ্ধান্তের পরিপূরক শুধুমাত্র সেইগুলিই সে দাখিল করবে।

সবটা শুনে সলিল বললে, মনে হচ্ছে ভগবান নেই—

প্রদীপ বলে, সম্ভবত নেই। এবং আবদুল রেজ্জাক আছেন, এ-পক্ষে নয় ও-পক্ষে। ঠিক হ্যায় ; আর কে কে আছেন প্রকাশ? ও-পক্ষের সাক্ষী?

: এখনও সব খবর পাইনি। শুনেছি, একজন আছেন বাঙলার অধ্যাপক, সরকারী কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেণ্ট ; একজন আছেন সংখ্যাতত্ত্ববিদ, খোদায় মালুম—তিনি কী একটা জরিপ করছেন ; তিন নম্বর আছেন একজন মহিলা সাক্ষী। তাঁর পরিচয় পাইনি। আর আছেন বিমান গুহ—যিনি টেপরেকর্ডারে আবহ-সঙ্গীত বাজিয়ে এজাহার দেবেন আদালতে—শুনিয়ে দেবেন আসামীর স্বীকারোক্তি। জনশ্রুতি—বিজয়বাবু নাকি বলেছিলেন, 'বইটা রগরগে! ঘুম ছুটিয়ে দেয়।' অর্থাৎ প্রমাণিত হবে—বিজয়বাবু অশ্লীল জেনেও বইটি বিক্রয় করেছেন। না জেনে আইন লঙ্ঘন করাও অপরাধ—তবে সজ্ঞানে সেটা করলে জলটা বেশী ঘোলা হয়! সব শেষে 'স্টার-উইটনেস্' হচ্ছেন শ্রীমান সুখেন কানোরিয়া। পুলিস নাকি বলেছে, সুখেন যদি স্বীকার করে যে, সে ডরোথি কাপুরের কাছে গিয়েছিল ঐ বইটার তাড়নায় তাহলে তার অপরাধটা লঘু করে দেখা হবে। বলা বাহুল্য, সুখেন তোতাপাখি হতে রাজী—

প্রদীপ বলে, বুঝলাম। আর ভাস্কর? তোমার এ পর্যন্ত সাক্ষীর তালিকা?

ভাস্কর মাথা নেড়ে বললে, ভাঁড়ে ভবানী! তুই ছাড়া এমন একজন লোকেরও সাক্ষাৎ পাইনি যার মতে 'সাগর-সঙ্গমে' অবসীন নয়!

: একজনও নয়?

: না। এমনকি সলিলও নয়। ও হ্যাঁ,—একজন আছেন। তাঁকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলা যাবে না।

: কেন? কে তিনি?

: শ্রীমতী উমা মুখার্জী। যেহতু সে ডিফেন্স কাউন্সিলের সহোদরা।

প্রদীপ ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। বলে, উমা! উমা পড়েছে বইটা! তোকে বলেছে?

: বলেছে। তার কাছে বইটা রসোত্তীর্ণ সাহিত্য। আশ্চর্য! ওর মত সামান্য একটা মেয়ে যে কথাটা বুঝতে পারল—

বাধা দিয়ে প্রকাশ বললে, আর একটা কথা বলতে ভুলেছি। বাদীপক্ষে আর একজন সাক্ষী আছেন। অত্যন্ত জোরালো সাক্ষী আছেন। যাকে বলে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন।

: কে তিনি?

: ডঃ আনন্দময় রায়, জে! আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত। যাঁর কথার দাম না দিয়ে পার পাবে না ম্যাজিস্ট্রেট।

প্রদীপ অবাক হয়ে বলে, আনন্দময় রায়? ঐ যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে প্রতি সপ্তাহে—

: হ্যাঁ তিনিই। পুলিস অফিসারের দল তাঁর যোধপুরের বাড়িতে সকাল সন্ধ্যা ধরনা দিচ্ছে।

ভাস্করের ভরাডুবি হতে তাহলে বাকি কি রইল? আনন্দময়ের ইতিহাস তার ভালভাবেই জানা। তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ভাস্কর। ও তাঁর ছাত্র। একবার ভাবল--- সোজা তাঁর কাছে চলে যায়। তারপর মনে হল, সেটা নিরর্থক। কোনও চাপে পড়ে--- তা সে রাজনৈতিক চাপই হ'ক বা অন্য কোন জাতের চাপই হ'ক---আনন্দময় তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে যাবেন না। বরং ভাস্কর আগেভাগে তাঁর দ্বারস্থ হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আনন্দময় যদি বাদী-পক্ষের সাক্ষী হন, তো হ'ন। ভাস্কর তাঁকে ক্রশ করবে—শ্রদ্ধার সঙ্গেই। তাঁর মতামতকে খণ্ডন করবে। দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে অর্জুন!

সলিল সারাদিন অফিসের কাজকর্ম করল : প্রদীপ পুস্তক বিপণীর বিভিন্ন মালিককে জবাব লিখল আর ভাস্কর ডুবে রইল পাঁচ-সাতখানা বই নিয়ে, অশ্লীলতা দোষে অভিযুক্ত কয়েকটি পুস্তকের মামলার উপর লেখা বই। ফ্যানি হিল, ইউলিসিস, মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মপিন, লেডি চ্যাটার্লিজ ল্যভর...

অফিস বন্ধ করার সময় হয়ে এল। এরা উঠব উঠব করছে এমন সময় আবার টেলিফোন বাজল। প্রকাশ কর ফোন করছে। ভাস্কর আত্মপরিচয় দিতেই বললে, আপনি এখনও আছেন তাহলে? খুব ভাল হয়েছে। শুনুন। পার্ক স্ট্রীটে পার্ক হোটেলের কাছে 'ক্রেজি কর্ণার'-টা চেনেন?...ঠিক আছে, তাহলে এক্ষুণি চলে আসুন।

: কী ব্যাপার?—প্রশ্ন করে ভাস্কর।

: আপনার সেই স্টার-উইটনেস্—উনিশ বছরের ডন-জুয়ান ওখানে ঢুকেছে। চারটে কুড়িতে সে আলিপুর থেকে নিজের অ্যাম্বাসাডারখানা নিয়ে বেরিয়েছে। ঐ 'ক্রেজি কর্ণারে' ওর দুজন বন্ধু আর তিনজন বান্ধবীও আছে। পুরুষদের মধ্যে একজন অমল হালদার, একজন সুরেশ প্যাটেল—মানে আমাদের দুজন 'সাসপেক্ট'। মেয়ে তিনটি-ই অচেনা।

: তা আমাকে যেতে বলছ কেন? আমি গিয়ে কী করব?

: আমার মনে হচ্ছে একটা 'ক্রাইসিস' অনিবার্য। সব কথা টেলিফোনে বলা যাবে না। আপনি চলে আসুন। আমি ঠিক 'ক্রেজি কর্ণারে'র উল্টো ফুটপাতে থাকব।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে প্রদীপকে সংবাদটা জানায়। প্রদীপ বলে, চল, তাহলে আমিও তোর সঙ্গে যাই। সলিলটা যে একটু আগেই বেরিয়ে গেল! অফিস বন্ধ করে—

বাধা দিয়ে ভাস্কর বলে, না রে। তোকে আর একটা কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি। উমা বলেছিল, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমাদের অফিসে আসবে। তুই বরং অপেক্ষা কর।

: উমা? সে কেন আসবে?

: সে আর এক ব্যাপার। আমাদের পারিবারিক ঝামেলা। সে সব তোর শুনে কাজ নেই। তুই থাক—আমার বেশি দেরি হলে ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিস। এখন ট্রামে বাসে উঠতে পারবে না। একটা ট্যাক্সি করে বরং—

: সে তোকে ভাবতে হবে না।

ভাস্কর হেসে বললে, জানি। ঘটনাচক্রেই এটা ঘটল কিন্তু প্রদীপ! আমার কোন ভূমিকা নেই!

প্রদীপ বললে, ঠিক আছে,—তুই রওনা দে।

ভাস্কর গাড়িটা নিয়ে রওনা দিল। প্রদীপের গাড়ি। ওরা তিনজনে এখন প্রয়োজনমত ব্যবহার করছে। গাড়ি না থাকলেও ভাস্করের লাইসেন্স আছে।

পার্কস্ট্রীটের চিহ্নিত কোণাটায় পৌঁছে ফী পার্কিং জোনে গাড়ি রাখতে বাধ্য হল। লক করে নেমে আসতেই এগিয়ে এল প্রকাশ কর। ওকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে সে সংক্ষেপে যা বলল তা এই—

সুখেন কানোরিয়াকে সে বিকাল থেকে অনুসরণ করছে। সুখেনের গাড়িটা সে চিনিয়ে দিল। বললে, সুখেন ঐ 'ক্রেজি কর্ণারে' ঢুকেছে আধ ঘণ্টা আগে। বসেছে ঘরে ঢুকতেই বাঁ দিকের টেবিলে ; একা। তার পরনে সাদা রঙের স্ট্রেচ-লন চোঙা প্যান্ট এবং পাকা টম্যাটো-রঙের লাল টেরিলিনের বুশশার্ট। দেখলেই ভাস্কর চিনবে। ওর বন্ধুরা বসেছে বেশ একটু দূরে। তারা অনেকক্ষণ খানাপিনা করছে। প্রকাশও সুখেনের পিছন পিছন ঢুকেছিল। লক্ষ্য করে দেখেছে, সুখেন এগিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে চায়। ওরা তাকে পাত্তা দেয়নি। বসতেও বলেনি। সুখেনের আহ্বানে দু-এক মিনিটের জন্য সুরেশ নাকি টেবিল ছেড়ে উঠে আসে। তাদের চাপাকণ্ঠে কিছু কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার বদলে তাকে কথাকাটাকাটিই বলা উচিত। প্রকাশের মনে হয় যে, সুরেশ সুখেনকে অপমানজনক কিছু বলে বন্ধুদের টেবিলে ফিরে যায়। তারপর সুখেন একলাই বসেছে আর একটা টেবিলে—কী একটা ড্রিংকস্ অর্ডার দিয়েছে। তাই খাচ্ছে সে একা বসে।

প্রকাশ বললে, আপনিও গিয়ে বসুন। আমার সন্দেহ হচ্ছে, অমল হালদার নয়, সুরেশ প্যাটেলই আমাদের টার্গেট। আমি এখানেই থাকছি। আমি সুরেশকে ফলো করব এবার। আপনি সুখেনকে লক্ষ্য করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে। হয়তো এতক্ষণ হয়েই যেত—আরও বন্ধুবান্ধবী থাকায় সেটা হচ্ছে না।

ভাস্কর বললে, ঠিক আছে। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি ভিতরে গিয়ে বসছি।

যেমন আশা করা গিয়েছিল—ভিতরের পরিবেশটা সেই রকমই। ধোঁয়ায় ধোঁয়া। অধিকাংশ মস্তানেরই চোঙা প্যান্ট, লম্বা চুল, দীর্ঘ জুলফি—অধিকাংশ মেয়েরই মুখে চুনকাম, ডীপকাট ব্লাউস, নেকি-নেকি ভাব। ডান্স ফ্লোরে একাধিক ছেলে-মেয়ে জোড়ায় জোড়ায় নাচছে। একপ্রান্তে সাদা শার্ট আর নীল প্যান্ট পরা একদল বাজিয়ে নানান বিলাতি বাজনা বাজাচ্ছে ; আর একটি বীটল-মার্কা ছেলে মাইকের সামনে মাথা নেড়ে নেড়ে একটা বিলিতি গান গাইছে। ভাস্কর এক পেগ সোলান নিয়ে বসল।

বেচারির প্রথম পেগ শেষ হবার আগেই দূর-প্রান্তের একটি টেবিল থেকে দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে উঠে পড়ল। তারা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চট করে সুখেনও উঠে দাঁড়ালো। তার পানপাত্র তখনও খালি হয়নি। মানিব্যাগ খুলে খানকতক নোট নিয়ে চাপা দিল গ্লাসটার নিচে। সেও এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ভাস্করও সুখেনকে দ্রুত অনুকরণ করলে, অনুসরণও। নির্গমন দ্বারের কাছে ফলে একটা জটলা। ভাস্করের সামনেই সুখেন। সে তার সামনের ছেলেটির কাঁধে হাত রাখল। ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ায়। সুখেন বললে, সুরেশ, য়ু মাস্ট কাম উইথ মি!

সুরেশ নামে ছেলেটি চাপা গলায় শুধু বললে, এখন নয়। তোকে ফোন করে—

: না! এখনই! নইলে আমাকেও তোদের সঙ্গে যেতে দে।

অমল হালদার একটি মেয়ের কানে কানে কি যেন বললে। সে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। আর দুটি মেয়ে ঝুঁকে পড়ে। তারা একটু সরে যায়। তাদের মধ্যে কি নিয়ে যেন রসিকতা হয়। তিনজনেই হাসতে থাকে। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে সুরেশকে বললে, উই আর থ্রি, ইউ আর টু—লেট হিম কাম অ্যাজ ওয়েল!

সুরেশ বললে, ও কে!

ওরা ছয়জনেই বেরিয়ে এল পার্ক স্ট্রীটে। ভাস্কর ওদের পিছন পিছন। একটু সরে গিয়ে সে একটা সিগ্রেট ধরায়। ওরা সবাই মিলে রাস্তা পার হবার চেষ্টা করে। এক ঝাঁক গাড়ির ফাঁক দিয়ে ওরা রাস্তার ওপারে গেল। ভাস্কর আটকা পড়ল। সে লক্ষ্য করতে থাকে ওদের। প্রকাশকে দেখা যাচ্ছে, সে নিজের সিটে বসেছে। ফি-পার্কিং জোনের ছোকরাকে পয়সা মিটিয়ে দিচ্ছে। কথা আছে, প্রকাশ সুরেশের পিছু নেবে; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওরা ছয়জনেই একসঙ্গে যাবে। সুতরাং ভাস্করের আর তাড়া নেই।

আসলে তা কিন্তু হল না। রাস্তা পার হয়ে আবার ওদের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা হল। মেয়ে তিনটে খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। সুরেশ একটা ট্যাক্সি ডাকল। ওরা পাঁচজনে উঠে বসল তাতে। ট্যাক্সি রওনা হয়ে গেল। সুখেন পড়ে রইল একা। প্রকাশ তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল ট্যাক্সির পিছন পিছন।

সুখেন গাড়িতে স্টার্ট দিল। ভাস্কর মরিয়া হয়ে বে-আইনিভাবে পার হল রাস্তা—চলন্ত গাড়ির ড্রাইভারের গালাগাল খেতে খেতে। চৌরঙ্গীর মোড়ে লাল বাতির সঙ্কেত না থাকলে ভাস্কর কিছুতেই সুখেনের গাড়িটার নাগাল পেত না। ভাগ্য ওর সহায়ক। সুখেন বাঁ দিকের লেন নিয়েছে—সাউথে যাবে। ভাস্কর ঠিক তার পিছনেই। গান্ধীজীর মূর্তিটাকে ডাইনে রেখে সুখেন চৌরঙ্গী ধরে চলল—বোঝা গেল সে বাড়িই যাবে—আলিপুরের দিকে। ঠিক তাই। বিড়লা তারামণ্ডলের কাছে সুখেনের গাড়ি ডাইনে মোড় নিল। কুইনস্ ওয়ে। কিন্তু আর এগুলো না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছাকাছি এসে, —আউটরামের মূর্তির কাছে ভীড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে সুখেন তার গাড়ি পার্ক করল। ভাস্করও গাড়ি দাঁড় করালো প্রায় ত্রিশ গজ দূরে।

অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুটো লাইট-পোস্টের মাঝামাঝি রাখা আছে সুখেনের গাড়ি। সে নামল না কিন্তু গাড়ি থেকে। দরজাও খুলল না। ও কি সিগ্রেট ধরাচ্ছে? না, তাহলে ভাস্কর দেশলাই বা লাইটারের আলো দেখতে পেত। কাছে-পিঠে আর কেউ নেই। বেশ কিছুটা দূরে একটা ভেলপুরীওয়ালাকে ঘিরে একটা জটলা। তিন মিনিট—পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট। ব্যাপার কি? ভাস্কর ড্যাসবোর্ড থেকে চাবিটা খুলে নিল। গাড়ি লক্ করল। এখন সে পায়চারি করবে। সামনে অন্ধকারে পার্ক-করা ঐ অ্যামব্যাসাডার গাড়িটার পাশ দিয়ে একবার হেঁটে যাবে। দেখবে, ওর ভেতরের একক যাত্রী কী করছে।

সান্ধ্যভ্রমণের প্রত্যাশিত পদক্ষেপে ভাস্কর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। সুখেনের গাড়ির ঠিক পিছনে এসে, দেখে সুখেন ড্রাইভারের সীটে বেকায়দায় বসে আছে। ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে। ও কি খুব বেশি ড্রিঙ্ক করেছে? ভাস্কর এগিয়ে আসে সামনের দিকে। একটা সিগ্রেট ধরাবার অছিলায় লাইটার জ্বালে। একি! সুখেন ঘুমোচ্ছে নাকি? ড্রাইভারের দরজায় কাঁচটা নামানো। ঝুঁকে পড়ে দেখল। নাঃ! সুখেন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

: ও মশাই! আপনার মানিব্যাগটা পকেটমার হয়ে যাবে। বাড়ি গিয়ে ঘুমোন!— ভাস্কর ওকে ধাক্কা দিতেই সুখেন লুটিয়ে পড়ে। দ্রুতহাতে দরজাটা খুলে ফেলতেই গাড়ির ভিতরটা আপনা থেকেই আলোকিত হয়ে উঠল। অচেতন সুখেনের দেহটা কাত হয়ে যায়। আর তখনই ওর কোলের উপর থেকে কি একটা ঠক্ করে পড়ে গেল। ভাস্কর সেটা তুলে দেখতেই বুঝতে পারে ব্যাপারটা কী ঘটেছে। একটা শূন্যগর্ভ কাচের শিশি। সুখেন আত্মহত্যা করেছে!

এক লাফে ভাস্কর উঠে বসল ওর গাড়িতে। ঠেলে সরিয়ে দিল সুখেনের অচেতন দেহটা। হাত বাড়িয়ে ওর নাড়িটা দেখবার চেষ্টা করল। বুঝতে পারল না সেটা সরব কিনা। নাকের কাছে হাত দিয়ে মনে হল—না, নিঃশ্বাস পড়ছে। সে যাই হোক, ফার্স্ট এড দেওয়াটার চেষ্টা না করাই ভাল। কাছেই পি. জি. হাসপাতাল। দু মিনিটের পথ। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ড্যাসবোর্ডে চাবি লাগানোই ছিল। একবারেই স্টার্ট নিল। ভাস্কর ওর অচেতন দেহটা নিয়ে রওনা হল পি. জি. হাসপাতালের দিকে। সার্কুলার রোড পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই ওর মত পরিবর্তন হয়েছে। এলগিন রোডে ডক্টর অতুলকৃষ্ণের চেম্বার আরও দেড় মিনিটের দূরত্ব। উনি রোগীকে জানেন, চেনেন—সুখেন যদি বেঁচে ওঠে তবে তার আত্মহত্যার এই প্রচেষ্টার কথাটা মনোহর কানোরিয়ার কাছ থেকে গোপন করা যাবে। যা অসম্ভব পি. জি.-তে। অবশ্য এখন সবচেয়ে বড় কথা ওকে বাঁচানো। কোথায় যাবে সে? পি. জি.-র এমার্জেন্সিতে, না ডাক্তার অতুলকৃষ্ণের চেম্বারে? সিদ্ধান্তটা নেবার আগেই ও দেখল কখন অজান্তে এলগিন রোডের দিকে মোড় নিয়েছে।

সৌভাগ্যই বলতে হবে—অতুলকৃষ্ণ চেম্বারেই ছিলেন। হুড়মুড় করে ভাস্কর ঢুকল তাঁর চেম্বারে। সংক্ষেপে বলল ব্যাপারটা। অতুলকৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন তৎক্ষণাৎ। ধরাধরি করে সুখেনের অচেতন দেহটা নিয়ে যাওয়া হল ওঁর চেম্বারে। শুইয়ে দেওয়া হল ওঁর রুগী দেখার টেবিলে।

ভাস্কর ঝুঁকে পড়ে বললে, ডক্টর মৈত্র, ও বেঁচে আছে?

অতুলকৃষ্ণ বললেন, আছে। ও কী খেয়েছে আন্দাজ করতে পারেন?

ভাস্কর সেই কাচের ক্যাপসুলটা বাড়িয়ে ধরে। তাতে এখনও গোটাকতক লালচে রঙের বড়ি রয়েছে।

: আই সি! স্লিপিং পিল্স! আপনি ও-ঘরে গিয়ে বরং বসুন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে অতুলকৃষ্ণ এ-ঘরে এলেন। ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, মনোহর কানোরিয়া আপনার কেনা হয়ে রইল মিঃ মুখার্জি। আপনি আর পাঁচ মিনিট দেরি করলে সুখেনকে বাঁচানো যেত না।

: ও ভাল হয়ে গেছে?

: বেঁচে গেছে। তবে অত্যন্ত দুর্বল।

: জ্ঞান ফিরেছে ওর?

: ফিরেছে। ও কিন্তু জানে না কে ওকে এখানে এনেছে।

: সেটা ওকে জানাবেন না, প্লীজ। আমি বরং ওর বাড়িতে একটা ফোন করে দিই।

: আমিও করতে পারি। তবে আপনার করাই ভাল। একটা কথা—সুখেন বলেছে,— শুধু অন্তরাকেই যেন জানানো হয়। বাড়ির আর কাউকে যেন—

: আমি জানি।

ভাস্কর টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু তাঁর রুগীর কাছে ফিরে গেলেন। দু-একবার রিঙিং টোনের পরেই মহিলা কণ্ঠের প্রশ্ন : হ্যালো?

ভাস্কর চিনতে পারে, তবু নিশ্চিত হতে বলে, আপনি কি অন্তরা দেবী?

ও-প্রান্তবাসী সেটা স্বীকারও করে না, অস্বীকারও নয়। প্রশ্ন করে, আপনি কে?

: আমি ডক্টর অতুলকৃষ্ণ মৈত্রের চেম্বার থেকে কথা বলছি, অন্তরা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

: অন্তরা বলছি। বলুন?

: নমস্কার। আমি ভাস্কর মুখার্জি।

: আবার! আপনি না বলেছিলেন আর কোনদিন আমাকে বিরক্ত করবেন না! আশ্চর্য নাছোড়বান্দা নির্লজ্জ লোক তো আপনি!

: মাফ করবেন। লাইনটা কাটবেন না। শুনুন! ডক্টর মৈত্রের নির্দেশেই আপনাকে ফোন করছি। সুখেন এখন এখানে আছে—ওঁর চেম্বারে—

: অসম্ভব! সুখেনের বাড়ি থেকে বের হওয়া মানা—

: শুনুন! মানা থাক আর না থাক সে বিকালে বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে বার হয়। তারপর—

সংক্ষেপে সে ঘটনার একটা বিবৃতি দিয়ে বললে, সুখেন চায় না যে, এ কথা বাড়ির আর কেউ জানতে পারে। তার গাড়ি এখানেই আছে। আপনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসুন।

অন্তরা এতক্ষণ শুনছিল শুধু। ভাস্কর থামতেই বললে, ও—মানে সুখেন একেবারে ভাল হয়ে গেছে তো? ভয়ের কিছু নেই?

: কিছু না। ও যদি নিজে ড্রাইভ করতে না পারে তবে ট্যাক্সি করেই ওকে নিয়ে যাবেন। আপনি চলে আসুন।

: আমি—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

ভাস্কর টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে। ওর কর্তব্য শেষ। এখন কী করবে? অন্তরার জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক। এখন বরং একটা ট্যাক্সি নিয়ে আবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে যেতে হয়। দেখতে হয় সেখানে টায়ার-টিউবগুলো সব এখনও স্বস্থানে আছে কি না। কিন্তু তার আগে আর একটা টেলিফোন করবে। ওদের অফিসে। কিন্তু উমা আর প্রদীপ কি এত রাত পর্যন্ত আছে সেখানে? টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সে ডায়াল করতে থাকে।

## ষোল

ভাস্কর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাবার প্রায় আধঘণ্টা পরে উমা এল। অফিস তখন ফাঁকা। সলিল আগেই চলে গেছে। অফিসটা দোতলায়। একতলায় 'ভারতী প্রকাশনী'র অফিস। এ ঘরটা বই দিয়ে ঠাসা ছিল এতদিন—সম্প্রতি বইগুলো গুদামে পাঠিয়ে ঘরটা খালি করা হয়েছে। নিচে ভারতী প্রকাশনীতে অবশ্য কাজকর্ম চলছে। উমা নিচে জিজ্ঞাসা করে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠে এল। পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখল, প্রদীপ একা বসে

কী একটা বই পড়ছে। ভাস্কর নেই।

: ছোড়দা নেই?

বইটা সরিয়ে রেখে প্রদীপ বললে, এস উমা, ভাস্কর একটু বেরিয়েছে। আমাকে বলে গেছে তুমি এলে তোমাকে বসাতে। বস—ঐ চেয়ারটায়।

উমা ঘরটাকে দেখছিল। এগিয়ে এসে বসল। প্রদীপদার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা যে আছে এটা উমা জানত; ভেবেছিল—ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি টেনে এনে বলবে—প্রদীপদা ভাল আছেন তো? তারপর ছোড়দার হাত ধরে বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়। প্রদীপদার সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ নেই অনেক—অনেক দিন; সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর থেকে প্রদীপ ওদের বাড়িতে আর যায় না। টেলিফোনে দু-একবার কথা হয়েছে—নিতান্ত মামুলি কথা—সেই সন্ধ্যার জের টেনে নয়, এমনকি তার আগেকার অনুরাগঘন আরও অনেক-অনেক সন্ধ্যার আভাস খুঁজে পাওয়া যেত না টেলিফোনের দূরভাষণে। উমার মনে হত—ওদের সেই হারানো দিনগুলি আছে—কাব্যের ভাষায়—রাতের তারার মতই সঙ্গোপনে, দিনের আলোর গভীরে। সেই প্রদীপদার সঙ্গে এমন নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসে অপেক্ষা করতে হবে শুনে উমা ব্লাউসের ভেতর ঘেমে উঠল। মুখ নিচু করে বসল। এদিকে ওদিকে খুঁজছিল—পড়বার মত কোন পত্রিকা-টত্রিকা, পড়বার জন্য না হলেও পড়ার অভিনয় করার জন্য।

: ঘরটা এতদিন গুদাম হয়ে পড়ে ছিল। গত সপ্তাহে ফাঁকা করিয়েছি—

যেন এক বছর পরে উমাকে জানাবার মত এটাই সবচেয়ে জরুরী কথা। তবু উমা খুশি হল। তার অস্বস্তি ভাবটা কাটলো। বললে—এককোট চুনকাম করিয়ে নিলেই পারতে—নোংরা হয়ে আছে।

: সময় পেলাম কোথায়? হুড়মুড় করে এমন একটা বিশ্রী মামলায় ফেঁসে গেলাম!

: শুনেছি। কবে মামলাটা আদালতে উঠছে?

: প্রাথমিক শুনানি হবে পরশু! 'কেস' খাড়া করতে পারলে তবে সেশনস্-এ যাবে।

: প্রাথমিক শুনানিতে কি সাক্ষীদের ডাকা হয়?

প্রদীপ ব্যাপারটা বোঝাতে থাকে, প্রাথমিক শুনানিতে কী কী হয়। ক্রমে উমা বেশ সহজ হয়ে আসে। প্রদীপদা ওকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন কিছু করছে না। এই এক বছর ধরে সে কী ভাবছে, কী করছে—আগেকার দিনগুলোর কথা তার মনে আছে কি নেই, সে অপ্রীতিকর সন্ধ্যাটির পর তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। উমা এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখল, তার প্রদীপদার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি একটা বছরে। ও ভাবছিল প্রদীপের চোখে ওর কোন পরিবর্তন ধরা পড়ছে কি?

: বইটা তুমি পড়েছ উমা?

: পড়েছি।

: তোমার কি মনে হয়েছে? বইটা অশ্লীল?

উমা উত্তরে একটু জ্ঞানগর্ভ বাণী ঝাড়ল,—দেয়ার্স নো সচ্ থিং অ্যাজ এ মরাল বুক অর অ্যান ইম্মরাল বুক। বুকস্ আর আইদার ওয়েল রিটন্ অর ব্যাডলি রিটন্—কোন বই হয় সুলিখিত অথবা সুলিখিত নয়—এক্ষেত্রে বইটা আমার কাছে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বলে মনে হয়েছে।

এ খবর জানা ছিল প্রদীপের—উমার মতামত—তবু সে যেন এ কথা প্রথম শুনল

এমন ভাব দেখিয়ে বলে, নাকি? বইটি কেন সুলিখিত বলে মনে হল তোমার?

: তার অনেকগুলি কারণ; তবে স্বীকার করব—আমার কাছে সবচেয়ে বড় কারণ যেটা, সেটা সাবজেক্‌টিভ, অবজেক্‌টিভ নয়!

: তার মানে?

: যেহেতু তুমি বইটা ছেপেছ এবং ছোড়দা তাই নিয়ে লড়ছে!

প্রদীপ হাসল। বললে, এ দুটো খুবই জোরালো যুক্তি উমা—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আদালতে এ যুক্তি দুটো টিকবে না। তোমার সাক্ষ্যের কোন দাম নেই।

: আমি তো সাক্ষী দিতে যাচ্ছি না।

প্রদীপ বলে, কিছু খাবে? চা, কফি কিংবা খাবার?

: না থাক। ছোড়দার কি ফিরতে দেরি হবে?

: বলা যায় না। ও এ কথাও বলেছে যে, বেশি দেরি হলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

: ও!—উমা গম্ভীর হয়। শেষে বলে, ওকে কয়েকটা জরুরী কথা বলার ছিল। বাড়িতে যে সব কথা বলার পরিবেশ নেই।

প্রদীপ বললে, জানি। মানে আন্দাজ করছি। ভাস্করের ব্যাপার আমি মোটামুটি জানি।

উমা চকিতে চোখ তোলে। বলে, কী জান? কী কথা বল তো?

: ওর সেই মক্কেল সংক্রান্ত কি? বিধবার সম্পত্তি উদ্ধার?

: হ্যাঁ। তবে তো তুমি জানই।

: সবটা নয়। ভাস্করের দিকটা জানি। তোমাদের বাড়িতে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কে কতটা জানেন তা জানি না।

উমা সহসা মনস্থির করে। প্রদীপ হচ্ছে ভাস্করের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু—এককালে ছিল, আজও আছে। মাঝের একটা বছর অবশ্য—কিন্তু সে জন্য তো উমাই দায়ী। উমা স্থির করল, প্রদীপের কাছে কিছুটা খুলে বলবে। ওর পরামর্শ চাইবে। ছোড়দাটা একরোখা, গোঁয়ার,—তার সঙ্গে পরামর্শ করায় লাভ নেই। উমা যতটা সম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে পারিবারিক সমস্যাটা মেলে ধরে—

শিবনাথের কাছে হঠাৎ এসে হাজিরা দিয়েছিলেন মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র সলিসিটার্স ফার্মের সিনিয়ার পার্টনার সুকোমল মিত্র। শিবনাথ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। সুকোমল যে বাড়ি বয়ে শিবনাথের মত নগণ্য প্রাক্তন কেরানীর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এটা তাঁর কল্পনার অতীত। শৈলবালা আলমারি খুলে টাকা বার করেন—ভাল মিষ্টি আনাতে; শিবনাথ আগন্তুক অতিথিকে সাদরে আপ্যায়ন করে আলোচনায় বসেন। উমা সবটা জানে না, সবটা শুনতে পায়নি, কিন্তু এটুকু বুঝেছে যে, সুকোমল এসেছিলেন শিবনাথকে অনুরোধ করতে যাতে ভাস্কর তার চাকরিটা না ছাড়ে। শিবনাথের অনুরোধেই একদিন সুকোমল চাকরি দিয়েছিলেন শিবনাথের পুত্রকে। সেদিন উপকৃত ছিলেন শিবনাথ, কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিলেন সুকোমলের বদান্যতায়। আজ চাকা ঘুরে গেছে। এখন সুকোমলই চাইছেন ভাস্করকে রুখতে। তিনি ভাস্করের কাছ থেকে যে-মাহিনায় যে-কাজ পাচ্ছেন তা অজানা-অচেনা কারও কাছে নতুন করে পাবেন না। সুকোমল স্বীকার করেছেন—ছুটি অন্তে যদি ভাস্কর তাঁর প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসে তবে তিনি তার যথেষ্ট মাহিনা বৃদ্ধি করে দেবেন। শুনে শিবনাথ বিগলিত; তিনি প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন পিতা হিসাবে যতখানি প্রভাব খাটানো সম্ভব, ততখানি নিশ্চয় খাটাবেন। এক রকম কথাই দিয়েছেন—ভাস্কর 'মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র' কোম্পানিতে ফিরে যাবে। বস্তুত সে যে পদত্যাগপত্র পেশ করেছে, আর বর্তমানে ছুটিতে আছে তা শিবনাথ আদৌ জানেন না।

এরপর স্বতঃই আলোচনা অন্য দিকে মোড় নেয়—কেন ভাস্কর ছুটি নিয়েছে? সব কথা শুনে শিবনাথ স্তম্ভিত হয়ে যান। বলেন, কাগজে দেখেছি বটে—কী একটা অশ্লীল বইয়ের ব্যাপারে বিজয় ভট্চাযকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। তা সেই কেস ভাস্কর লড়ছে এ তো ভাবতেই পারি না আমি। এত এত উকিল ব্যারিস্টার থাকতে ভাস্কর কেন?

এই পর্যন্ত বলে উমা থামে। পাদপূরণ করে প্রদীপ। বলে, বুঝেছি, এর জবাবে সুকোমল নিশ্চয় বলেন বইটির প্রকাশকের নাম, তাই না?

উমা হাসল। বললে, ঠিক তাই। তুমি তো জানই, অন্য একটা কারণে বাবা তোমার উপর খাপ্পা হয়ে ছিলেনই—

প্রদীপ ওকে শেষ করতে দেয় না। ভাস্করের কথা থেকে কথাপ্রসঙ্গে সে এবার নিজের প্রসঙ্গে চলে আসে। তার আর উমার। বুলস্ আই হিট করে বসে : কী কারণ উমা? আমি তো তোমাকে বাড়ি থেকে ফুসলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করিনি? আমি তো কখনও তোমার সঙ্গে কোন বেলেল্লাপনা করিনি, কুপ্রস্তাব করিনি? প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম—তুমি রাজী ছিলে বলেই। তাহলে? তাহলে তিনি এমনভাবে খাপ্পা হয়েছিলেন কেন?

উমার দৃষ্টি নত হল। যে কথাটা উঠবে না ভেবেছিল, পাকেচক্রে তাই উঠে পড়ল। কিন্তু কথা যখন উঠেছে তখন সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। বললে, বড়দার কথা তো তুমি জানই। বাবা অন্য যুগের মানুষ—তাঁর ধ্যানধারণা অন্যরকম। বড়দা অসবর্ণ বিয়ে করেছে বলে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক উনি ত্যাগ করেছেন। বড়দার মানি-অর্ডার বারে বারে ফেরত গেছে—তখনও ছোড়দা চাকরি পায়নি, আর বাবার অসুখ চলছে তখন।

প্রদীপ বললে, অথচ পাত্র হিসাবে—কিছু মনে কর না উমা—এ কোন আত্মশ্লাঘা নয়, আমি এমন কিছু খারাপ নই।

: আমি তাই বলেছি? আমার মত কালো মেয়েকে কেন যে তুমি—

: থাক উমা। একটা কথা বলবে? তোমার বাবার ঐ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুমি শ্রদ্ধা কর?

: নিশ্চয় নয়।

: তাহলে কেন তুমি রুখে দাঁড়াতে পারছ না? কেন ফিরিয়ে দেবে আমাকে?

উমা জবাব দিতে পারল না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। প্রদীপ আলতো করে ওর হাতের ওপর হাতটা রাখল। বলল, ঠিক এই পরিবেশে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব তা আধঘণ্টা আগেও আমি জানতাম না। তবু করছি—এমন সুযোগ আর হয়তো কোনদিন পাব না বলে। আমার প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে যাও আজ।

উমা হাতটা টেনে নিল না। নিচু মুখ তুলল। প্রদীপের চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, হয়তো এক সপ্তাহ আগে আমাকে ডাক দিলে আমি সব কিছু ছেড়ে তোমার সঙ্গে ভেসে পড়তাম ; কিন্তু আজ আর তা হবার নয়।

প্রদীপ নিজের হাতটা টেনে নেয়। বলে, কেন? যেহেতু আমি এই বিশ্রী মামলাটায়

জড়িয়ে পড়েছি? যেহেতু আমি বাবার সম্পত্তি থেকে—

: ছি প্রদীপদা! এসব কী বলছ তুমি? আমি—আমি তোমাকে যে ভালবেসেছিলাম সে কি তুমি ঐ অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে?

: না তা নয়। তবে কেন আজ তুমি তোমার বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পার না? বাধাটা কোথায়?

: বুঝতে পারছ না? ছোড়দা।

: ছোড়দা? মানে? সে তো আমাদের বিবাহে সম্মত—সে তো আগ্রহী।

: ছোড়দা—তুমি তো জানই—একটি মেয়েকে ভালবেসেছে। সে কায়স্থ, বিধবা, একটি সন্তানের জননী। এতবড় আঘাত বাবা-মা সইতে পারবেন না। হয়তো তখন কোন চাকরি-বাকরি ধরে আমাকেই ঐ সংসারের বোঝাটা টেনে চলতে হবে।

প্রদীপ জবাব খুঁজে পায় না। দুজনেই নিশ্চুপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর প্রদীপ বলে, উমা, তোমার ছোড়দার সঙ্গে সব কথা খোলাখুলি আলোচনা করব?

: না। একজনকে বঞ্চিত হতে হবেই। হয় ছোড়দা, নয় আমি। না হলে ঐ বুড়োবুড়িকে কে দেখবে বল? আমি ছোড়দার পথে কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয় একদিন আমাকে ভুলে যেতে পারবে, বিয়ে করবে, সুখী হবে।

: আর তুমি?

: আমি একটা চাকরি-বাকরি ধরবার চেষ্টা করব। যতদিন বাবা-মা আছেন, তার পরের কথা অনেক দূরের কথা—

: আমিও যদি অপেক্ষা করে থাকি?

: পাগলামি কর না প্রদীপদা। আমাদের সংসারের জটিলতার জন্য তুমি কেন খামকা নিজেকে বঞ্চিত করবে? তাছাড়া—

: একটা কথা বল। তোমার সঙ্গে আমার যে এইসব কথা হয়েছে তা কি তুমি ভাস্করকে বলবে?

: না। আজ আমি তোমাদের অফিসে আদৌ আসতে পারিনি—এই কথাই ছোড়দাকে বলব, তুমিও তাই বল। না হলে সে তোমাকে আমাকে প্রশ্ন করে করে জেরবার করে দেবে।

প্রদীপ কি একটা কথা বলতে গেল। তার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনটা। তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো?

: তুই এখনও বসে আছিস? শোন প্রদীপ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক করে বল...

: কী কথা?

: আমি যখন তোর ডিফেন্স কাউন্সেল তখন আমার উচিত সব সময়ে তোর স্বার্থ দেখা, মক্কেলের স্বার্থ দেখা, তাই নয়?

: নিঃসন্দেহে। একথা কেন?

: আমি এই ঘণ্টাখানেক আগে এমন একটা কাজ করেছি যা তোর স্বার্থের পরিপন্থী। সজ্ঞানে, জেনে শুনে—

: অন্যায় করেছিস! কাজটা কী?

দিয়েছেন পিতা হিসাবে যতখানি প্রভাব খাটানো সম্ভব, ততখানি নিশ্চয় খাটাবেন। এক রকম কথাই দিয়েছেন—ভাস্কর 'মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র' কোম্পানিতে ফিরে যাবে। বস্তুত সে যে পদত্যাগপত্র পেশ করেছে, আর বর্তমানে ছুটিতে আছে তা শিবনাথ আদৌ জানেন না।

এরপর স্বতঃই আলোচনা অন্য দিকে মোড় নেয়—কেন ভাস্কর ছুটি নিয়েছে? সব কথা শুনে শিবনাথ স্তম্ভিত হয়ে যান। বলেন, কাগজে দেখেছি বটে—কী একটা অশ্লীল বইয়ের ব্যাপারে বিজয় ভট্‌চাযকে পুলিসে গ্রেপ্তার করেছে। তা সেই কেস ভাস্কর লড়ছে এ তো ভাবতেই পারি না আমি। এত এত উকিল ব্যারিস্টার থাকতে ভাস্কর কেন?

এই পর্যন্ত বলে উমা থামে। পাদপূরণ করে প্রদীপ। বলে, বুঝেছি, এর জবাবে সুকোমল নিশ্চয় বলেন বইটির প্রকাশকের নাম, তাই না?

উমা হাসল। বললে, ঠিক তাই। তুমি তো জানই, অন্য একটা কারণে বাবা তোমার উপর খাপ্পা হয়ে ছিলেনই—

প্রদীপ ওকে শেষ করতে দেয় না। ভাস্করের কথা থেকে কথাপ্রসঙ্গে সে এবার নিজের প্রসঙ্গে চলে আসে। তার আর উমার। বুলস্ আই হিট করে বসে : কী কারণ উমা? আমি তো তোমাকে বাড়ি থেকে ফুসলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করিনি? আমি তো কখনও তোমার সঙ্গে কোন বেলেল্লাপনা করিনি, কুপ্রস্তাব করিনি? প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম—তুমি রাজী ছিলে বলেই। তাহলে? তাহলে তিনি এমনভাবে খাপ্পা হয়েছিলেন কেন?

উমার দৃষ্টি নত হল। যে কথাটা উঠবে না ভেবেছিল, পাকেচক্রে তাই উঠে পড়ল। কিন্তু কথা যখন উঠেছে তখন সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল। বললে, বড়দার কথা তো তুমি জানই। বাবা অন্য যুগের মানুষ—তাঁর ধ্যানধারণা অন্যরকম। বড়দা অসবর্ণ বিয়ে করেছে বলে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক উনি ত্যাগ করেছেন। বড়দার মানি-অর্ডার বারে বারে ফেরত গেছে—তখনও ছোড়দা চাকরি পায়নি, আর বাবার অসুখ চলছে তখন।

প্রদীপ বললে, অথচ পাত্র হিসাবে—কিছু মনে কর না উমা—এ কোন আত্মশ্লাঘা নয়, আমি এমন কিছু খারাপ নই।

: আমি তাই বলেছি? আমার মত কালো মেয়েকে কেন যে তুমি—

: থাক উমা। একটা কথা বলবে? তোমার বাবার ঐ দৃষ্টিভঙ্গিকে তুমি শ্রদ্ধা কর?

: নিশ্চয় নয়।

: তাহলে কেন তুমি রুখে দাঁড়াতে পারছ না? কেন ফিরিয়ে দেবে আমাকে?

উমা জবাব দিতে পারল না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। প্রদীপ আলতো করে ওর হাতের ওপর হাতটা রাখল। বলল, ঠিক এই পরিবেশে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব তা আধঘণ্টা আগেও আমি জানতাম না। তবু করছি—এমন সুযোগ আর হয়তো কোনদিন পাব না বলে। আমার প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে যাও আজ।

উমা হাতটা টেনে নিল না। নিচু মুখ তুলল। প্রদীপের চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল, হয়তো এক সপ্তাহ আগে আমাকে ডাক দিলে আমি সব কিছু ছেড়ে তোমার সঙ্গে ভেসে পড়তাম ; কিন্তু আজ আর তা হবার নয়।

প্রদীপ নিজের হাতটা টেনে নেয়। বলে, কেন? যেহেতু আমি এই বিশ্রী মামলাটায়

জড়িয়ে পড়েছি? যেহেতু আমি বাবার সম্পত্তি থেকে—

: ছি প্রদীপদা! এসব কী বলছ তুমি? আমি—আমি তোমাকে যে ভালবেসেছিলাম সে কি তুমি ঐ অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে?

: না তা নয়। তবে কেন আজ তুমি তোমার বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পার না? বাধাটা কোথায়?

: বুঝতে পারছ না? ছোড়দা।

: ছোড়দা? মানে? সে তো আমাদের বিবাহে সম্মত—সে তো আগ্রহী।

: ছোড়দা—তুমি তো জানই—একটি মেয়েকে ভালবেসেছে। সে কায়স্থ, বিধবা, একটি সন্তানের জননী। এতবড় আঘাত বাবা-মা সইতে পারবেন না। হয়তো তখন কোন চাকরি-বাকরি ধরে আমাকেই ঐ সংসারের বোঝাটা টেনে চলতে হবে।

প্রদীপ জবাব খুঁজে পায় না। দুজনেই নিশ্চুপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর প্রদীপ বলে, উমা, তোমার ছোড়দার সঙ্গে সব কথা খোলাখুলি আলোচনা করব?

: না। একজনকে বঞ্চিত হতে হবেই। হয় ছোড়দা, নয় আমি। না হলে ঐ বুড়োবুড়িকে কে দেখবে বল? আমি ছোড়দার পথে কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি নিশ্চয় একদিন আমাকে ভুলে যেতে পারবে, বিয়ে করবে, সুখী হবে।

: আর তুমি?

: আমি একটা চাকরি-বাকরি ধরবার চেষ্টা করব। যতদিন বাবা-মা আছেন, তার পরের কথা অনেক দূরের কথা—

: আমিও যদি অপেক্ষা করে থাকি?

: পাগলামি কর না প্রদীপদা। আমাদের সংসারের জটিলতার জন্য তুমি কেন খামকা নিজেকে বঞ্চিত করবে? তাছাড়া—

: একটা কথা বল। তোমার সঙ্গে আমার যে এইসব কথা হয়েছে তা কি তুমি ভাস্করকে বলবে?

: না। আজ আমি তোমাদের অফিসে আদৌ আসতে পারিনি—এই কথাই ছোড়দাকে বলব, তুমিও তাই বল। না হলে সে তোমাকে আমাকে প্রশ্ন করে করে জেরবার করে দেবে।

প্রদীপ কি একটা কথা বলতে গেল। তার আগেই বেজে উঠল টেলিফোনটা। তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো?

: তুই এখনও বসে আছিস? শোন প্রদীপ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক করে বল...

: কী কথা?

: আমি যখন তোর ডিফেন্স কাউন্সেল তখন আমার উচিত সব সময়ে তোর স্বার্থ দেখা, মক্কেলের স্বার্থ দেখা, তাই নয়?

: নিঃসন্দেহে। একথা কেন?

: আমি এই ঘণ্টাখানেক আগে এমন একটা কাজ করেছি যা তোর স্বার্থের পরিপন্থী। সজ্ঞানে, জেনে শুনে—

: অন্যায় করেছিস! কাজটা কী?

: আমি যে কাজটা করেছি, তা না করলে এ মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে যে 'স্টার উইটনেস' সেই লোকটা সাক্ষী দিতে পারত না।

: বুঝলাম না। আর একটু খুলে বলবি?

: টেলিফোনে নয়। ভাল কথা, উমা এসেছিল?

: উমা? তোর বোন? এসেছিল কিনা?—প্রদীপ চোখ তুলে দেখল উমা কাচের চুড়ি-পরা হাতটি 'না'-এর ভঙ্গিতে নাড়ছে। প্রদীপ তার কথা শেষ করল, সারা সন্ধ্যাটা তো তারই ধ্যানে কাটল। পাষাণীর দয়া হল কই?

উমা মুখে আঁচল চাপা দিল।

ভাস্কর বললে, তাহলে এখন কী করবি? ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি যা।

: তাই যাই। গুড নাইট!

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে প্রদীপ বললে, কুইক! তোমার ছোড়দার আগে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। জেমস বণ্ড মার্কা ফিল্মে যেভাবে ড্রাইভ করে সেভাবেই ড্রাইভ করব। ওহো! গাড়ি তো নেই! ট্যাক্সি ধরতে হবে। এনি ওয়ে, তুমি আমার পাশে বসবে ডার্লিং।

: ডার্লিং! ও আবার কী ভাষা?

: আমি এখন প্রদীপ পাত্র নই। জেমস্ বণ্ড! কুইক!

উমার বাহুমূল ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় নির্গমনদ্বারের দিকে।

## সতের

আগামী কাল মামলাটার প্রাথমিক শুনানীর দিন।

নির্মল স্থির করেছে প্রাথমিক শুনানিতে সে দুটি মাত্র সাক্ষীকে হাজির করবে—ইন্সপেক্টর বিমান গুহ এবং সার্জেণ্ট মিস রমা দাস। প্রাইমা-ফেসি কেসটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ঐ দুজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। মামলাটা যে আইনত গ্রাহ্য এটুকু প্রমাণ করতে আর কোনও সাক্ষী-সাবুদ নিষ্প্রয়োজন। বিমান গুহ প্রমাণ করবে পুস্তক-বিক্রেতা বিজয় ভট্টাচার্য শনিবার সতেরই মে একটি পোস্টডেটেড ক্যাশমেমো কেটে উনিশ মে-র তারিখ দিয়ে একখানি বই মিস রমা দাসকে বিক্রয় করেছেন। বইটি অশ্লীলতার দায়ে চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ থাকার কথা। সেই চল্লিশ বছর উত্তীর্ণ হচ্ছে 19.5.75 তারিখে—অর্থাৎ ঐ অশ্লীল বইটা বিক্রয় করার আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে। প্রাইমা-ফেসি কেসের পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। সতেরই মে যে পোস্টডেটেড ক্যাশমেমো কাটা হয়েছিল তার অকাট্য প্রমাণ বিজয়বাবু ঐ শনিবার সতেরই গ্রেপ্তার হন, তাঁর তরফে জামিনে সতেরই আর্জি করা হয়, এবং আঠারই রবিবার সব সংবাদপত্রে সে-খবর প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়তঃ বইটি যে অশ্লীল তা বিজয়বাবু স্বকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—তাঁর মতে, 'বইটি রগরগে! রাতের ঘুম কেড়ে নেয়!'—তার মানে কী? এই অশ্লীল বইটি রাতারাতি বিক্রয় করবার যে পরিকল্পনা প্রকাশক করেছিলেন তার নথিপত্র নির্মল দাখিল করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে বুঝিয়ে দেবে এই 'অশ্লীল' বইটা রাতারাতি বাজারে ছড়িয়ে দেবার কী নারকীয় ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এটুকুই যথেষ্ট। কেসটা অনায়াসে সেশনে চলে যাবে।

তার মানে প্রাথমিক পর্যায়ে সব সাক্ষীকে হাজির করতে হবে না। নির্মল তার

কেসটা মনে মনে সাজিয়েছে। নোটও করেছে। সে প্রায় নিঃসন্দেহ—বিজয় ভট্চাযের কনভিক্‌শান হবেই এবং 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হবে। ওর তূণে সাক্ষীর তালিকায় যে কয়টি বাণ এ পর্যন্ত জমেছে তার প্রত্যেকটিই ব্রহ্মাস্ত্র।

এক নম্বর : আবদুল রেজ্জাক। সত্তর বছরের বৃদ্ধ। ঢাকায় মানুষ। কলকাতার আদালতে সাক্ষী দিতে এসেছে। তার জবানবন্দী গুরুত্বপূর্ণ হবে। সে বলেছে—অপ্রকাশ গুপ্তের আদ্যন্ত ইতিহাস তার জানা। অপ্রকাশ গুপ্তের বাপের নাম, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি সে জানে না বটে, তবে তার জীবন-ইতিহাস সে নির্ভুলভাবে শুনেছিল মৈনুল হক-এর কাছে। মৈনুল হক কে? সে ছিল তটিনী-বাঈজীর তবল্‌চি। ঐ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা মৈনুলই একদিন বেচতে এসেছিল আবদুলের কাছে। লেখকের পরিচয় দিতে মৈনুল বলেছিল—অপ্রকাশ ছিল তটিনীর একজন বাঁধা বাবু—বইটা তটিনীরই আত্মকাহিনী—লেখক অপ্রকাশ 1930 সালের জানুয়ারীতে মারা যায়। মৃত্যুর কারণ—পচা লিভার। অত্যন্ত মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত। তটিনী নামে গণিকাকেও আবদুল ঘনিষ্ঠভাবে চিনত। আজ না হয় আবদুল বৃদ্ধ হয়েছে—চল্লিশ বছর আগে সেও ছিল নও-জোয়ান। তটিনীর পাড়ায় তার যাতায়াত ছিল। বস্তুত ঐ তটিনীর ঘরে সে রাতও কাটিয়েছে ; যদিও তার সনির্বন্ধ অনুরোধ সে সব কথা যেন আদালতে না ওঠে। হাজার হোক, সে এখন ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনী নিয়ে ঘর করে। পাণ্ডুলিপিটা যখন আবদুলের হস্তগত হয় তার আগেই নাকি তটিনী ব্যবসায় গুটিয়ে ঐ সাগর-নাগরের হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। তটিনী আর ঢাকায় ফিরে আসেনি। কোথায় কী-ভাবে তার জীবনান্ত ঘটল তা আবদুল জানে না। মোট কথা, তটিনী ও অপ্রকাশ সম্বন্ধে আবদুল যে বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে তা থেকে অনায়াসে প্রমাণ করা যাবে—অপ্রকাশ গুপ্ত একজন অসৎ চরিত্রের লোক, পাঁড় মাতাল, বেশ্যাবাড়িতে পড়ে থাকত, 'সিরোসিস অব দ্য লিভার'-রোগে—অর্থাৎ অত্যধিক মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত করতে অকালে মারা যায়। এমন একজন মানুষ কী উদ্দেশ্যে অমন একখানা যৌন-উপন্যাস লিখতে পারে তা কি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে?

দ্বিতীয়তঃ ডক্টর সুবীর কর্মকার, এম. এ., পি. এইচ. ডি.—বাঙলা ভাষার অধ্যাপক। সরকারী কলেজের উচ্চপদস্থ একজন গেজেটেড অফিসার। তাঁর মতে বইটি চূড়ান্তভাবে অশ্লীল। সাহিত্যে শ্লীলতার যে সীমারেখা তা একাধিক স্থলে অতিক্রম করেছেন ঐ লেখক। অপ্রকাশ গুপ্তের ঐ একটি মাত্র রচনারই সন্ধান পাওয়া গেছে—ডক্টর কর্মকার সমসাময়িক মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও কখনও এ লেখকের কোনও রচনা, রসোত্তীর্ণ রচনা তো দূরঅস্ত্, দেখতে পাননি। অর্থাৎ অপ্রকাশ একজন সাহিত্যসেবী নন, তাঁর রচনার পিছনে কোনও দীর্ঘ সাধনার স্বাক্ষর নেই। ভুঁইফোড় এই লেখক একটি বটতলামার্কা রগ্‌রগে যৌন-উপন্যাস রচনা করেছিলেন সেই তাড়নায়—যে তাড়নায় শুয়োরে কর্দমপঙ্কে নেমে পড়ে।

তিন নম্বর সাক্ষী : বৃন্দাবন ধর। পোস্ট-গ্রাজুয়েট ডিগ্রি আছে ওনার। স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্সটিট্যুটের কর্মী ছিলেন। একটি অদ্ভুত রিসার্চ করছেন বর্তমানে। তাঁর গবেষণার বিষয় বাঙালী পাঠক-পাঠিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন। উনি হিসাব করে, অঙ্ক কষে বার করতে চান আজকের দিনে পাঠক-পাঠিকা কী চায় ; কী জাতীয় গ্রন্থের অভাব, কী জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশ সমাজের ক্ষতি করছে। সেই গবেষণা তিনি করছেন এক বিচিত্র পদ্ধতিতে।

একের পর এক তিনি কলকাতা এবং মফঃস্বলের গ্রন্থাগারে যাচ্ছেন, সভ্য-সভ্যার তালিকা ধরে নানান প্রশ্ন করছেন—অর্থাৎ পাঠকমনকে বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন। ঠিক যে পদ্ধতিতে 'ডেমোগ্রাফিক সার্ভে' করা হয়। বৃন্দাবনবাবুর ধারণা তাঁর গবেষণা থেকে তিনি বলতে পারবেন কোন একটি গ্রন্থের প্রতিক্রিয়া একজন 'গড় পাঠক'-এর উপর কী প্রতিক্রিয়া করবে। বিষয়টা নতুন। বৃন্দাবনবাবু সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়েছেন; কিন্তু নির্মল এখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করতে হবে—কী ভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁর সাক্ষ্যটা এ মামলায় কাজে লাগানো যায়।

চার নম্বর সাক্ষী : একজন স্বতঃপ্রণোদিতা মহিলা। কোথা থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তিনি নির্মলকে লিখেছেন—এ মামলায় তিনি বাদীপক্ষের হয়ে সাক্ষী দিতে চান। তাঁর একটি মাত্র উদ্দেশ্য—বইটি তাঁর কাছে অত্যন্ত অশ্লীল মনে হয়েছে। এর প্রচার বন্ধ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ভদ্রমহিলা বিধবা, একটি সন্তানের জননী ;—বেশ জোরালো ভাষায় চিঠিখানি লিখেছেন। চিঠির শেষে দিয়েছেন সুকান্তের লেখা একটি কবিতার উদ্ধৃতি :

"চলে যাবো—তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে, এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি,
নবজাতকের কাছে, এ আমার অঙ্গীকার।"

নির্মল স্বতঃই অভিভূত হয়ে পড়েছে চিঠিখানা পড়ে। আরও অভিভূত হয়েছে মহিলাকে দেখে : চিঠির জবাব না পেয়ে তিনি স্বয়ং এসেছিলেন ওর অফিসে। অপূর্ব সুন্দরী, বছর ত্রিশ বয়স—বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। শাদা শাড়ি, শাদা ব্লাউজ, শাদা ভ্যানিটি ব্যাগ—পবিত্রতার প্রতিমূর্তি! নির্মল এক কথায় স্বীকার করেছে তাঁকে তুলবে সাক্ষীর মঞ্চে। এমন একটি বিধবা মহিলা সমাজকে ক্লেদমুক্ত করতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন—এইটেই বিচারককে টলাবে। সুতরাং নির্মলের চার নম্বর সাক্ষীর নাম—মিসেস রেবা সেন।

পাঁচ নম্বর : স্টার উইটনেস। এখন আন্দাজের কথা নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যা ঘটতে পারে নয়, যা ঘটেছে। মনোহর কানোরিয়ার পুত্র—শ্রীমান সুখেন কানোরিয়া। বয়স উনিশ। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। লাজুক, মুখচোরা—যার কোন অপরাধপ্রবণতার পূর্ব ইতিহাস নেই। এমন একটি অল্পবয়সী ছাত্র ঘটনাক্রমে সংগ্রহ করেছে একখণ্ড 'সাগর-সঙ্গমে'। রাত জেগে পড়েছে। ফলশ্রুতি? ছেলেটি সেই দিন সন্ধ্যায় একটি কল-গার্ল-এর ব্যবস্থা মতো গিয়ে উঠেছে একটি হোটেলে—ফুর্তি করতে। সেখানে সে মেয়েটিকে উপভোগ করেছে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! মেয়েটির মৃত্যুর জন্য বেচারী দায়ী হয়ে পড়ল, যদিও আসল আপরাধী সুখেন কানোরিয়া নয়, ঐ ঘৃণিত বইখানা—'সাগর- সঙ্গমে'।

নির্মলের তালিকায় শেষ ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছেন ডক্টর আনন্দময় রায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনবিশারদ। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপণ্ডিত—যিনি আদর্শের জন্য জীবিকাকে ত্যাগ করেছিলেন একদিন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন যাঁর নখাগ্রে। তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করেছেন : 'সাগর-সঙ্গমে' অবসীন। তার প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত। অশ্লীলতার দায়ে বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। অবশ্য আনন্দময় একটি শর্ত করেছেন। আগে

প্রমাণ হওয়া দরকার---সুখেন কানোরিয়ার ঐ দুর্বুদ্ধি হওয়ার মূল প্রেরণা হচ্ছে ঐ নিষিদ্ধ বইখানা। সে শর্ত পূরণ করবে নির্মল। তাঁকে ডাকবার আগে সে সুখেনকে তুলবে সাক্ষীর মঞ্চে---তার সওয়াল করবে, ডিফেন্স কাউন্সেল তার ক্রশ-এগ্‌জামিনেশন শেষ করবে। তখন নির্মল আবার ওঁর দ্বারস্থ হবে। সুখেনের সাক্ষ্য তিনি শুনুন, বুঝে দেখুন। বস্তুতঃ সুখেন এ-কথা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলেছে। পুলিসের শেখানো বুলি নয়। তারপর কি আনন্দময় রাজী হবেন না?

হলে—ডিফেন্স কোথায় দাঁড়াবে?

## আঠার

পরদিন সকালে অফিসে ঢুকতেই ভাস্কর দেখল টেলিফোনটা বাজছে। সলিল বা প্রদীপ তখনও আসেনি। বেয়ারা দরজা খুলে সবে চেয়ারগুলো মুছছে। ব্রীফকেসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে ভাস্কর টেলিফোনটা তুলে নিলো : হ্যালো?

: মিস্টার ভাস্কর মুখার্জির সঙ্গে কথা বলতে পারি?—মহিলা কণ্ঠস্বর।

: ভাস্কর বলছি।

: ও। ভাস্করবাবু? নমস্কার। আমি—আমি অন্তরা বসু।

: নমস্কার। সুখেন ভাল আছে? রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

: হয়েছিল। ভাল আছে। শুনুন—কাল রাত্রে আপনাকে ডক্টর মৈত্রের চেম্বারে দেখতে পাব আশা করেছিলাম—কিন্তু শুনলাম, আমি পৌঁছোবার আগেই আপনি চলে গেছেন।

: আমার আর তো কিছু করণীয় ছিল না, অন্তরা দেবী।

: হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না—ঠিক জানি না। তবে আমার কিছু করণীয় ছিল, করণীয় আছে। আমি—মানে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। কখন, কোথায় আপনার সময় হবে?

: যখন যেখানে বলবেন। এখনই হতে পারে। এই অফিসে এখন আমি একা—

: না। আপনার অফিস নয়। আপনি কি সেই দোকানটায় চলে আসতে পারেন? সেই যেখানে দুটি 'টুটিফ্রুটি' আমরা সেদিন খাইনি?

: পারি। তবে দোকানে ঢুকে কথা বললে দোকানে কিছু খেতে হয়—

: জানি। আপনার আপত্তি না থাকলে আবার আমরা দুটি 'টুটিফ্রুটি'রই অর্ডার দেব—

: উত্তম প্রস্তাব। কতক্ষণের মধ্যে আপনি আসছেন?

: মিনি বাস পেলে আধঘণ্টা, না পেলে ট্যাক্সিতেই আসব।

: ঠিক আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি আমি।

আধঘণ্টা পরে 'কোয়ালিটি'র সামনে গাড়িটা পার্ক করে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রবেশ করে ভাস্কর দেখল, ঠিক সেই দিনের সেই টেবিলে বসে আছে অন্তরা। আশ্চর্য! ঠিক সেই দিনের পোশাকে। ভাস্কর এগিয়ে এসে হাত দুটি তুলে নমস্কার করে বলল, কিছু যদি না মনে করেন, অন্য কোনও টেবিলে গিয়ে বসলে হয় না? এ টেবিলটা অপয়া।

অন্তরা হাসি লুকিয়ে বললে, মোটেই নয়। এ টেবিলটা যে অপয়া নয় চারপায়া, এটা

প্রমাণ করব বলেই এখানে বসব আমরা। বসুন।

ভাস্কর ওর মুখোমুখি বসতেই অন্তরা বললে, প্রথমেই কাজের কথাটা সেরে নিই। কাল রাত্রে টেলিফোনে খবরটা পেয়ে এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আপনাকে কৃতজ্ঞতাটা পর্যন্ত জানানো হয়নি।

: কৃতজ্ঞতা কিসের অন্তরা দেবী? আমি যা করেছি তা মানুষমাত্রেই করবে।

: মানুষ মাত্রেই করে না। অন্তত উকিলমাত্রেই করে না। সুখেন এ মামলায় আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

: সেটাই সুখেনের একমাত্র পরিচয় নয়। সে মানুষ।

অন্তরা তার নিজের হাতের চুড়িগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নত নয়নে বললে, আগের দিন আমি আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম। পরে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি—বোধহয় আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করলেই আমি ভাল করব।

ভাস্কর কিছু বলবার আগেই বেয়ারা এসে দাঁড়ায়। অন্তরা তাকে বললে, দো টুটিফ্রুটি, পুরা গ্লাস।

লোকটা চলে যেতে ভাস্কর প্রশ্ন করে, সুখেন হঠাৎ এমন চরম পথ কেন বেছে নিয়েছিল তা আপনাকে বলেছে?

: না। সেটা আমি আন্দাজ করতে পারি। আপনিও নিশ্চয় পারছেন?

: আমি? না। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সে একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়েছে—কিন্তু সেটা তো সবই জানাজানি হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ ও কেন আত্মহত্যা করতে চাইল? নতুন কী ঘটল?

অন্তরা ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, ভাস্করবাবু, আপাতদৃষ্টিতে আপনি আর আমি বিপক্ষ শিবিরের লোক। অনেক কথা আপনি আমাকে বলতে পারেন না, অনেক কথা আমিও আপনাকে বলতে পারি না। তবে যেটুকু বলব, তা আমরা পরস্পরের কাছে সত্য কথাই বলব—এটা মেনে নেওয়া ভাল নয়?

: আমি রাজী। আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

: সুখেন যে ডক্টর মৈত্রের চিকিৎসায় ছিল তা আপনি কেমন করে জানলেন? ডাক্তারবাবু ওর কী চিকিৎসা করেছেন তাই বা জানলেন কেমন করে?

ভাস্কর অকপট সত্য ভাষণ করল, আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব—নিতান্ত ঘটনাচক্রে ; দ্বিতীয়টার জবাব—আমি জানি না সুখেনের রোগটা কী।

: কিন্তু সেদিন যে আপনি বললেন—

: সেদিন যে আপনি আমার সঙ্গে এক টেবিলে 'টুটিফ্রুটি' খেতে রাজী ছিলেন না।

: আই সী! সেদিন তাহলে মিথ্যা কথা বলেছিলেন?

ভাস্কর স্মিত হাসল। স্বীকার করল। বললে, এবার আমার প্রশ্ন, সুখেনের অসুখটা কী?

: সেটা আমি বলতে পারি না। বলব না।

: ঠিক আছে। একটা কথা অন্তত বলুন, সুখেনের পারিরারিক জীবনে কি জটিলতা আছে? মনোহর কানোরিয়া কি ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে সংসার চালান?

অন্তরা বললে, আপনার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছি, তাই বলে কি আমার উচিত হবে এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া? আমি ঐ পরিবারেরই একজন তো?

: সে কথা ঠিক। তবে কি জানেন, আমি ভাবছিলাম—ব্যাপারটা সতিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা উনিশ বছরের ছেলে কেন এভাবে আত্মহত্যা করতে চাইবে? এর পিছনে নিশ্চয় কিছু গুরুতর কারণ আছে। হয়তো সেই কারণটাই ওকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এর আগের বার ডরোথির কাছে যেতে?

: কারণটা যদি আপনি জানতে পারেন, তাহলে—মানে যদি প্রমাণ করতে পারেন যে ঐ বইটা নয়, অন্য কারণে সে অমন পাপ-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তাহলে কি সুখেনের অপরাধটা আইনের চোখে কমে যাবে?

: নিশ্চয়! সুখেনের মামলাটা যখন আদালতে উঠবে তখন যদি দেখানে যায় যে, সে ঐ বইটা পড়ে ক্ষণিক উন্মাদনায় এ কাজটা করেনি—তার শিক্ষায়, দীক্ষায়, তার জীবনাদর্শের মধ্যেই একটা ত্রুটি ঘটনাচক্রে ঢুকে পড়েছে, যার জন্য সুখেন দায়ী নয়—তাহলে নিশ্চয় বিচারক তাকে লঘুদণ্ড দেবেন!

: আপনি এটা আন্তরিক বিশ্বাস করেন?

: করি অন্তরা দেবী, ভেবে দেখুন—আমি যদি সত্যিই বিশ্বাস করতাম যে, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা পড়ে, তারই প্রভাবে সুখেন ঐ কাণ্ডটা করেছে তাহলে এ মামলায় আমি ডিফেন্স কাউন্সেল হতাম না। আমি নিজেই চাইতাম অমন একখানা বই-এর প্রচার বন্ধ হক! আমেরিকায় রথ ভার্সেস স্টেটের কেস-এ জাস্টিস কার্টিস্ বলেছিলেন, "A book might constitutionally be condemned as obscence only when there is a reasonsble and demonstratble cause to believe that a crime...has been commited...as the perceptible result of the publication and distribution of the writing in question". [যদি যুক্তিপূর্ণ এবং প্রমাণযোগ্য হেতু দেখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, কোন একটি গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারের জন্যই একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তবে আইনানুসারে সেই গ্রন্থটিকে 'অশ্লীল' বলে চিহ্নিত করা উচিত।] আমি জাস্টিস কার্টিসের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি এ কেস লড়ছি এই বিশ্বাসে যে, 'সাগর-সঙ্গমে' গ্রন্থপাঠে ক্ষণিক উন্মাদনায় সুখেন এ কাজ করেনি।

অন্তরা প্রশ্ন করে, কিন্তু একটা যৌন-উত্তেজক বই পড়ে কি কেউ এমন কাজ করতে পারে না?

: পারে। কিন্তু তার আগে বলুন আপনি কি পড়েছেন?

: পড়েছি।

: আপনার কি মনে হয়েছে? অত্যন্ত অশ্লীল?

অন্তরা অকপটে স্বীকার করে, আমার মনে হয়েছে, বইটা অপূর্ব!

এতটা আবার ভাস্কর আশা করেনি। বললে, তবেই দেখুন। বইটা আপনি পড়েছেন, আমি পড়েছি, পুলিস অফিসার যাঁরা মামলা লড়ছেন তাঁরাও পড়েছেন, বিজয় ভট্চায স্বীকার করেছেন যে তিনি পড়েছেন—কই আমরা তো কেউ কোন সামাজিক অপরাধ করতে ছুটিনি?

: আমরা কেউই উনিশ বছর বয়সের উঠতি ছোকরা নই!

: মানলাম। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য সমাজের যতখানি ক্ষতি করছে বলে আমরা মনে করি, আসলে অতটা ক্ষতি তারা সত্যই করছে

না। আমেরিকান বিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ্ ডঃ কিনযের উত্তর-সাধক এবং ইনসটিট্যুট অফ সেক্স রিসার্চের অধ্যক্ষ বলছেন, "There is not any evidence that pornography instigates anti-social activities." আসলে কি জানেন? অশ্লীল বই অনেকটা ঐ ডিনামাইটের প্যাকেটের মত, অন্য কোন সূত্র থেকে আগুনের স্পর্শ না পেলে তা কোন বিস্ফোরণ ঘটায় না। সেই আগুনটা আসতে পারে অর্থাভাব থেকে, বেকারিত্ব থেকে, ফ্রাস্ট্রেশান থেকে, বাল্যে ও কৈশোরে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহার থেকে।

অন্তরা বললে, তাই যদি হয় তবে ঐ ডিনামাইটের প্যাকেটটা যত্রতত্র ফেলে রাখারই বা কি দরকার? ও জাতের আগুন তো ঘরে ঘরে—

: আমি একমত। কিন্তু আগে প্রমাণ করুন 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা অশ্লীল ডিনামাইট! এই তো আমার সামনেই বসে আছেন একজন ভদ্রমহিলা—যাঁর মতে বইটা 'অপূর্ব'!

বেয়ারা এসে দুটি শীতল পানীয় নামিয়ে রাখে। অন্তরা একটা টেনে নেয়, একটা ঠেলে দেয়। দুজনে শুরু করে।

ভাস্কর বললে, মামলার কথা থাক। আপনার নিজের কথা বলুন। আজ তো আর আমরা পরস্পরের শত্রু নই।

অন্তরা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, আমার কথা? আমার কী কথা?

: আমি শুনেছি আপনার দিদি নাকি অপূর্ব সুন্দরী। আপনিও কিছু কম যান না! সে-ক্ষেত্রে আপনি কেন এভাবে রয়ে গেলেন কানোরিয়া পরিবারে?

অন্তরা বললে, আপনি একটু পার্সোনাল হয়ে পড়েছেন, মিঃ মুখার্জি। অবশ্য বন্ধুত্ব যখন স্বীকার করে নিয়েছি তখন এ প্রশ্নটা করতে পারেন আপনি। কী বলব জবাবে? ধরুন ঘটনাচক্রে। এ ছাড়া কি-ই বা হতে পারত? আপনি জানেন কিনা জানি না—আমরা মাত্র দুই বোন, ভাই নেই। বাবা মা গত হয়েছেন।

: বাপের সংসারে ফিরে যাবার কথা আমি বলিনি।

: বুঝেছি। কিন্তু সে বিষয়ে আপনার এত কৌতূহল হচ্ছে কেন বলুন তো?

: আমাদের বন্ধুত্বটা যখন যথেষ্ট গভীর নয়, তখন অন্য একটা কৈফিয়ত দিই—আপনি বলেছেন বইটা আপনার কাছে 'অশ্লীল' মনে হয়নি। আপনাকে আমি সাক্ষী হিসাবে সমন ধরাতে পারি। তাই আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড—

অন্তরা উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলি—

ভাস্কর হেসে ওঠে : ভয় নেই, সেটা যে অসম্ভব তা আমি জানি। বসুন।

অন্তরা তার নিজের কথা বলল। তার স্কুল-জীবনের কথা, কলেজ-জীবনের কথা। শেষে বললে, ভাস্করবাবু, আপনি সুখেনের প্রাণ দিয়েছেন। বিনিময়ে আমিও আপনার যৎকিঞ্চিৎ উপকারে লাগতে চাই। আপনি কি জানেন, কেন পুলিস ঐ বইখানা বাজেয়াপ্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে?

: না! কেন?

: এর পিছনে 'প্রাইম-মুভার' হচ্ছেন জীমূতবাহন বসু, এম. পি.। তাঁর আসল রাগ আপনার বন্ধু প্রদীপবাবুর বাবার উপর। সমস্ত কলকাঠি তিনিই নাড়ছেন।

চকিতে একটা পর্দা যেন সরে গেল ভাস্করের চোখের উপর থেকে।

অন্তরা তখনও বলে চলেছে, আপনার বিরুদ্ধে কে কে সাক্ষী দিতে আসছেন

জানেন?

: কিছু কিছু জানি।

অন্তরা এক নিশ্বাসে বলে গেল পূর্ণ তালিকা। সব কয়টি কথাই জানা ছিল ভাস্করের—একমাত্র বিধবা মহিলাটির কথা সে এই প্রথম শুনল। তার চমকটা লক্ষ্য করল অন্তরা। বললে, এবার আমি আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, মিস্টার মুখার্জী?

: করুন।

: রেবা সেনের নামটা শুনে আপনি চমকে উঠলেন কেন?

: মহিলাটি আমার পরিচিতা বলে।

: শুধু মাত্র 'পরিচিতা'?

: না। তার চেয়ে বেশি কিছু। তবে বর্তমানে তাঁর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

অন্তরা বললে, এই শেষ খবরটা আমার কাছে নতুন।

: তার আগের খবরগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?

: আপনি তো বলেননি ডক্টর মৈত্রের কাছে সুখেন চিকিৎসা করিয়েছিল এ খবর আপনি কোথায় পেলেন! আপনার জবাবটাই তাই ফিরিয়ে দিলাম—ধরুন : ঘটনাচক্রে। কিন্তু আর দেরি করা ঠিক নয়। আপনার কৌতূহল আপাতত চাপা থাক।

অন্তরা উঠে দাঁড়ায়।

ভাস্করও ওঠে। বলে, 'আপাতত চাপা থাক' মানে হচ্ছে ভবিষ্যতে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তাই নয়? তাহলে আবার কবে দেখা হচ্ছে?

: আমি তা 'মীন' করিনি।

: আমি তাই বুঝেছি।

: তাহলে ভুল বুঝেছেন—অন্তরা দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু তার চাহনি এবং চাপা হাসিই প্রমাণ দেয় ভাস্কর ভুল বোঝেনি আসলে।

কাচের দরজা খুলে ওরা দুজন বেরিয়ে যেতেই ও-প্রান্তের একজন ভদ্রলোক উঠে এলেন কাউন্টারে। ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। ও-প্রান্তে সাড়া জাগতেই বললেন, আপনার অ্যাজাম্পশান কারেক্ট! অন্তরা গোপনে ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করছে!—ইয়েস স্যার। এখনই আসছি আমি।

## উনিশ

নগর দেওয়ানী আদালতে শুরু হল এই ফৌজদারী মামলাটি। জেলা এবং সেশনস্ জজ রামকৃষ্ণ সেনশর্মার আদালতে। ইতিপূর্বে প্রাথমিক শুনানী হয়ে গেছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে। মামলা গ্রাহ্য হয়েছে এবং সেশনস্-এ বিচারার্থ প্রেরিত হয়েছে। বিজয় ভট্টাচার্য জামিনে খালাস ছিলেন। আজ উপস্থিত হয়েছেন কোর্টে।

ঠিক দশটার সময় আদালত বসল। জাস্টিস সেনশর্মা পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই সকলে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রামকৃষ্ণ আসন গ্রহণ করার পর প্রথামাফিক ঘোষিত হল যে আদালত শুরু হল। পেশকারবাবুর তালিকা অনুযায়ী, আজ

বৃহস্পতিবার প্রথম মামলাটি হচ্ছে স্টেট ভার্সেস বিজয় ভট্টাচার্যের। 292 ধারার।

বিচারকের মাথার ঠিক উপরেই একটি গোলাকার ঘড়ি। তার উপরে ঝুলছে জাতির জনকের একটি চিত্র—এক হাতে লাঠি, অপর হাতে বিচিত্র মুদ্রা। বিচারকের নিচে বসেছেন পেশকারবাবু, তাঁর পাশে শ্রুতিধর দুজন।

দর্শক সমাগম যথেষ্ট হয়েছে। 'সাগর-সঙ্গমে' বইটির বিষয়ে ইতিমধ্যে কাগজে প্রচুর বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই 'লেটার্স-টু-দ্য-এডিটার' ছাপা হচ্ছে—গ্রন্থটির পক্ষে এবং বিপক্ষে। অথচ কেউই জানে না, সে উপন্যাসে কী লেখা হয়েছিল চল্লিশ বছর আগে। অপ্রকাশ গুপ্তের নামটা চাউর হয়েছে—অনেকে খোঁজাখুঁজি করছে তাঁর গুপ্ত-ইতিহাস।

প্রথামাফিক বিচারক জেনে নিলেন বাদী এবং প্রতিবাদী পক্ষের কৌঁশলী প্রস্তুত কিনা। দু-পক্ষই ইতিপূর্বে ওকালতনামা পেশ করেছেন—দু-পক্ষই জানালেন তাঁরা প্রস্তুত। বিচারপতি বাদীপক্ষের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?

: ইয়েস, য়োর অনার, আপনার অনুমতি পেলেই—

নির্মল দৃঢ় পদক্ষেপে আদালতকক্ষের এ-পাশ থেকে ও-পাশে হেঁটে এগিয়ে গেল। নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে একবার সে আদালতকক্ষের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। এক পাশে প্রতিবাদী পক্ষে বসে আছে ভাস্কর মুখার্জি, সলিল লাহিড়ী ; ঠিক তার পিছনের বেঞ্চিতে দেখা যাচ্ছে পাবলিশার পাত্রের মাথা। ওর সহকারী বসে আছে এখন, একা, বাদীপক্ষের চিহ্নিত কোণাটায়। দর্শকদের অনেকগুলি আসন দখল করে আছেন যাঁদের নির্মল ভালভাবে চেনে—অজিত গুপ্ত, বিমান গুহ, মনোহর কানোরিয়া এবং তাঁর আইন-উপদেষ্টা ব্যারিস্টার শর্মা। বিজয় ভট্টাচার্যের দোকানের এবং বাড়ির কেউ কেউ এসেছেন। তার মধ্যে আছেন একমাথা সাদাচুল নবীন পতিতুণ্ডি। প্রকাশক প্রদীপবাবুর অফিস থেকেও অনেকে এসেছেন, তাঁদের চেনে না নির্মল। এ ছাড়া এসেছে সংবাদপত্রের লোক এবং সাধারণ মানুষ। আদালত লোকে পরিপূর্ণ—পিছনের দিকে অনেকে দাঁড়িয়েও আছে। নিঃসন্দেহে মামলাটির বিষয়ে দেশের লোক উদ্‌গ্রীব, আগ্রহী।

নির্মল নিয়োগী শুরু করে—আদালত যখন অনুমতি দিচ্ছেন তখন একটি প্রারম্ভিক ভাষণে আমি এই মামলাটির স্বরূপ সংক্ষেপে বিবৃত করব : মামলাটি কী, কেন, এবং কী কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মামলাটি যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার প্রমাণ প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সম্পাদককে লেখা চিঠিতে। এই আদালতকক্ষে আশাতিরিক্ত জনসমাগমেও তা বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ মামলাটি আপাতদৃষ্টিতে একজন নির্দিষ্ট অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই বটে তবে দেশ জাতি ও সমাজ নিয়ে যাঁরা চিন্তা ভাবনা করেন তাঁরা মনে করেছেন এই মামলায় পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে একটা বৃহত্তর প্রশ্ন—সাহিত্যে অশ্লীলতার সীমারেখা কোথায়, অভিযুক্ত গ্রন্থ সমাজের কতখানি ক্ষতিকারক, ইত্যাদি। এই পরোক্ষ বিষয়গুলি আপনা থেকেই হয়তো আলোচিত হবে—এবং মাননীয় বিচারকের শেষ রায় থেকে ভবিষ্যৎ যুগের সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারকেরা পথের সন্ধান পাবেন। আমাদের মূল লক্ষ্য অত বিস্তৃত নয়। আমরা, বাদীপক্ষের আমরা এখানে সমবেত হয়েছি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অপরাধের চার্জ নিয়ে। মেসার্স বি. এম. ভট্টাচার্য বুক সেলার্স-এর স্বত্বাধিকারী

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আমরা ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড-এর 292 ধারা মতে এই মামলা এনেছি। মাননীয় বিচারপতি এবং সহযোগী ডিফেন্স কাউন্সেল এই ধারাটির সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। তবু যেহেতু এই আদালতে আজ এমন একটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে যাতে দেশ ও জাতি তাদের ভবিষ্যৎ পথের নির্দেশ খুঁজতে চাইছে, যেহেতু এই মামলাটিতে সারা দেশের জনগণের মধ্যে সাড়া জেগেছে—তাঁরা জানতে চাইছেন অশ্লীলতার দায়ে কী জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশ বন্ধ হওয়া উচিত, তাই আমি ঐ ধারাটিকে একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার অনুমতি চাইছি।

নির্মল নিয়োগী বিচারকের দিকে ফিরে একটা 'বাও' করে। বিচারক রামকৃষ্ণ নির্বাক বসেই রইলেন। তাঁর মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে নির্মল শুরু করে : সেকশান 292 ধারায় বলা হচ্ছে, "যদি কোন ব্যক্তি নিজের কাছে কোন 'অবসীন' বই, ইস্তাহার, কাগজ, চিত্র বা কোন বস্তু রাখে যা 'অবসীন' এবং/কিম্বা সেই বস্তু বিক্রয় করে, ধার দেয়, প্রচার করে, সাধারণের চোখের সামনে মেলে রাখে অথবা কোনভাবে প্রচার করে···তাহলে সেই ব্যক্তি এই ধারা মতে দণ্ডনীয়, দণ্ডকাল তিন মাস পর্যন্ত জেল অথবা জরিমানা, অথবা উভয়েই হতে পারে।" এখানে লক্ষণীয় 'অবসীন' শব্দটার কোন সংজ্ঞা বা ডেফিনিশন দেওয়া হয়নি। 'অবসীন' অর্থে 'অশ্লীল' ; কিন্তু তার সংজ্ঞা কি? রাজশেখর বসু মশাই তাঁর অভিধানে 'অশ্লীল' অর্থে বুঝেছেন—'লজ্জাপ্রদ, কামবিষয়ক, কুৎসিত, জঘন্য, কুরুচিসম্পন্ন, indecent, obscene,' ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড এই 'অবসীন' শব্দটি ইংলণ্ডের আইন থেকে গ্রহণ করেছে। সংজ্ঞা নিরূপণ না করলেও ইংলিশ কোর্টে তার ব্যাখ্যা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যাই বারে বারে ভারতীয় আদালতে গৃহীত হয়েছে। রঞ্জিত উদেশী বনাম মহারাষ্ট্র কেস-এ জাস্টিস হিদায়াতুল্লাহ্ সেই ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছেন ; জাস্টিস মুখার্জি সম্প্রতি মেনে নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ-এর মামলায়। সুতরাং ইংরাজ আদালতে এই অশ্লীলতার ধারণাটা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা আমরা বিচার করে দেখতে পারি। প্রায় তিনশ বছর আগে স্যার চার্লস সেডলে একটি আসবাগারের ব্যালকনিতে মত্তাবস্থায় উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে একটি মামলা আনা হয়। বলা হয়, এ কাজটা 'অবসীন' অর্থাৎ 'অশ্লীল'। গ্রন্থকে অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করা এবং লেখককে শাস্তি দেবার অধিকার সে আমলে ছিল চার্চের। 1708 সালে কুইন ভার্সেস রীড-এর কেস বোধ করি প্রথম উদাহরণ ; 1857 সালে লর্ড কাম্বেল সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আইন প্রবর্তন করায় সচেষ্ট হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী চীফ জাস্টিস 'হিক্‌লিন্স-কেস'-এ যে রায় দেন তাই আমাদের দিক্‌দর্শন যন্ত্র। বিচারপতি ককবার্ন অশ্লীলতার বা অবসীনিটির সংজ্ঞা না দিলেও তার একটি ব্যাখ্যা দেন—যা আবহমানকাল এ-জাতীয় বিচারের মূল খুঁটি। জাস্টিস ককর্বান বলছেন, "আমার বিশ্বাস 'অবসীনিটী'র অস্তিত্ব এভাবেই প্রমাণিত হবে, দেখতে হবে অভিযুক্ত গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক—যাদের হাতে বইটি পৌঁছাবার সম্ভাবনা এবং যারা খোলা মন নিয়ে সেটি পড়বে—সেই পাঠক গ্রন্থপাঠের ফলে কতটা কলুষিত হয়ে পড়েছে—দেখতে হবে নারী ও পুরুষ, অল্পবয়সী এবং পরিণতবয়স্ক পাঠক বইটা পড়ার ফলে কতটা অসৎ চিন্তাধারায়, কুৎসিত ভাবনায় আক্রান্ত হচ্ছে।"

ভাস্করের মনে হল, নির্মল নিয়োগী তার প্রারম্ভিক ভাষণে প্রচলিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাচ্ছে : কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করল না।

নির্মল বলে চলে, আলোচ্য মামলায় আমরা বি. এম. ভট্টাচার্যের স্বত্বাধিকারী শ্রীবিজয় ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত করছি এইজন্য যে, গত সতেরই মে, শনিবার তিনি অপ্রকাশ গুপ্ত লিখিত 'সাগর-সঙ্গমে' নামে একটি বাজেয়াপ্ত অশ্লীল বা 'অবসীন' পুস্তক মিস রমা দাশকে বিক্রয় করেছেন। আসামী শ্রীভট্টাচার্য জানতেন যে, ঐ গ্রন্থটি অশ্লীলতার দায়ে চল্লিশ বছর আগে জাস্টিস্ জনসন বাজেয়াপ্ত করেছিলেন চল্লিশ বছরের জন্য। সেই চল্লিশ বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হবার কথা এ বছর আঠারই মে, রবিবার। শ্রীভট্টাচার্য যে এ কথা জানতেন তা আমরা প্রমাণ করব। সুতরাং আমরা দেখাব যে, আসামী শ্রীভট্টাচার্য সজ্ঞানে একটি বাজেয়াপ্ত অশ্লীল বই একজন অবিবাহিতা মহিলাকে বিক্রয় করে 292 ধারামতে অপরাধী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঐ সতেরই তারিখ শনিবার একটি পোস্টডেটেড ক্যাশমেমো কেটে—

: অবজেকশান য়োর অনার!—ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। বলে, সহযোগী তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে অবান্তর কথা বলছেন—292 ধারা মতে ক্যাশমেমোর তারিখ ইররেলিভ্যান্ট অ্যাণ্ড ইম্মেটিরিয়াল।

জাস্টিস সেনশর্মা বলেন, অবজেকশান সাসটেইনড!

নির্মল একবার অজিত গুপ্তের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে জানত, এ জাতীয় আপত্তি উঠবেই। নির্মল এইজন্য বিজয় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি ধারামতে অভিযোগ পেশ করতে চেয়েছিল; কিন্তু অজিত গুপ্তই রাজী হননি। হননি, বস্তুত জীমূতবাহনের পরামর্শে। জীমূতবাহন চাননি মামলাটা ডালপালা ছড়িয়ে যাক্—বিজয় ভট্টাচার্যকে জেল-জরিমানার আওতায় আনা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ফলে নির্মল নিয়োগীকে অন্য পথ ধরতে হল। সে আবার শুরু করে, প্রারম্ভিক ভাষণ অনেকটা গ্রন্থের সূচীপত্র লেখার মতো, অর্থাৎ আমার দায়িত্ব এই প্রারম্ভিক ভাষণে গোটা মামলাটার একটা আউট-লাইন টেনে দেওয়া—আমরা কী প্রমাণ করতে চাই তা আমি বলেছি, সংক্ষেপে সেটা এই—আমরা তিনটি তথ্য প্রমাণ করব। এক নম্বর : আসামী শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য একটি বাজেয়াপ্ত 'অশ্লীল' বই বিক্রি করেছিলেন। দু নম্বর : আইনের ভাষায় যাকে বলে 'scienter' অর্থাৎ জ্ঞাতসারে কৃত অপরাধ। আসামী যে সজ্ঞানে অপরাধ করেছেন এটা প্রমাণ করতে আমরা এই আদালতে কিছু টেপ-রেকর্ড দাখিল করব। তিন নম্বর : অভিযুক্ত গ্রন্থটি, অর্থাৎ অপ্রকাশ গুপ্ত লিখিত 'সাগর-সঙ্গমে' একটি অতি অশ্লীল পুস্তক, যৌনবিকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বাজার মাৎ করা ছাড়া এ-গ্রন্থের আর কোন ভূমিকা নেই। এ তথ্য সন্দেহাতীতরূপে আমরা প্রমাণ করবে যে, বইটি শুধু বিদ্বান পণ্ডিত নয় সাধারণ গড় পাঠকের কাছেও একই রকম অশ্লীল, একই রকম পরিত্যাজ্য মনে হয়েছে। আমরা আরও প্রমাণ করব প্রকাশক ত্রিশ হাজার বই ছেপেছেন এবং প্রকাশিত হবার পূর্বের সেই ত্রিশ হাজার বই বিক্রয় করেছেন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে লেখক এবং প্রকাশকের মূল উদ্দেশ্যটা কী ছিল। ভাল বই অসংখ্য লিখিত হচ্ছে, কিন্তু সে-সব বই বাজারে কাটে না, পোকায় কাটে! এই বইয়ের এত চাহিদা হল কেন? প্রসঙ্গত আমি জাস্টিস মূর-এর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ডি. এইচ. লরেন্স লিখিত 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' গ্রন্থের মামলায় জাস্টিস লিওনার্ড পি. মূর বলছেন, "As to prurient interest, one can scarcely be so naive as to believe the avalanche of sales came about as the result of a sudden desire on the part

of the American public to become acquainted with the problems of a professional gamekeeper in the management of an English estate." [এই দেশে ঐ বইটির অবিশ্বাস্য বিক্রির হিসাব দেখে নিশ্চয় কোন সরলচিত্ত ব্যক্তি বললেন না যে, আমেরিকার সাধারণ মানুষ রাতারাতি দুরন্ত কৌতূহলে জানতে চাইছিল একটি ইংরাজ জমিদারের বাগানবাড়িতে মালীকে কী জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।] 'সাগর-সঙ্গমে'র এই অবিশ্ব্যাস্য বিক্রির হিসাব দেখেও নিশ্চয় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসব না যে, বাঙলাদেশের পাঠক রাতারাতি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে জানতে ঢাকা নগরীর একটি গণিকার জীবনে কী জাতীয় সমস্যা সে-আমলে দেখা দিত! প্রকাশমাত্রেই বইটি বাজেয়াপ্ত হবে এ কথা প্রকাশক জানতেন—সে-জন্যই বিক্রয়ের এই অপূর্ব অগ্রিম বন্টন-ব্যবস্থা। এ মামলার মূল উদ্দেশ্য সেই নৈতিক পাপ, এবং সামাজিক অপরাধটাকে রোখা। ঐ তথ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা যে সাক্ষ্য গ্রহণ করব তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দলের সাক্ষীরা মৃত লেখক অপ্রকাশ গুপ্তকে প্রকাশ করবেন—তাঁর পশ্চাৎপটটি উদ্ঘাটিত করে দেখাবেন লেখক কী জাতের মানুষ ছিলেন, লেখকের শিক্ষা-দীক্ষা-চাল-চলন জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরে তাঁরা প্রমাণ করবেন লেখকের পক্ষে সমাজের হিতকর কোন গ্রন্থ রচনার কোনও ক্ষমতাই ছিল না, থাকতে পারে না। লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য 'অশ্লীল' একটি উপন্যাস লিখে অর্থ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় পর্যায়ের সাক্ষীদল বাঙলা-ভাষায় পণ্ডিত—তাঁরা 'অ্যাকাডেমিক' আলোচনা করে দেখাবেন লেখকের পরিচয়-নিরপেক্ষ শুধুমাত্র ঐ গ্রন্থটি অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। তৃতীয় জাতের সাক্ষীদল দেখাবেন—সাধারণ পাঠক, জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত নয়—'অ্যাভারেজ পাঠক' এ উপন্যাসটিকে কী চোখে দেখেছে। মনে রাখা দরকার যে, বইটির প্রতিক্রিয়া ঐ 'গড়-পাঠক' বা সাধারণ খোলা-মন পাঠকের উপর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তাই আমাদের চরম বিচার্য বিষয়—আইনের তাই নির্দেশ। প্রসঙ্গত আমি আমেরিকান আইনের 311 ধারাটি উদ্ধৃতি করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি—"Obscene means that to the average person, applying contemporary standards, the predominant appeal of the matter taken as a whole, is to prurient interst in a shameful or morbid interest in nudity, sex or excretion, which goes substantially beyond customary limits of candour in description or representation of such matters and in matter which in utterly without redeeming social importance." [সমসাময়িক ধ্যানধারণায় পুষ্ট একজন 'সাধারণ-পাঠক' বা 'গড়-পাঠক' যদি কোন বস্তুর (গ্রন্থের) সামগ্রিক বিচারে মনে করে যে সেটা অসৎ অথবা কুৎসিত চিন্তার উদ্রেক করছে তাহলে সেই বস্তুকে (বা গ্রন্থকে) 'অব্‌সীন' বলে চিহ্নিত করতে হবে। অসৎ বা কুৎসিত চিন্তা বলতে নগ্নতা, যৌন ক্রিয়াকলাপ, মলমূত্রত্যাগ ইত্যাদি ন্যক্কারজনক চিত্র যদি এভাবে বর্ণিত হয় বা উপস্থাপিত করা হয় যাতে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে তাহলেই সেটি অশ্লীল—বিশেষ, সে গ্রন্থে সমাজ-সংস্কারের কোন উপাদান যদি না থাকে।]

আমরা বাদীপক্ষ থেকে নিঃসন্দেহ যে, আমরা প্রমাণ করব 'সাগর-সঙ্গমে' ঐ জাতের একটি ন্যক্কারজনক অশ্লীল গ্রন্থ, যাতে নগ্নতা এবং যৌন ক্রিয়াকলাপ শালীনতার মাত্রা লঙ্ঘন করেছে, এবং সমাজ-সংস্কারের কোন চিন্তাই লেখকের ছিল না। ধন্যবাদ।

দীর্ঘ ভাষণ অন্তে বাদীপক্ষের কৌঁসিলী নির্মল নিয়োগী নিজ আসনে ফিরে এলে বিচারক প্রশ্ন করলেন, প্রতিবাদী কি এবার তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?

ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। সে লক্ষ্য করেছে, প্রারম্ভিক ভাষণে নির্মল নিয়োগী একথা বলেনি যে, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি পাঠে একটি কিশোর মনে কী জাতীয় প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা সে দেখাবে। অর্থাৎ সুখেন কানোরিয়ার উল্লেখ সূচীপত্রের তালিকায় নেই। তার মানে এ নয় যে, সুখেন কানোরিয়ার সাক্ষ্য বাদী পক্ষ দাখিল করবে না ; বরং তার মানে এই যে, প্রতিবাদী পক্ষকে আগে থেকে সতর্ক হবার সুযোগ নির্মল দিতে চায় না।

ভাস্করও একবার আদালত-কক্ষের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল। নির্মল যাদের দেখছিল তাদের ছাড়াও ও দেখতে পেল—উমাকে, অন্তরাকে, প্রকাশ করকে। সুরেশ প্যাটেলকে সে খুঁজে পেল না কিন্তু।

: মাননীয় আদালতের অনুমতি নিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ পেশ করছি। সুপণ্ডিত সহযোগী বলেছেন বাদীপক্ষ তিনটি তথ্য প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর দুই-তৃতীয়াংশ পরিশ্রম আমি এই প্রারম্ভিক ভাষণেই লাঘব করে দিচ্ছি। তাঁর প্রথম বক্তব্য—তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন, গত সতেরই মে আসামী একখণ্ড 'সাগর-সঙ্গমে' বই বিক্রয় করেছেন। এটা তাঁকে কষ্ট করে প্রমাণ করতে হবে না। আমরা, প্রতিবাদী পক্ষ থেকে এ তথ্যটি মেনে নিচ্ছি। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন যে, প্রমাণ করবেন—বিজয়বাবু সজ্ঞানে ঐ বইটি 'অশ্লীল' জেনেও বিক্রয় করেছেন। এবারও আমি বলব সে প্রশ্ন তাঁর তৃতীয় প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—অর্থাৎ আগে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে বর্তমান বৎসরে ঐ 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। বইটি যদি আদৌ অশ্লীলই না হয় সে ক্ষেত্রে বিজয়বাবুর সজ্ঞানকৃত অথবা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধই টেকে না। ফলে, আমরা মনে করি এ মামলায় একটিমাত্র বিচার্য বিষয় : অপ্রকাশ গুপ্ত লিখিত 'সাগর-সঙ্গমে' গ্রন্থটি কি আজকের প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় 'অশ্লীল'? আবার সেই মূল প্রশ্নটিই উঠে পড়ল—'অশ্লীল' বা 'অবসীন' কী? মাননীয় সহযোগী তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও 'অবসীনিটি'র কোনও সংজ্ঞা দিতে পারেননি। ব্যাখ্যা দিয়েছেন, উদাহরণ দিয়েছেন, কিন্তু সংজ্ঞা নয়। বস্তুত আইন-জগতে কেউ, কোথাও, কোন পণ্ডিত সে সংজ্ঞা দিতে পারেননি। কেন পারেননি? কারণ দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সেটা কোন ধ্রুবসত্য নয়। তা রিলেটিভ—আপেক্ষিক। তার ধ্রুব-সংজ্ঞা হয় না। মাননীয় সহযোগী অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন। আমিও দিচ্ছি—

ভ্যাটিকানের পোপ একসময় বিচার করে রায় দিয়েছিলেন মিকেলাঞ্জেলোর আঁকা 'বিশ্ববিশ্রুত' প্রাচীরচিত্র 'লাস্ট জাজমেণ্ট' বা 'শেষ-বিচার' অবসীন বা অশ্লীল। কেন? নগ্নতা দোষে। সে চিত্রে অসংখ্য চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। পোপ আদেশ দিলেন মিকেলাঞ্জেলোর ফিগরগুলিকে কাপড় জামা পরাতে হবে। বিশ্বশিল্পের সৌভাগ্য তাঁর সে আদেশ পালিত হয়নি। হলে আইনের মর্যাদা কতটা রক্ষিত হত, সমাজের কী উপকার হত জানি না—বিশ্ব-শিল্প একটি অপূর্ব সম্পদ হারাতো। মিকেলাঞ্জেলোর দ্বিতীয়বার মৃত্যু হত। ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে একজন সর্বভারতীয় জননেতা একবার সক্ষোভে বলেছিলেন—কোনার্ক এবং খাজুরাহোর মিথুন-মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলা উচিত। শিল্পগুরু নন্দলাল সে-কথা শুনে বলেছিলেন—"অত্যন্ত সংঘাতিক প্রস্তাব। এগুলি গেলে শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই চলে যায়। নিশ্চয় করে

বলতে পারিনে, পুরী ও কোনারকের ভাস্কর শিল্পী কেন এমন বিষয় নির্বাচন করেছিল। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। মানুষের জীবনে যে নবরসের লীলা এটি তার অন্যতম রস—আদিরস। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রসসৃষ্টি হিসাবে উক্ত মূর্তিগুলি খুবই উচ্চশ্রেণীর।"

আপনাদের প্রমাণ করে দিতে চাই—আজ যেমন এই আদালতে অপ্রকাশ গুপ্তের বিচার হচ্ছে তেমনি একদিন একটি আদালতে বিচার হয়েছিল সমাজসেবিকা প্রাতঃস্মরণীয়া অ্যানি বেসান্তের। কী অপরাধে? অ্যানি বেসান্ত বলেছিলেন—যারা সন্তান চায় না, অথচ স্বামীস্ত্রীর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায় তাদের পক্ষে জন্মনিরোধ করায় পাপ নেই। এই অপরাধে অ্যানি বেসান্তের শাস্তি হয়েছিল! আজ এই আদালতের বাইরে, প্রবেশদ্বারে ভারত-সরকারের 'লাল ত্রিকোণ'-আঁকা প্রচার চিত্রটি আপনারা দেখতে পাবেন। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর আগে, অর্থাৎ সাগর-সঙ্গমে বইটির প্রথম প্রকাশের তিন বছর পরে আমেরিকায় 'লাইফ' ম্যাগাজিনের বিরুদ্ধে ঠিক এই জাতীয় মামলা আনা হয়েছিল—অশ্লীলতার দায়ে লাইফ ম্যাগাজিনের ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করতে সেই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল যা এইমাত্র আপনারা আমার সুপণ্ডিত সহযোগীর মুখে শুনলেন। 'লাইফ' পত্রিকার অপরাধ? 'বার্থ অব এ বেবি' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ। যেটা 'অপরাধ' বলে মনে করাই আজ হাস্যকর।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। একথা সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট যে, কোন একটি গ্রন্থকে 'অশ্লীল' বলে ঘোষণা করবার আগে দেখতে হবে, সেটা দেশকালের প্রচলিত ধ্যানধারণায় গ্রহণযোগ্য কিনা। চল্লিশ বছর আগে এই সাগর-সঙ্গমে বইটিকে জাস্টিস জনসন কেন সর্বকালের জন্য বাজেয়াপ্ত করলেন না এটা ভেবে দেখার কথা। এমন অদ্ভুত নজীর কেন সৃষ্টি করেছিলেন সেই আইনজ্ঞ পণ্ডিত বিচারক? কারণ তিনি জানতেন, চল্লিশ বছরে দেশ অনেক-অনেকটা এগিয়ে যাবে। তখন এ গ্রন্থের অন্তর্নিহিত মানবিক সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে পাঠক। তাঁর সেই ধারণা যে সত্য তা আমরা প্রমাণ করব। মিকেলাঞ্জেলোর নগ্নচিত্রের মত, অ্যানি বেসান্তের জন্মনিরোধের পরামর্শের মত লাইফ ম্যাগাজিনের শিশুজন্মের তথ্য প্রকাশ করার মত অপ্রকাশ গুপ্তের জীবনসত্যকেও আজ আমরা গ্রহণ করব। এ মামলার প্রতিবাদী বস্তুত শ্রী বিজয় ভট্টাচার্য নন, প্রতিবাদী স্বর্গত ঔপন্যাসিক অপ্রকাশ গুপ্ত, যিনি জীবনে জীবন যোগ করে এক জীবন-সত্যকে বুঝেছিলেন, বুঝিয়েছেন। এ মামলার প্রতিবাদী এই মহান উপদ্বীপের প্রতিটি স্বাধীন নাগরিক যাদের ভারতীয় সংবিধান উনিশ নম্বর ধারায় বাক-স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে। বিজয়বাবুর দুর্ভাগ্য যে, তাঁর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ এ মামলা এনেছেন। তবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফিলাডেলফিয়ার এক পুস্তক-বিক্রেতার বিরুদ্ধে অনুরূপ মামলা আনার পর মার্কিন দার্শনিক এবং চিন্তানায়ক টমাস জেফারসন তাঁকে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন "I am really mortified to be told that in the United States of America a question about a book can be carried before the civil magistrate." [আমি শুনে মর্মাহত হলাম যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গ্রন্থের ভালমন্দ বিচারের দায় শেষ পর্যন্ত দেওয়ানী মামলার বিচারকের উপর বর্তালো।]

নির্মল নিয়োগী উঠে দাঁড়ায় : অবজেকশন য়োর অনার! সহযোগী এ আদালতের

এক্তিয়ারটাকেই চ্যালেঞ্জ করছেন!

বিচারক হাসলেন। বললেন, না। উনি টমাস জেফারসনের একটি উদ্ধৃতি শুনিয়েছেন মাত্র। য়ু মে প্রসীড।

ভাস্কর শুরু করে। আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্যের কথা বলেছি। আমরা এ কথাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যে, সাগর-সঙ্গমে একটি কালজয়ী সাহিত্যকীর্তি। সেটা আমরা কীভাবে প্রমাণ করব তা আপনারা এই আদালতেই দেখতে পাবেন। উপসংহারে আমি শুধু একটি কথা বলব। এটাও আমার কথা নয়, মার্কিন মুলুকের একজন প্রধান বিচারপতির উদ্ধৃতি। জাস্টিস ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফুর্টার এ জাতীয় আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলছেন : "The State insists that, by this quarantining the general reading public against books not too rugged for grown men and women in order to shield juvenile innocence, it is exercising its power to promote general welfare. Surely, this is to burn the house to roast the pig." [প্রস্তাবিত আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র চাইছেন অপ্রাপ্তবয়স্কদের রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর চোখের সামনে থেকে এমন সব বই লুকিয়ে ফেলতে যা হয়তো তাদের কাছে খুব কিছু উপলবন্ধুর নয়। এ প্রচেষ্টা যেন মাংসটাকে সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গোটা বাড়িটায় আগুন ধরানো।] উপসংহারে ঐটুকুই আমার বক্তব্য—মাননীয় সহযোগী অপ্রাপ্তবয়স্ক কতিপয় অর্বাচীন পাঠককে রক্ষা করতে সমগ্র দেশের বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন না। তিনি মাংস রাঁধতে চান রাঁধুন—কিন্তু গোটা বাড়িটায় তাঁকে আমরা আগুন ধরাতে দেব না।

ভাস্কর ফিরে আসে নিজের আসনে। প্রদীপ ওর হাতটা ধরে। নিম্নকণ্ঠে বলে, চমৎকার! দারুণ বলেছিস মাইরি!

বিচারক পেন্সিলে কি যেন নোট করছিলেন। এবার মুখ তুলে নির্মলকে বললেন, আপনার প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

যথারীতি শপথ গ্রহণ করে সাক্ষী মঞ্চে উঠে দাঁড়াল বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী ইন্সপেক্টর বিমান গুহ। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিমান গুহ চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হল, তারপর সে সেই সতেরই মে, শনিবারের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে গেল। প্রতিবাদীর অনুমতি সাপেক্ষে টেপ-রেকর্ডটা বাজিয়ে শোনানো হল এবং সেটাকে পিপলস্ এক্সিবিট রূপে চিহ্নিত করা হল। নির্মল নিয়োগীর সওয়াল শেষ হলে ভাস্কর তাকে ক্রশ করতে উঠল।

: ইন্সপেক্টর গুহ, আপনি আসামীকে বলেছিলেন যে, আপনি টান্জানিয়াতে চাকরি করেন এবং রবিবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবেন?

: বলেছিলাম।

: তার মানে আপনি মিথ্যাভাষণ করেছিলেন। স্বীকার করছেন?

: আমার উদ্দেশ্য ছিল—

: আনসার মাই কোশ্চেন—আপনি মিথ্যাভাষণ করেছিলেন! স্বীকার করছেন?

: করছি।

: এবং সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ—যাকে আইনের ভাষায় বলে scientilly?

সাক্ষী ইতস্তত করে স্বীকার করল : হ্যাঁ।

: তার মানে আপনার মতে উদ্দেশ্য মহৎ হলে সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ অন্যায় নয়?

নির্মল উঠে দাঁড়ায় : অবজেকশান য়োর অনার। আর্গুমেন্টেটিভ!

: অবজেকশান সাসটেইণ্ড।

ভাস্কর বলে, তার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

বাদীপক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী মহিলা পুলিস-সার্জেণ্ট মিস রমা দাশ। সেও তার সাক্ষ্যে শনিবার সতেরই মে পুস্তক-বিপণীতে তার দেখা এবং শোনা সব কিছুই সবিস্তারে বর্ণনা করল। এবার নির্মল ভাস্করকে সুযোগ দেবে না বলে নিজেই প্রশ্ন করে প্রতিষ্ঠা করল যে, রমা দাশ সজ্ঞানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। সে কুমারী হওয়া সত্ত্বেও শাঁখা ও সিঁদুর পরে বিবাহিতা রমণীর ছদ্মবেশে সেদিন দোকানে এসেছিল। সে উপরওয়ালার নির্দেশমতই ঐ ছদ্মবেশ ধারণ করে। তার বিবেক পরিষ্কার—কারণ সে জানত ঐ মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে একটা মহত্তর উদ্দেশ্যে। এরপর নির্মল প্রশ্ন করে : ঐ 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি আপনি পড়েছেন? যে কপিটা সেদিন কেনা হয়?

: পড়েছি।

: বইটির সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

: বইটি অত্যন্ত অশ্লীল, অবসীন। অশ্লীলতার দায়ে সেটা বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত।

: ঐ গ্রন্থে সমাজের ভাল করার কোন প্রচেষ্টা কি আপনার নজরে পড়েছে? কোন মহৎ জীবনসত্য প্রকাশের চেষ্টা?

: আদৌ নয়।

: বইটির সম্বন্ধে আপনার মূল আপত্তি কোথায়? ভাষার না বিষয়বস্তুতে?

: ভাষায় এবং বিষয়বস্তুতে। উভয়তেই।

: সবচেয়ে কোনটা খারাপ লেগেছে?

: যৌন ক্রিয়ার বিকৃতিতে। একটি প্রায় প্রৌঢ়া গণিকা একজন অল্পবয়স্ক ছোকরাকে নিয়ে যেভাবে খেলা করেছে তাতে বিবমিষা জাগায়!

: বইটার কী কী গুণ আপনার নজরে পড়েছে?

: কোন গুণই দেখতে পাইনি আমি।

নির্মল ভাস্করের দিকে ফিরে বললে, য়ু মে ক্রস্-এগজামিন হার।

ভাস্কর স্থির করে ঐ রমা দাশকে চটিয়ে দিতে হবে। প্রথমেই সে চমক দিতে একটা ধমক দিয়ে শুরু করল : মিস দাশ, আপনি যে 'মিস' এই সংবাদটা আসামীকে সেদিন জানাতে আপনার 'মিস' হয়ে গিয়েছিল, নয়?

মিস দাশ ভ্রূকুটি করে বললে, সে প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

: আপনি কি সুযোগ পেলে এভাবে বহুরূপীর মত মাঝে মাঝে 'মিস' থেকে 'মিসেস' এবং 'মিসেস' থেকে 'মিস' হয়ে থাকেন?

নির্মল উঠে প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়। কিন্তু ভাস্করের উদ্দেশ্য সফল হতে শুরু করেছে—রমা দাশের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

ভাস্কর পুনরায় শুরু করে, মিস দাশ আপনার মতে অপ্রকাশ গুপ্তের পক্ষে অমন একখানা বই লেখা একটা সামাজিক অপরাধ হয়েছিল?

: নিশ্চয়।

: অনুরূপভাবে ভট্টাচার্য মহাশয়ের দোকানে আবেদনপত্রে লিখিতভাবে আপনার পরিচয় গোপন করে স্বাক্ষর করাও আপনার একটা সামাজিক অপরাধ হয়েছিল?

: না। আমি উপরওয়ালার নির্দেশে—

: জাস্ট এ মিনিট, আমি অফিশিয়াল অন্যায়ের কথা বলিনি। আইনত আপনি অপরাধ করেছেন কিনা সে প্রশ্ন তুলিনি। একটা আবেদনপত্রে, শুধু আবেদনপত্রেই বা কেন, একটা চুক্তিপত্রে—যেহেতু আসামী শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহিতকে বইটা বিক্রয় করতে সম্মত ছিলেন, তাই লিখিতভাবে আপনি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে একটা 'সামজিক' অপরাধ করেননি?

: করেছিলাম। কিন্তু—

: 'কিন্তু' কিছু নেই মিস দাশ। ঐ 'কিন্তু'টা সেদিনই বলেছেন ঐ নবীন পতিতুণ্ডি যা এইমাত্র টেপ-রেকর্ডে শুনলেন। আপনি বরং বলুন, আপনি যেমন অন্য একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একটা মিথ্যা ভাষণ করলেন—এবং সেজন্য নিজেকে অপরাধী মনে করছেন না, অপ্রকাশ গুপ্তও যদি তেমনি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একটা আপাত-অশ্লীল গ্রন্থ রচনা করেন তবে কি তিনি নিজেকে অপরাধী ভাববেন?

নির্মল উঠে দাঁড়ায় : অবজেকশান! আর্গুমেন্টেটিভ! মিস দাশ একজন সার্জেন্ট। তিনি এক্সপার্ট নন।

জাস্টিস সেনশর্মা বলেন, ডারেক্ট এভিডেন্সে আপনি ওঁকে শুধুমাত্র সার্জেন্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত করেননি। ওঁকে পাঠিকারূপেও চিহ্নিত করেছেন। বইটি অশ্লীল কি না এ মতামত নথীবদ্ধ করিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ না হলেও এ-ক্ষেত্রে সাক্ষীর কী ধারণা তাঁকে বলতে হবে। অবজেকশান ওভাররুলড।

: অপ্রকাশ গুপ্ত নিজেকে অপরাধী ভেবেছিলেন কি না আমি জানি না।

: তা জানেন না। কিন্তু নিজেকে নিরপরাধ ভাবাও তাঁর পক্ষে সম্ভব? আপনি যেমন নিজেকে নিরপরাধী মনে করছেন!

: আমি জানি না।

: কী জানেন না? 'হংসী ডুবে ডুবে গুগলী খেতে পারলে হংস তা পারে, কি না?'—এটা বলতে পারেন না?

: আমি আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

: এমন সহজ প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন না, অথচ ঐ বইটা অশ্লীল কি না তা চট করে বুঝে ফেললেন?

: অবজেকশান য়োর অনার! উনি সাক্ষীকে ধমক দিচ্ছেন।

ভাস্কর একটি বাও করে বললে, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

মধ্যাহ্নবিরতির ঘোষণা করে বিচারক উঠে গেলেন।

## কুড়ি

মধ্যাহ্ন-অবকাশের পর সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালো বাদীপক্ষের তিন নম্বর সাক্ষী—আবদুল রেজ্জাক। বাঙলাদেশের নাগরিক, সত্তর বছরের পলিতকেশ বৃদ্ধ। এক গাল চাপ দাড়ি, মাথায় কাজ-করা সাদা টুপি, পরিধানে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, হাতে লাঠি।

নির্মলের প্রশ্নে সে আত্মপরিচয় দিল, স্বীকার করল চল্লিশ বছর পূর্বে সে ঐ উপন্যাসটির প্রকাশক ছিল, বইটি মাত্র পাঁচশ কপি ছাপা হয়, তার ভিতর চারশ নিরানব্বইটি কপি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বইটি প্রকাশিত হবার আগেই লেখক মারা গিয়েছিলেন। আবদুল বইটির রয়ালটি বাবদ পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী 'তটিনী' নাম্নী এক রূপোপজীবিনীর তবলচি মৈনুল হককে নগদে একশ টাকা দিয়েছিল। তটিনীকে সে ঘনিষ্ঠভাবে চিনত একথা স্বীকার করল। গ্রন্থ প্রকাশকালে 1935 সালে তটিনীর বয়স ছিল আন্দাজ ত্রিশ। তারপর তটিনীর খবর সে জানে না। নির্মল সওয়াল করতে থাকে, তাহলে অপ্রকাশ গুপ্তকে আপনি জানতেন?

: আজ্ঞে তাঁর বই ছাপলাম, আর তাঁকে জানব না?

: কি রকম চরিত্রের লোক ছিলেন তিনি? তাঁর স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা বা জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?

: এক নম্বর মাতাল ছিলেন তিনি, বেশ্যাপাড়ায় দিনরাত—

ভাস্কর আপত্তি দাখিল করে : অবজেকশান য়োর অনার। নো ফাউণ্ডেশান হ্যাজ বিন লেইড। সাক্ষী আপ্তবাক্যের মত তাঁর মতামত ঘোষণা করে যাচ্ছেন। কোন সূত্রে কেমনভাবে তিনি জেনেছেন তা বলছেন না। তিনি অপ্রকাশকে আদৌ কখনও দেখেছেন কিনা তা এখনও পর্যন্ত বলেননি।

নির্মল প্রতিবাদ করে, য়োর অনার, একটি লোকের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা হয়—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জাস্টিস সেনশর্মা বলেন, মিস্টার প্রসিকিউশন কাউন্সেল! অ্যান অবজেক্শান হ্যাজ বিন রেইসড্! আপনি কি সে বিষয়ে আদালতের রুলিং শুনতে চান?

নির্মল লজ্জিত হয়ে বলে, ইয়েস, য়োর অনার।

জাস্টিস সেনশর্মা একটু ইতস্তত করে সাক্ষীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, আপনি লেখক অপ্রকাশ গুপ্তকে কখনও চাক্ষুষ দেখেছেন?

: আজ্ঞে না।

: দেন দ্য অবজেকশান ইজ সাসটেইণ্ড।—আদালতের পেশকারকে তিনি নির্দেশ দেন ইতিপূর্বে আবদুলের ঐ জবাবটা—অপ্রকাশ গুপ্তের চরিত্র হননের প্রচেষ্টাটা—আদালতের নথী থেকে কেটে বাদ দিতে।

নির্মল কপালের ঘামটা মুছে নিয়ে বলে, তটিনীর কাছে অথবা মৈনুল হকের কাছে আপনি অপ্রকাশ গুপ্ত সম্বন্ধে কী শুনেছেন?

: অবজেকশান য়োর অনার। হেয়ারসে।

: অবজেকশান সাসটেইণ্ড।

নির্মল রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ে। এরপর অপ্রকাশ গুপ্তের চরিত্র হনন আর সম্ভবপর নয়। অতঃপর সে তটিনীর চরিত্রটাকেই কর্দমপঙ্কে ডুবিয়ে ছাড়ে। তাতে প্রতিবাদী আপত্তি করতে পারে না। সেটা আবদুলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে। শেষে নির্মল আবার শুরু করে, এ বইটা যখন আপনি ছেপেছিলেন তখন কী জানতেন এটা অশ্লীল?

: আজ্ঞে জানতাম বৈকি!

: তাহলে অমন একটা খারাপ বই ছাপলেন কেন?

: যে কারণে দুনিয়ায় সর্বত্র ঐ-জাতীয় খারাপ বই ছাপা হয়। টাকার লোভে।

: আপনি ঐ 'সাগর-সঙ্গমে' ছাড়া আর কোন বই ছেপেছেন, যা অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছে?

সাক্ষী তা স্বীকার করে। দু-তিনটি বইয়ের নামও করে।

নির্মল এখানেই তার সওয়াল শেষ করে। বিচারকের অনুমতি পেয়ে ভাস্কর তার জেরায় প্রথমেই প্রশ্ন করে : আবদুল রেজ্জাক সাহেব, আপনি পার্কসার্কাসের মহম্মদ ইয়াকুবকে চেনেন?

আবদুল স্বীকার করে। ভাস্কর প্রশ্ন করে, ঐ মহম্মদ ইয়াকুব কি বিশে মে, মঙ্গলবার ঢাকায় আপনার বাড়িতে দেখা করেছিল?

: করেছিল।

: তখন কি আপনি তাকে বলেছিলেন যে, অপ্রকাশ গুপ্তের খানকয়েক চিঠি আপনার কাছে ছিল?

সাক্ষী নার্ভাস হয়ে পড়ে। সামলে নিয়ে বলে, ঠিক মনে পড়ছে না।

: আপনি এ কথাও বলেছিলেন যে, শর্তসাপেক্ষে আপনি এ মামলার প্রতিবাদী পক্ষে সাক্ষী দিতে রাজী এবং সেই চিঠিগুলি আপনি প্রতিবাদী পক্ষকে অর্পণ করবেন?

: আজ্ঞে না। তেমন কোন কথা হয়নি।

: অপ্রকাশ গুপ্ত লিখিত সেই চিঠিগুলি বর্তমানে কোথায়?

: চিঠির কথা তো আমার মনেই পড়ছে না হুজুর। কোথায় তা কেমন করে বলব?

: চল্লিশ বছর আগেকার অত কথা আপনার মনে আছে আর এগারো দিন আগে আপনার অধিকারে অপ্রকাশ গুপ্তের স্বহস্তে লেখা চিঠি ছিল তা মনে পড়ছে না?

নির্মল আপত্তি পেশ করে—আর্গুমেণ্টেটিভ!

বিচারক প্রশ্নটি বাতিল করেন।

: আমি বলছি, সেই পত্রে এমন তথ্য ছিল যাতে প্রমাণ হত অপ্রকাশ গুপ্ত একটি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ গ্রন্থটি লেখেন—তিনি ঐ পত্রে এই গ্রন্থের অ্যানালিসিস্ করে তার মূল বক্তব্যটা বুঝিয়ে মৈনুল হকের হাতে পাঠিয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন সেটা ছাপতে। আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

: চিঠির কথা আমার মনেই পড়ছে না হুজুর—এসব কথার কি জবাব দেব?

: বেশ, জবাব দেবেন না। আপনি বলেছেন যে, গ্রন্থটি 'অশ্লীল' একথা জেনেও আপনি অর্থলোভে বইটি ছেপেছিলেন, তাই নয়?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। তাই বলেছি।

: অথচ চল্লিশ বছর আগে আলিপুরের আদালতে যখন আপনাকে আসামী করে মামলা ওঠে তখন আপনি নিজেকে নির্দোষ বলেছিলেন?

সাক্ষী নীরব।

: জবাব দিন! তখন কী প্লীড করেছিলেন? গিলটি?

: আজ্ঞে নির্দোষ!

: তাহলে আপনার কোন কথাটা সত্যি?

সাক্ষী মাথা চুলকে কোনক্রমে বললে, দুটোই সত্যি হুজুর। তখন আমি বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি।

: সে কি কথা? আপনি যে বললেন, জেনে শুনে অর্থলোভে বইটা ছেপেছিলেন?

সাক্ষী আর হালে পানি পায় না।

ভাস্কর নূতন করে শুরু করে, আচ্ছা আপনি হৈমবতী ভৌমিক নামে কাউকে চেনেন—

নির্মল আপত্তি তোলে—ঐ চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে। ভাস্কর আদালতকে প্রতিশ্রুতি দেয়, অচিরেই ঐ চরিত্রটির প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি সে দিচ্ছে। বিচারক তখন সাক্ষীকে নির্দেশ দেন প্রশ্নটির জবাব দিতে। সাক্ষী স্বীকার করে যে, হৈমবতী ভৌমিক নামে কাউকে চেনে না। ভাস্কর তখন তার ব্রীফ-কেস থেকে একখণ্ড বই বার করে সাক্ষীকে দেখায়। বলে, দেখুন তো বইটা চিনতে পারেন কিনা। একটা কবিতার বই। লেখিকা হৈমবতী ভৌমিক। প্রকাশ-স্থান, ঢাকা। প্রকাশক, আবদুল রেজ্জাক। আবদুল স্বীকার করে, সে নিজেই ঐ কবিতার বইটির প্রকাশক। তার স্মরণ ছিল না। বইটি পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল—কবিতার চটি বই—বাজারে কাটেনি। সক্ষোভে বললে, অতদিন আগেকার কথা হুজুর সব কি আর মনে থাকে?

ভাস্কর বলে, আমিও তো তাই বলছি রেজ্জাক-সাহেব। চল্লিশ বছর আগেকার লেখক অপ্রকাশ গুপ্ত অথবা তার প্রণয়িনী তটিনী দেবীকেও আপনার কিছুই মনে পড়ে না। পুলিস যেভাবে শিখিয়েছে সেইভাবেই পাখিপড়া এজাহার দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি তো আর তটিনীর ঘরে রাত কাটাননি।

আবদুল রেজ্জাক দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে, আজ্ঞে না হুজুর, রাত কাটাইনি, তবে তটিনীর কথা আমার ঠিকই মনে আছে।

ভাস্কর তার ক্রশ-এগজামিন শেষ করে।

বাদীপক্ষের পরবর্তী সাক্ষী শ্রীবৃন্দাবন ধর, এম. এ.। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটুটের প্রাক্তন কর্মী। বর্তমানে একটি অদ্ভুত সমীক্ষা করছেন কয়েকটি সংবাদপত্রের অর্থনৈতিক আনুকূল্যে। তাঁর গবেষণার বিষয় বাঙলা ভাষার পাঠক-পাঠিকার স্বরূপ উদ্ঘাটন। নির্মল নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে কী ভাবে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়ে সভ্যাসভ্যদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাঙলাভাষার পাঠকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করছেন তা বোঝাতে থাকেন। ভাস্কর বুঝতে পারে না, নির্মল নিয়োগী ওঁর মাধ্যমে কী প্রমাণ করতে চায়। সলিল লাহিড়ী ওর কানে কানে বলে, নির্মলবাবু সাধারণ পাঠকের উপর এ বইটির কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাই দেখতে চান।

ভাস্কর জনান্তিকে বললে, তা কি করে হবে? বাজারে যে বই প্রকাশিতই হয়নি সে সম্বন্ধে বৃন্দাবন ধর কেমন করে স্ট্যাটিসটিকস্ সাপ্লাই করবে?

আর কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের পরেই ভাস্কর বুঝতে পারল বাদীপক্ষ কি করতে চায়। আইন যাকে বলছে 'গড়-পাঠক' বা 'অ্যাভারেজ রীডার' তার একটা স্বরূপ ওরা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নির্মল প্রশ্ন করে বলে : তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনার সমীক্ষা থেকে বাঙলা বইয়ের গড়-পাঠকের একটা কাল্পনিক প্রতিমূর্তি আপনি খাড়া করতে পেরেছেন?

: আমি তাই বলছি। এ পর্যন্ত দু-হাজারের উপর পাঠক-পাঠিকার জবানবন্দি আমি সংকলন করেছি। তার অ্যাভারেজ থেকে বাঙলা বইয়ের অ্যাভারেজ রীডারের একটি চিত্র খাড়া করা যায়।

: সেই গড়-পাঠকের স্বরূপটা কেমন দাঁড়াচ্ছে?

বৃন্দাবন বলেন, আপনার লিঙ্গে ভুল হল। পাঠক নয়, পাঠিকা। এ পর্যন্ত 2142 জনের জবানবন্দি আমি সংকলন করেছি; তার ভিতর 1347 জন হচ্ছেন লাইব্রেরীর মহিলা-সভ্যা। ফলে বাঙলা ভাষার 'অ্যাভারেজ রীডার' একজন স্ত্রীলোক, পুরুষ নন।

: সেই অ্যাভারেজ রীডার-এর সম্বন্ধে আর কী কী তথ্য আপনি জানাতে পারেন?

: গড়-পাঠক, রাদার পাঠিকার গড়-বয়স প্রায় আটাশ বছর। তিনি বিবাহিতা। একটি সন্তানের জননী—

চকিতে ভাস্করের মনে হল, নির্মল কায়দা করে গড়-পাঠিকার যে চিত্র বৃন্দাবনবাবুকে দিয়ে আঁকাচ্ছে সেটা আসলে রেবা সেন-এর পোর্ট্রেট। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়: অবজেকশান য়োর অনার।

: অন হোয়াট গ্রাউণ্ডস?—প্রশ্ন করেন বিচারক।

ভাস্কর কিছু ভেবেচিন্তে আপত্তি জানায়নি। এখন বাধ্য হয়ে বলে, এভাবে বাঙলা ভাষার একজন গড়-পাঠকের স্বরূপ নির্ধারণ করা যায় না।

জাস্টিস সেনশর্মা বলেন, সেটা ক্রশ-এগজামিনেশানে প্রমাণ করবেন আপনি। অবজেকশান ওভাররুল্ড। য়ু মে প্রসীড।

নির্মল হেসে বলে, আমার সওয়াল শেষ হয়েছে।

ভাস্কর তখন উঠে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, বৃন্দাবনবাবু, গত আদমসুমারীতে দেখা গেছে ভারতবর্ষে যত পুরুষ আছে নারী তার চেয়ে কিছু বেশী। আপনার হিসাব অনুযায়ী তাহলে একজন 'অ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ান' হচ্ছেন মহিলা?

বৃন্দাবন মাথা নেড়ে বললেন, না। 'অ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ান' মহিলা নন, 'মেজরিটি ইণ্ডিয়ান' মহিলা।

: তাহলে 2142 জন পাঠক-পাঠিকার মধ্যে গড় কেমন করে পাঠিকা হয়?

: এরিথমেটিক্যাল মীন-এর হিসাবে।

: দুটো অ্যাবসলিউটের কি এরিথমেটিক্যাল মীন হতে পারে? জেনারেল ম্যানেজার আর দারোয়ানের মাহিনার এরিথমেটিক্যাল মীন কি ঐ ফ্যাকটারীর গড়-কর্মীর আয়?

: না, কিন্তু সব কর্মীর আয়কে কর্মী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা কর্মীদের গড় আয় পাব, ঠিক যেভাবে আমি 2142 জন পাঠক-পাঠিকার বয়সের সমষ্টিকে 2142 সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করে জেনেছি গড়-পাঠিকার বয়স প্রায় আটাশ।

ভাস্কর বুঝতে পারে বৃন্দাবনবাবুর সাক্ষ্যের বস্তুত কোন দাম নেই। তার ভূমিকা হচ্ছে আসরে রেবা সেনকে নিয়ে আসার পথটা সুগম করা। রেবা সেন প্রত্যাশিত পরবর্তী সাক্ষী। বয়স আটাশ, বিবাহিতা, এক সন্তানের জননী—সে এসে বলবে 'সাগর-সঙ্গমে বইটি অশ্লীল। তা থেকেই আমেরিকান আইনের ঐ 'গড়-পাঠকের' মতামত প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রয়াস হবে। সেটাকেই এখন রোখা দরকার। ভাস্কর প্রশ্ন করে, আপনি বিশেষজ্ঞ, একটা জিনিস বুঝিয়ে বলুন। আমি যদি টস্ করবার সময় এক লক্ষ লোককে প্রশ্ন করি 'হেড অর টেল'? তাহলে প্রব্যাবিলিটির আইন অনুসারে প্রায় আধাআধি লোক বলবে 'হেড'। এটা মানবেন তো?

: নিশ্চয় মানব।

: তার মানে এক লক্ষ লোককে প্রশ্ন করলে জবাব 'হেড'ও হতে পারে 'টেল'ও হতে পারে। 'হেড' হবার সম্ভাবনা আধাআধি। কারেক্ট?

: কারেক্ট।

: এখন বিশেষজ্ঞ হিসাবে বলুন, ঐ এক লক্ষ লোকের যাবতীয় তথ্য সংকলন করে ধরুন আপনি একটি গড়-আদমির চিত্র খাড়া করলেন, যার বয়স, ম্যারিটাল স্টাটাস, শিক্ষা, বুদ্ধি, সন্তান-সংখ্যা ঐ এক লক্ষ লোকের গড়। এখন সেই তথাকথিত গড়-লোকটিকে প্রশ্ন করা হল 'হেড অর টেল' এবং সে জবাবে বলল 'হেড'। তাহলে কি মেনে নেওয়া যায় এক লক্ষ লোকের গড় অভিমত—'হেড'?

নির্মল আপত্তি তোলে—অবজেকশান! আর্গুমেণ্টেটিভ।

বিচারক তা মানতে রাজী নন। অগত্যা বৃন্দাবন ধর স্বীকার করলেন, না, তা মেনে নেওয়া যায় না। এ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব!

: অর্থাৎ আপনার বর্ণনা অনুযায়ী বাঙলাভাষার কোন গড়-পাঠিকা যদি সশরীরে এসে হাজির হন এবং তাঁর ব্যক্তিগত মতামত হিসাবে জানান যে 'মহাভারত' একটি অশ্লীল গ্রন্থ, তাহলে বলা যায় না যে, বাঙালী পাঠক-পাঠিকার গড় অভিমত তাই। নয়?

নির্মলকে নিরাশ করে বৃন্দাবন ধর বলেন, নিশ্চয়ই তা বলা যায় না।

: থ্যাঙ্কু মিস্টার ধর। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

নির্মলের আজ দিনটাই খারাপ। একেবারে গ্র্যাণ্ড স্লামের হাত না হলেও সাড়ে চার ট্রিকের হাত নিয়ে এই ডীল খেলতে শুরু করেছিল—ভাস্করের হাতে সে একটা টেক্কাও প্লেস করেনি—বস্তুত ডিফেন্সের কোনও সাক্ষী আদৌ যোগাড় হয়েছে বলে খবর পায়নি। অথচ মনে হচ্ছে, ভাস্করই একে একে পিঠগুলো তুলছে। ওর টেক্কা-সাহেব-বিবির পিঠ ভাস্কর রঙের দুরি-তিরি ছুঁইয়ে নিজের কোটে নিয়ে যাচ্ছে। স্পেডের টেক্কা আবদুল রেজ্জাক ট্রাম্প হয়ে গেল বেমক্কা! অপ্রকাশ গুপ্তের চরিত্রহননের আগেই 'হেয়ারসে' রিপোর্টের অভিযোগে মার খেল সে। মনে হয়, বিচারকের উপর তার সাক্ষ্যের কোনও প্রভাবই পড়েনি। হরতনের সাহেব বিমান গুহ এবং হরতনের বিবি মিস রমা দাশও বাজার মাত করতে পারেনি। বাকি আছে ক্লাবসের টেক্কা সুখেন কানোরিয়া এবং ডায়মণ্ডের বিবি রেবা সেন। এবার কী লীড দেবে, নির্মল নিয়োগী বুঝে উঠতে পারে না।

জাস্টিস সেনশর্মা দেওয়াল-ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, য়োর নেক্সট উইটনেস প্লীজ, মিস্টার প্রসিকিউশান কাউন্সেল।

নির্মল বললে, আমার পরবর্তী সাক্ষী মিসেস রেবা সেন।

ভাস্করের কানে কানে প্রদীপ বললে, অপ্রকাশ গুপ্তের চরিত্রহনন হল না বলে এবার কি ডিফেন্স কাউন্সেলের চরিত্রহননের চেষ্টা হবে নাকি?

ভাস্করও জনান্তিকে বললে, ব্যাপার বুঝছি না। রেবা সেন কেন সাক্ষী দিতে রাজী হল? আমার উপর অবশ্য তার প্রচণ্ড রাগ ; হবার কথাও—কিন্তু আদালত হচ্ছে আমার এলাকা। সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহকে বধ করে যাবার দুঃসাহস ওর হল কেন?

প্রদীপ বলে, ও বোধহয় মরিয়া হয়ে উঠেছে! খুব সাবধান!

কোর্ট-পেয়াদার আহ্বানে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ায় মিসেস রেবা সেন। আদালতে একটা সাড়া পড়ে যায়। ডায়মণ্ডের বিবির কিন্তু হীরা-জহরৎ নেই—সে যেন গোরা নাটকে সুচরিতার চরিত্র অভিনয় করতে মঞ্চে প্রবেশ করল। ফ্রিল দেওয়া থ্রি-কোয়ার্টর জ্যাকেট, ধপধপে শাদা, পরনে শাদা মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি, বাঁ-কাঁধের কাছে ব্রোচ

দিয়ে আটকানো। কবজিতে লেডিস রিস্ট ওয়াচ, ডান হাতে একগাছা মকরমুখী বালা। গলায় জল-চিকচিক গ্রীষ্মের সুবর্ণরেখার মত এক চিলতে মফচেন, কানে দুটি মুক্তোর ঝোলা দুল। সিতশ্চ হসিতং, গঙ্গাফেনসিতা সিঁথি। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি।

: আপনার নাম?

: মিসেস রেবা সেন।

: আপনার স্বামী মাস-ছয়েক আগে মারা গেছেন, একথা সত্যি?

: মাস ছয়েক নয়, পাঁচ মাস সাতাশ দিন।

প্রদীপ ভাস্করের কানে কানে বললে, আহা! কী হৃদয়বিদারক! প্রতিটি দিনের হিসাব রাখছেন বিধবা ভদ্রমহিলা। ভাস্কর! সাবধান! মেয়েটা তোকে ছোবল মারবার জন্য ফণা মেলেছে!

ভাস্কর বলে, কিছু ভাবিস না। দেখ না কীভাবে ওর বিষ-দাঁতটা ভাঙি!

: আপনি লেখাপড়া কতদূর করেছেন?

: বাঙলা অনার্স নিয়ে বি.এ. পাস করেছিলাম। এম. এ. পড়িনি, তার আগেই বিয়ে হয়ে যায়।

: বাঙলা উপন্যাস আপনি খুব পড়েন?

: হ্যাঁ, এটাই আমার সময় কাটানোর প্রধান উপাদান।

: অপ্রকাশ গুপ্ত লিখিত 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা পড়েছেন?

: পড়েছি, কষ্ট হয়েছে—তবু আদ্যন্ত পড়ে শেষ করেছি।

: বইটার সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

: একটা জঘন্য অশ্লীল বই, যাকে বলে পর্নোগ্রাফিক লিটারেচার।

: বাঙলা অনার্সের ছাত্রী হিসাবে উপন্যাসের গুণাগুণ বিচার করতে আপনি শিখেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় বলুন—উপন্যাসটিকে লেখক কোনও বিশেষ জীবন-সত্যের কথা শুনিয়েছেন কি? অশ্লীলতার দোষ সত্ত্বেও বইটির কোনও 'রিডীমিং ফীচার' আছে?

রেবা সেন বললে, প্রথমত বইটাকে আমি আদৌ উপন্যাস হিসাবে মেনে নিতে রাজী নই—একটি রম্যরচনা লিখবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন লেখক। আসলে লেখক একটি গণিকার স্মৃতিকথনের মাধ্যমে কিছু অশ্লীল বর্ণনা দিয়েছেন—পাঠককে যৌন সুড়সুড়ি দেবার চেষ্টা করেছেন। নায়িকা তটিনীর সংসারের চিত্র লেখক আঁকেননি—তার অর্থনৈতিক কোন সমস্যাই যেন ছিল না—ছিল এক বিশ্বগ্রাসী যৌন ক্ষুধা। ক্রমাগত তার সেই অভিজ্ঞতার কথা তটিনী শুনিয়েছে ; যার শেষ হচ্ছে একটি অল্পবয়সী ছোকরার অস্বাভাবিক যৌন অভিজ্ঞতায়। আমার আরও খারাপ লেগেছে এ জন্য যে, আমার মনে হয়েছে লেখক স্বয়ং ঐ নায়িকাকে উপভোগ করেছেন এবং নির্লজ্জ ভাষায় সাগর-এর বকলমে নিজ অভিজ্ঞতা লিখেই বাহাদুরি পাবার চেষ্টা করেছেন। বইটি আদ্যন্ত অশ্লীল—এর কোন 'রিডীমিং ফীচার' আমি খুঁজে পাইনি।

: ধন্যবাদ মিসেস সেন। আপনার ব্যাখ্যায় বিষয়বস্তুটা পরিষ্কার বোঝা গেল। এখন আপনি আমাকে বলুন তো—এই নিষিদ্ধ বইটি, যার প্রথম সংস্করণ বাজেয়াপ্ত এবং দ্বিতীয় সংস্করণ অপ্রকাশিত তা আপনি কোথায় পেলেন?

: আমার একজন পুরুষ বন্ধু আমাকে সেটা পড়তে দিয়েছিলেন।

: পুরুষ বন্ধু? আপনার?

: না, তা ঠিক নয়, তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

: আই সী। তিনি হঠাৎ কেন ঐ বইটাই আপনাকে পড়তে দিলেন? আপনার কি মনে হয়?

: আমার বিশ্বাস—

ভাস্কর বাধা দিয়ে বলে, অবজেকশান! সাক্ষীর কি বিশ্বাস তা আমরা শুনতে প্রস্তুত নই। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই শুধু বলতে পারেন।

: অবজেকশান সাসটেইণ্ড! নেক্সট কোশ্চেন প্লীজ?

নির্মল হেসে বলে, বেশ। মিসেস্ সেন, আপনি এবার বলুন আপনি কি বইটির ঐ একটি মাত্র কপি দেখেছেন? যেটি আপনার বন্ধু সম্ভবত ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে কিনে আপনাকে পড়তে দিয়েছিলেন।

: না! যেদিন তিনি আমাকে ঐ বইটি পড়তে দেন, ঠিক তার পরের দিন আমাদের আর একজন পারিবারিক পুরুষ বন্ধু আর একখানি চোরাই কপি নিয়ে এসে পড়তে দিয়েছিলেন।

: আশ্চর্য! সেই দ্বিতীয় পুরুষ বন্ধুটির নামটা কি আপনি—

নির্মলের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই ভাস্কর আপত্তি পেশ করে। বর্তমান মামলার সঙ্গে এ-সব প্রশ্ন সম্পর্কবিমুক্ত—ইররেলিভ্যান্ট, ইমমেটিরিয়াল।

নির্মল বিচারকের দিকে ফিরে বলে, য়োর অনার, এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা আমি পরবর্তী প্রশ্নেই প্রতিষ্ঠিত করব।

বিচারক তবু রাজী হন না। বলেন, না। ঐ সাক্ষীর ব্যক্তিগত জীবনের খবর—কে তাঁর ঐ জাতের বন্ধু, কে তাঁকে ঐ সব বই যোগান দিত, তা তাঁকে বলতে আপনি এভাবে বাধ্য করতে পারেন না।

নির্মল জবাব দেবার আগেই রেবা সেন বললে, এক্সকিউজ মি য়োর অনার, জানাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি স্বেচ্ছায় সব কথা বলতে প্রস্তুত!

জাস্টিস সেনশর্মা সবিস্ময়ে বলেন, কারা আপনার ঐ জাতের বন্ধু, কেন তারা ঐ রকম একটা বই আপনাকে পড়তে দিয়েছিল এসব কথা প্রকাশ্য আদালতে আলোচনা করায় আপনার আপত্তি নেই?

: নো য়োর অনার। এই ধরনের পর্নোগ্রাফিক বই সমাজে কী জাতের উপকারে লাগে তা আমি খুলে দেখাতে চাই।

বিচারক রেবা সেনকে আপাদমস্তক একবার খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। শুচিশুদ্ধ বৈধ্যব্যের এই প্রতিমূর্তিকে। একশ বছর আগেকার পোশাকে যে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনার আপত্তি না থাকে, আদালতের আছে। অবজেকশান ইজ সাসটেইণ্ড! আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

রেবা সেন ম্লান হয়ে গেল। নির্মল হতচকিত। ভাস্কর বসল নিজ আসনে ।

: যে দুজন আপনাকে ঐ বইটা পড়তে দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে বইটার বিষয়ে আপনার কি পরে কোন কথাবার্তা হয়েছে? হয়ে থাকলে কী জাতীয়?

: হয়েছে। প্রথম ভদ্রলোককে বইটি ফেরত দেবার সময় আমি বলেছিলাম—এ ধরনের অশ্লীল বই কোন নিঃসম্পর্কীয়া বিধবা ভদ্রমহিলাকে পড়তে দেওয়া আপনার

উচিত হয়নি। দ্বিতীয় ভদ্রলোককে আমি বলেছিলাম—বইটা আমার পড়া এবং সেটা অত্যন্ত অশ্লীল!

নির্মল চোখ থেকে চশমাটা খোলে, কাচটা মুছতে মুছতে সলজ্জ কণ্ঠে বলে, মাপ করবেন মিসেস সেন, এবার আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে বাধ্য হচ্ছি সেটার উত্তর দেওয়া আপনার পক্ষে কঠিন ; যদি না পারেন, তবে বলবেন—'আমি বলব না,' আমি বাধ্য করছি না আপনাকে।

বিচারকের দিকে এক নজর দেখে নিয়ে সে প্রশ্নটা পেশ করে, বইটা পড়তে পড়তে এবং পড়া শেষ হতেই আপনার কি-জাতীয় মানসিক প্রতিক্রিয়া হল?

রেবা সেন মুখ নিচু করল। নতনয়নে বললে, কী বলব?—আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য—আমার নূতন করে কষ্ট হচ্ছিল।

: আপনি কি মনে করেন, অল্পবয়সী কোন ছেলে বা মেয়ে এই বইটা পড়ে উত্তেজনার বশে সংযমের বন্ধন হারিয়ে বিপথে চলে যাবার অনুপ্রেরণা পাবে?

: অবজেকশান! সাক্ষী কি মনে করেন তা আমরা শুনতে প্রস্তুত নই—

: অবজেকশান ওভাররুল্ড—জবাব দিন।

: রেবা সেন বলে, শুধু অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে কেন, প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী, যাদের ঘটনাচক্রে সেকশুয়াল সেফটি-ভালবের ব্যবস্থা নেই—তারাও বিপথগামী হতে পারে।

: সুতরাং এই বইটা বাজেয়াপ্ত হোক, এই আপনি চাইছেন?

: সর্বান্তঃকরণে।

: ধন্যবাদ মিসেস সেন, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

বিচারকের অনুমতি পেয়ে এবার ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। রেবা সেনের মুখোমুখি। স্মিত হাস্যে শুরু করে, আপনার বয়স কত মিসেস সেন?

ভাস্করের চোখে চোখ রেখে রেবা সেন বলে, আটাশ।

: সাগর-সঙ্গমে বইয়ের নায়িকার, ঐ বেশ্যা তটিনীর সে সময় বয়স কত ছিল?

ভ্রূ কুঁচকে রেবা সেন বলে, ত্রিশ।

: কাহিনী অনুসারে ঐ ত্রিশ বছরের ভিতর তটিনীর কাছে বহু খদ্দের এসেছিল, তাই নয়?

: হ্যাঁ।

: তার মধ্যে অটলবাবু নামে একজন চরিত্রহীন লুচ্চাপ্রকৃতির লোক তটিনীকে একবার 'নাগর-দোলা' নামে বটতলায় ছাপা একটা কাঁচা-খিস্তির বই এনে দিয়েছিল বলে বর্ণনা আছে। ঠিক কি না?

রেবা সেনের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। কাঠগড়ার রেলিংটা দু-হাতে চেপে ধরে বলে, আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন তো?

: আমি তো কিছু বলতে আসিনি মিসেস সেন ; বলতে তো এসেছেন আপনি, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। আমি শুনতে এসেছি। বলুন—অটলবাবু বেশ্যা পাড়ায় আসবার সময় একখণ্ড কাঁচা খিস্তির বই সঙ্গে করে এনেছিলেন, এবং তটিনীকে সেটা পড়তে দিয়েছিলেন—এ বর্ণনাটা আপনার মনে আছে?

: আছে।

: এ থেকে কি আপনার ধারণা হয়েছিল শুধুমাত্র গণিকাদের পুরুষ বন্ধুরা—কিংবা

বাড়িউলির পারিবারিক পুরুষ বন্ধুরা ঐ জাতীয় বই বেশ্যাপাড়ায় আমদানী করে থাকে?

: অবজেকশান য়োর অনার। আর্গুমেন্টেটিভ। তাছাড়া প্রশ্নটির মধ্যে একটা 'অবসীন' ইঙ্গিত আছে।—নির্মল আপত্তি পেশ করে।

ভাস্কর তৎক্ষণাৎ বলে, অবসীন মানে? অবসিনিটির সংজ্ঞা কি?

নির্মল বলে, সংজ্ঞা নেই, উদাহরণ আছে—যেমন আপনার এই প্রশ্ন।

জাস্টিস সেনশর্মা তাঁর হাতুড়িটা ঠুকলেন। বললেন, আদালত কাউন্সেলারদের মধ্যে এই জাতীয় বাদানুবাদ পছন্দ করেন না। দু পক্ষই তাঁদের বক্তব্য সরাসরি আদালতকে জানাবেন। পরস্পরকে নয়। নাউ, প্রসিকিউশান একটি 'অবজেকশান' দিয়েছেন—দুটি গ্রাউণ্ডে—আর্গুমেন্টেটিভ এবং অবসীন। বিফোর আই গিভ মাই রুলিং আই উইশ টু হিয়ার দি ডিফেন্স কাউন্সেল। মিঃ মুখার্জি, আপনি আপনার স্ট্যাণ্ডটা আর একটু পরিষ্কার করে বলতে পারবেন?

: ইয়েস য়োর অনার। অনারেবল জাস্টিস উল্‌সে ১৯৩৩ সালে নিউইয়র্কে জেমস্ জয়েস্-এর ইউলিসিস্ গ্রন্থের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় রায়-দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"Whether a particular book would tend to excite such (lustful, prurient and sex) impulses and thoughts must be tested by the Court's opinion as to its effect on a person **with average sex instincts**." [কোন একটি গ্রন্থ ঐ জাতীয় যৌন অশ্লীল, ক্লেদাক্ত অনুভূতি জাগ্রত করছে কিনা সেটা বুঝে নিতে হবে এইভাবে—একজন **সাধারণ যৌন অনুভূতি সম্পন্ন** ব্যক্তির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আদালত কি বুঝছেন।] ঐ মামলায় মাননীয় বিচারক উল্‌সে দুই-দুইজন অমন গড়-পাঠকের মতামত সংগ্রহ করেছিলেন। বর্তমান মামলায় ইতিপূর্বে একজন সাক্ষী বলতে চেয়েছেন বাঙলা ভাষার গড়-পাঠিকার বয়স আটাশ, তিনি বিবাহিতা, একটি সন্তানের জননী। বর্তমান সাক্ষীর বয়স আটাশ এবং তিনিও বিবাহিতা—খোদায় মালুম তিনি এক সন্তানের জননী কি না, যাহোক, এ গ্রন্থটির সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় মতামতও ব্যক্ত করেছেন। তাই আমি প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাইছিলাম জাস্টিস উলসের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই স্বতঃপ্রণোদিতা সাক্ষীর 'অ্যাভারেজ সেক্স ইন্সটিংক্ট' আছে কি না।

জাস্টিস সেনশর্মা বললেন, অবজেকশান ওভাররুলড।

ভাস্কর হাসি হাসি মুখে পুনরায় বলে, বলুন মিসেস সেন, আপনার কি ধারণা হয়েছিল, শুধু মাত্র গণিকাদেরই ঐ জাতীয় বই তাদের নাগরেরা এনে দেয়?

: না! তা হয়নি। অনেক অসহায়া ভদ্রমহিলাকেও অটলবাবুর মত লুচ্চাপ্রকৃতির লোকের এ জাতীয় উপদ্রব সইতে হয়!

ভাস্কর এবার অন্যদিক থেকে শুরু করে, আপনার বয়স আটাশ, আপনি বিবাহিতা, বোধ করি আপনার একটিমাত্র সন্তান আছে, তাই নয়?

: হ্যাঁ আছে।

: বাঃ! আপনি তো বৃন্দাবনবাবুর সংজ্ঞা অনুসারে বাঙলা ভাষায় মূর্তিমতী 'গড়-পাঠিকা'! আপনার পড়ার রেঞ্জটা জানা দরকার। আপনি এই কয়টি বইয়ের ভিতর কোন-কোনখানা পড়েছেন—গ্রেস্ মেটালিয়াস্-এর লেখা 'পীটন্ প্লেস', ক্যাল্ডওয়েলের লেখা 'গড্‌স লিটল্ একার', চার্লস সেলডনের লেখা 'ইন হিজ স্টেপস্', হেনরি

মিলারের 'ট্রপিক অভ ক্যান্সার'?

: একখানাও পড়িনি। শুনেছি বইগুলো নিষিদ্ধ। আমি কোথায় পাব?

: তটিনী যেভাবে 'নাগরদোলা' পেয়েছিল, কিংবা আপনি—'সাগর-সঙ্গমে'।

: অবজেকশান!—নির্মল বাহুল্যবোধে আপত্তির কারণটা জানায় না।

জাস্টিস এবার ভাস্করকে 'অ্যাডমনিশ্' করেন, অর্থাৎ সংযত ভাষায় প্রশ্ন করতে পরামর্শ দেন। 'অ্যাডমনিশ্' প্রায় মৃদু ধমকের পর্যায়ে। ভাস্কর দুঃখ প্রকাশ করে ফের শুরু করে : ঠিক আছে মিসেস সেন, ইংরাজী বইয়ের কথা থাক। এই বাঙলা বইগুলির মধ্যে আপনি কোনখানা পড়েছেন?—অচিন্ত্যের 'বিবাহের চেয়ে বড়,' প্রবোধ স্যান্যালের 'দুই আর দুই-য়ে চার', বুদ্ধদেবের 'এরা ওরা আরও অনেকে'। কিংবা 'রাত ভোরে বৃষ্টি'।

: চারখানাই পড়েছি।

: ওর মধ্যে কোনখানা 'অশ্লীল' মনে হয়েছে আপনার?

: একখানাও নয়। চারটিই রসোত্তীর্ণ সাহিত্য।

: কোন লেখা অশ্লীল না রসোত্তীর্ণ সাহিত্য তা কেমন করে বোঝেন?

: এক কথায় তার জবাব হয় না। সংক্ষেপে বলতে বাধ্য হলে বরং বলব, বুদ্ধি দিয়ে, বোধ দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিজস্ব রুচি ও শালীনতনার মাপকাঠিতে মেপে।

: বাঃ! চমৎকার বলেছেন! আচ্ছা আমি যদি একটি বই থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি শোনাই, তা শুনে আপনি বলতে পারবেন বইটা অশ্লীল কিনা?

: না! কোন একটি উদ্ধৃতি শুনে, অর্থাৎ একটিমাত্র অনুচ্ছেদ শুনে বলা যায় না গোটা বইটা অশ্লীল কিনা। আপনি অশ্লীলতম গ্রন্থের ভিতর অমন আট-দশ লাইন নিশ্চয় বেছে নিতে পারবেন যা পড়ে মনে হবে না বইটা অশ্লীল।

: ভেরি কারেক্ট। কিন্তু ওর উল্টোটা যদি করি? ধরুন কোন একটি বইয়ের যে অংশটুকু আমার কাছে অশ্লীলতম মনে হয়েছে যদি শুধু সেইটুকু পড়ে শোনাই?

: তাহলে সেটা শুনে আমি যদি মনে করি উদ্ধৃত অংশটা 'অশ্লীল', আমি বলতে পারব 'বইটা অশ্লীল'; কিন্তু যদি মনে করি, 'উদ্ধৃত অংশটা অশ্লীল নয়', তবে বলতে পারব না গোটা বইটা 'অশ্লীল, কি না'; কারণ বাকি অংশটা আমার অজানা।

: তা তো ঠিকই। আচ্ছা এবার আমি আপনাকে একটা বইয়ের একটা অনুচ্ছেদ শোনাচ্ছি। মূল রচনা থেকে নয়, তার অনুমোদিত অনুবাদ থেকে। শুনে আপনি বলুন উদ্ধৃত অংশটুকু অশ্লীল, না নয়?

: ইয়েস! য়ু মে ট্রাই!—বাঙলা অনার্সের ছাত্রীটির কণ্ঠে একটা চ্যালেঞ্জের সুর।

ভাস্কর বললে, বইটা আমার হাতের কাছে নেই, যাই হোক, মূল কাহিনীর সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে আমি ঘটনার অংশটুকু নিজের ভাষায় শোনাব। যেহেতু আক্ষরিক উদ্ধৃতি দিতে পারছি না, তাই ভাষাগত অশ্লীলতার প্রশ্নই আমি তুলছি না, বিষয়বস্তুগত অশ্লীলতার প্রসঙ্গটুকুই বিবেচ্য। অ্যাম আই ক্লীয়ার?

: পার্ফেক্টলি। বলুন?

: গল্পটা এই—অনেক অনেকদিন আগেকার কথা, তখনও এদেশে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। এক জমিদার মশাই তাঁর তিন পুত্র এবং বিধবা পত্নীকে রেখে মারা গেলেন। তিনটি ছেলেই বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক। বড়টি বিয়ে-থা করবে না বলে ঝোঁক ধরেছে;

মেজটি নামের মোহে পাশের এক প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে দাঙ্গা করতে গিয়ে মারা পড়ল, ফলে বংশরক্ষার তাগিদে বিধবা জমিদারগিন্নি ছোট ছেলেটির জন্যে জোড়া বউ ঘরে আনলেন। বেনারসের এক জমিদারের দুই মেয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ছোট ছেলেটির মারাত্মক অসুখ হল। ডাক্তার পরীক্ষা করে ডায়াগনাইজ করলে—টিউবারকুলোসিস! যখনকার কথা বলছি তখনও স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কৃত হয়নি, যক্ষ্মা-হাসপাতালও ছিল না। জমিদারগিন্নির আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছোট ছেলেটি মারা গেল। এবার নাটক জমছে। জমিদারগিন্নি তাঁর বড় ছেলেকে গোপনে ডেকে বললেন, 'বাবা, তুমি বে-থা করবে না বলেছ, তা নাই করলে কিন্তু বংশরক্ষার তাগিদে একটি কাজ অন্তত কর। ছোট বৌমাদের তোমার ঘরে রাত্রে পাঠিয়ে দিই। এখন ওদের গর্ভ হলে কেউ ধরতে পারবে না। বল, কাকে পাঠাব? বড় বৌ, না ছোট বৌ? কোনটিকে তোমার বেশি পছন্দ? মায়ের ঐ কুৎসিত প্রস্তাব শুনে ছেলেটি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। বলে, 'মা, আমাকে মাপ কর। আমার দ্বারা ও-কাজ হবে না।' মা বললেন, 'সে কি কথা! তাহলে বংশরক্ষা হবে কি করে?' ছেলেটি ভেবে নিয়ে বললে, 'তোমার দুই বৌমাই সুন্দরী, যৌবনবতী—পয়সা খরচ না করলেও অনেকে রাজী হয়ে যাবে; কিন্তু এমন লোক খুঁজে বার করতে হবে যে বিশ্বাসী, ব্যাপারটা গোপন রাখবে—আবার দেখতে হবে তার বংশে যেন রক্তের দোষ না থাকে। বুঝছ তো সবই!' মা বললেন, 'কিন্তু বেশি দেরি করলে তো চলবে না বাবা। ছোট খোকার মৃত্যুর আট-দশ মাসের ভিতর ওদের সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে—।' ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলে, 'অত তাড়াতাড়ি বৌমাদের গর্ভসঞ্চার যদি করাতে চাও তো বল আজই একজনকে ধরে আনতে পারি। লোকটা কিন্তু সডোমিস্ট।' 'সডোমিস্ট কাকে বলে বাবা?' ছেলেটি বুঝিয়ে বলে, 'সডোমিস্ট মানে যে পশুমৈথুনে—'

বাধা দিয়ে সাক্ষী বলে ওঠে, প্লীজ স্টপ ইট! আর বলতে হবে না। এই পর্যন্ত শুনেই বলতে পারি উদ্ধৃত অংশটা শ্লীল বা অশ্লীল।

ভাস্কর বলে, আমি দুঃখিত মিসেস সেন!—আর একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে।

: বেশ বলুন।

: জমিদারগিন্নি সব শুনে বললেন, 'না বাবা, নির্লজ্জ পশুর মত যারা যত্রতত্র মৈথুনে রত হয় এমন কাউকে দিয়ে আমি বৌমাদের গর্ভসঞ্চার করাতে পারব না। তাছাড়া আমি চাই আমাদের বংশের রক্ত যার দেহে আছে তা—' ছেলেটি মাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'কী আশ্চর্য! তেমন লোক তুমি কোথায় পাবে?' মা বললেন, 'আছে। তোর দীপুদা।' ছেলেটি অবাক হয়ে বলে, 'দীপুদা! সে আবার আমাদের বংশের হল কেমন করে?' জমিদারগিন্নি সলজ্জে স্বীকার করলেন তাঁর কলঙ্কের কথা—পুত্রের কাছে। বললেন ঐ দীপুদা বলে ওরা যাকে চেনে, দেখেছে সে ঐ জমিদারগিন্নিরই গর্ভজাত। উনি এ পরিবারে আসার আগেই, অর্থাৎ কুমারী অবস্থাতেই তিনি ঐ দীপুদার মা হয়েছিলেন। যাই হোক, বাধ্য হয়ে ছেলেটি তার অগ্রজ দীপুদাকে গিয়ে মায়ের ইচ্ছার কথা জানালো। দীপুবাবু যে রাজী হলেন এ-কথা বলাই বাহুল্য। পর পর দু-রাত্রে দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। দুজনেরই গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ দেখা দিল। শুধু তাই নয় লেখক ঐ সঙ্গে লিখেছেন—দীপুবাবু দুই জমিদারবধূর গর্ভসঞ্চার করেই ক্ষান্ত দেননি—তাঁর শুভাগমনে ঐ জমিদার-বাড়ির একটি সুন্দরী দাসীও গর্ভবতী হয়ে

উঠল! নাউ মিসেস সেন—গল্পটা অতি-দীর্ঘ, আমি তার একটিমাত্র অনুচ্ছেদ শুনিয়েছি। এবার বলুন উদ্ধৃত অংশটা শ্লীল না অশ্লীল?

: ঘোরতর অশ্লীল।

: আপনি কি চান এ বইটি বাজেয়াপ্ত হোক?

: নিশ্চয়। অশ্লীলতার দায়ে!

: থ্যাঙ্ক য়ু মিসেস সেন! এবার বইটার নাম এবং লেখকের নামটা আপনাকে জানাই। বইটার নাম 'মহাভারত', লেখকের নাম 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস'!

রেবা সেন চমকে ওঠে : মানে! কী বলতে চাইছেন আপনি?

: আমি বলতে চাইছি—ঐ জমিদারগিন্নির নাম সত্যবতী, তাঁর বড়ছেলের নাম ভীষ্ম, আর দীপুবাবু হচ্ছেন গ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব!

রেবা সেন প্রায় তোতলা হয়ে গেল : দিস ইজ এ চীপ ট্রিক! এ গিমিক! আপনি নাম ধাম বিকৃত করে, টিউবারকুলোসিস-এর কথা বলে—

: আমি দুঃখিত মিসেস সেন। বাড়ি ফিরে আপনি রাজশেখর বসু কৃত 'মহাভারত' খুলে দেখবেন। আদিপর্বের মণ্ডপধ্যায়ের অষ্টাদশ অনুচ্ছেদটি আমি নিজের ভাষায় বলেছি মাত্র। হ্যাঁ, বিচিত্রবীর্য থাইসিস-এই মারা গিয়েছিলেন, সত্যবতীর কাছে ভীষ্ম দীর্ঘতমার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন—ঋষি দীর্ঘতমা 'গোধর্ম' অবলম্বন করেছিলেন। ফুটনোটে অনুবাদক রাজশেখর বসু বলেছেন 'গোধর্ম' অর্থে 'পশুর তুল্য যত্রতত্র সঙ্গমে অভ্যস্ত'।

: তবু—তবু আমি বলব—আপনি একটা হীন চক্রান্ত করেছেন—আমি নিশ্চয় 'মহাভারত'কে অশ্লীলতার দোষে বাজেয়াপ্ত করতে বলব না।

: নিশ্চয় বলবেন না। কিন্তু মিসেস সেন, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা যে কারণে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি অশ্লীল মনে হয়েছিল মহাভারতের এই উদ্ধৃত অংশে সেই কারণটাও রয়ে গেছে না কি? আপনি বলেছিলেন, আপনার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে ভাবতে যে, লেখক যেন সাগরের বকলমে নিজের একটা যৌনঅভিজ্ঞতার বর্ণনা করে বাহাদুরি কিনতে চেয়েছেন : তাই না? অথচ অপ্রকাশ গুপ্ত স্পষ্ট করে কোথাও বলেননি যে, তিনি নিজেই সাগর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সেটা অকপটে স্বীকার করেছেন। মহাভারতের লেখক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন নিজের দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূ—কাশীরাজ তনয়া পাণ্ডু এবং ধৃতরাষ্ট্র জননীর গর্ভসঞ্চার তিনি স্বয়ং করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের পরিচারিকা বিদুর জননীর অনুরোধও তিনি উপেক্ষা করেননি। তাই নয়?

নির্মল উঠে দাঁড়ায়। বলে, এনাফ্ অব ইট, য়োর অনার। আমার মনে হয় সহযোগী ক্রমশঃ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সওয়াল-জবাব।

জাস্টিস সেনশর্মা ভাস্করকে বলেন, এ বিষয়ে আপনার কোনও বক্তব্য আছে?

: ইয়েস য়োর অনার। আমি মনে করি আমার এই মহাভারত আলোচনা সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। আমি দেখাতে চাইছিলাম—যে যে দোষে সাক্ষী 'সাগর-সঙ্গমে' বইটাকে বাজেয়াপ্ত করতে চাইছেন ঠিক সেই সেই দোষ মহাভারতেও আছে। 'দোষ' বিশেষণটা অবশ্য সাক্ষীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আমার নয়।

জাস্টিস সেনশর্মা বলেন, আপনি তা দেখিয়েছেন। এবার অন্য প্রসঙ্গের আবতারণা করুন। ইয়েস, য়ু মে প্রসীড।

ভাস্কর নূতন করে শুরু করে। তার ব্রীফ-কেস থেকে একখণ্ড 'সাগর-সঙ্গমে' বার

করে সাক্ষীর হাতে দেয়। বলে, ওর একশ তের পৃষ্ঠায় লাল পেন্সিলে চিহ্নিত প্যারাগ্রাফটা আপনি দয়া করে পড়বেন?

রেবা সেন রীতিমত ঘেমে উঠেছে। রুমাল দিয়ে দ্রবীভূত পাউডারচূর্ণ মুছে নিয়ে সে বইটির চিহ্নিত অংশটির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে। তারপর বইটা সশব্দে বন্ধ করে ফেরত দেয়, বলে, আমি দুঃখিত। আই কাণ্ট ওবলাইজ য়ু! আমি পড়ব না!

জাস্টিস একটু ঝুঁকে পড়ে বলেন, বেশ তো, জোরে জোরে না পড়লেও আপনি মনে মনে ওটা পড়ে দেখুন। ওই জায়গা থেকে উনি কোনও প্রশ্ন করতে চান।

রেবা সেন করুণভাবে নির্মলের দিকে তাকায়।

ভাস্কর তখন নিজে থেকেই বলে, ঠিক আছে। দরকার নেই। এই পেন্সিলটা ধরুন এবং ঐ প্যারাগ্রাফে যে পংক্তিটা আপনার অশ্লীলতম মনে হচ্ছে সেটা আণ্ডারলাইন করুন।

রেবা সেন পেন্সিলটা যেন ছিনিয়ে নিল। একটা লাইন মারাত্মকভাবে ক্ষতচিহ্নিত করে পেন্সিল ও বইটা ফেরত দিল। ভাস্কর স্মিতহাস্যে বললে, আপনার এই সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। নাউ টু বিজনেস—, আপনি যে লাইনটাকে অশ্লীলতম বলে অভিনন্দিত করেছেন ওটা যদি এভাবে লেখা হত 'সেই রাত্রে সাগর তটিনীর শয্যায় প্রথম শুতে গেল' তাহলে সেটাকে আপনি অশ্লীল বলতেন?

: না!

: তাহলে কি লেখক ঠিক যা বলতে চাইছেন তা বলা হত?

: নিশ্চয় হত। আমরা বুঝে নিতাম।

: কেমন করে? আমি তো মনে করতে পারতাম ওরা সারারাত পাশাপাশি শুয়েই ছিল, গল্পগুজব করেছিল এবং ঘুমিয়ে পড়েছিল—

: সাহিত্যের ভাষার একটা প্রচলিত রীতি আছে—আভাসে ইঙ্গিতেই আমরা তা বুঝে নিই। ডিহিরি-অন-শোনে ঝড়ের রাত্রের যে বর্ণনা শরৎচন্দ্র দিয়েছেন তাতে বোঝা গিয়েছিল অচলা আর সুরেশ সে রাত্রে পাশাপাশি শুধু শুয়েই থাকেনি!

: মানলাম না। সেটা আপনি বুঝেছেন—আপনি বাঙলা অনার্সের ছাত্রী বলে। সাধারণ পাঠক হয়তো তা বুঝবে না। বুঝিয়ে বলতে আপত্তি কোথায়? বাক্ অর্থ সংপৃক্ত হলে ক্ষতি কি? যা বলতে চাই তা খোলাখুলি বলতে দোষ কি?

: দোষ কিছুই নেই, যতক্ষণ না আপনি ঐ অশ্লীল শব্দগুলো ব্যবহার করছেন।

: অশ্লীল শব্দ! কোন শব্দটা অশ্লীল, কোনটা নয় তা কেমন করে বুঝব?

: অনেক উপায় আছে। একটা সহজ পথ বলি—যে শব্দটা ঐ জাতের অশ্লীল তা আপনি কোন অভিধানে পাবেন না।

: আই সী! অর্থাৎ আপনার মতে অভিধানে যে শব্দ নেই তা অশ্লীল?

: হ্যাঁ, তাই। অভিধানে নেই, অথচ অর্থ বোঝা যাচ্ছে—বুঝতে হবে সেটি অশ্লীল শব্দ।

: লুই ক্যারল 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে' একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন অ্যালিসের বিস্ময় বোঝাতে—'কিউরিয়সার অ্যাণ্ড কিউরিয়সার'! শব্দটা অভিধানে নেই, অথচ অর্থ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। শব্দটা অশ্লীল?

: না! ও শব্দটা লেখক ব্যবহার করেছেন একটা কমিক এফেক্ট দিতে। কমিক

এফেক্ট দিতে অনেক লেখক অমন অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেন, ব্যাকরণ না মেনে—যেন, "হাঁস ছিল সজারু, ব্যাকরণ মানি না হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।" এখানে 'হাঁসজারু' শব্দটা অর্থবহ, যদিও তা অভিধানে নেই। তার মানে 'হাঁসজারু' অশ্লীল নয়।

: একজ্যাক্টলি! তবে শুধু 'কমিক এফেক্ট' দিতেই নয়। অসংখ্য কারণে লেখক বলতে পারেন, 'ব্যাকরণ মানি না'! সেক্সপীয়র তাঁর নায়কের অন্তরবেদনার তীব্রতা বোঝাতে ডবল-সুপারলেটিভ ব্যবহার করেও ঐ একই কথা বলেছেন—ব্যাকরণ মানি না ; লিখেছেন 'This is the most unkindest cut of all!' লুই ক্যারল হাসাতে, সেক্সপীয়র কাঁদাতে যদি ব্যাকরণ আর অভিধানকে অস্বীকার করতে পারেন তখন তৃতীয় একজন লেখক অন্য কোন প্রয়োজনে অভিধান বহির্ভূত শব্দ কেন ব্যবহার করতে পারবেন না—যতক্ষণ সেটা অর্থবহ?

: অর্থবহ না অনর্থবহ?

আদালতে হাস্যরোল ওঠে। জাস্টিস সেনশর্মা হাতুড়িটা ঠোকেন। ভাস্কর বলে, মিসেস সেন, একটা কথা বলুন—লেখকের মূল উদ্দেশ্যটা কী? কোন একটা কথা, একটা ধারণা, একটা বিষয়বস্তু তিনি পাঠককে জানাতে চান। যেটা জন্ম নিয়েছে তাঁর মস্তিষ্কে অথবা হৃদয়ে সেটা তিনি পাঠককে জ্ঞাপন করতে চান। তার বাহন হচ্ছে ভাষা। যা শব্দ দিয়ে গড়া। প্রতিটি শব্দ অর্থবহ—তা পাঠক লেখক দুজনেই জানেন। অভিধানে থাক বা না থাক শব্দের অর্থ যদি পাঠকের জানা থাকে তাহলে সেটা ব্যবহার করায় লেখকের উদ্দেশ্য সফল। অভিধানে 'ক্রন্দসী' শব্দটা আছে, আপনার আণ্ডারলাইন করা শব্দটা নেই ; কিন্তু আমি যদি বলি বাঙলাদেশের শতকরা আশিভাগ প্রাপ্তবয়স্ক লোক—পুরুষ এবং রমণী—ঐ তথাকথিত অশ্লীল শব্দটার অর্থ নির্ভুলভাবে জানে, যদিও তা অভিধানে নেই এবং 'ক্রন্দসী' শব্দটার অর্থ দু-আনা শিক্ষিত বাঙালী নির্ভুল বলতে পারবে না, বলবে—'রোরুদ্যমানা', যদিও প্রকৃত অর্থটা অভিধানে লেখা আছে—তাহলে কি আমি ভুল বলছি?

: আমি জানি না আপনি ভুল বলছেন কিনা, আমি শুধু জানি ঐ সব অশ্লীল শব্দ, ইংরাজীতে যাকে বলে 'ফোর লেটার্ড ওয়র্ডস' তা ছাপার অক্ষরে ব্যবহার করা চলবে না।

ভাস্কর হেসে বললে, আপনি চলবে না বললে কি হবে, ওগুলো চলছে, চলবে। জেমস জয়েস-এর 'ইউলিসিস্'-এর বিচারের সময় একজন বলেছিলেন, "The fourletter words which are criticized as dirty are old Saxon words known to almost all men and, I venture, to many women, and are such words as would be naturally and habitually used, I believe, by the types of folk whose life, physical and mental Joyce is seeking to desdribe." [যে চার অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দগুলিকে নোংরা অশ্লীল বলা হচ্ছে তা সবই তৎসম শব্দ যার অর্থ দেশের সব পুরুষ এবং সাহস করে বলতে পারি বহু মহিলাও জানেন! জয়েস যে জাতের চরিত্র আঁকছেন যাদের জীবন, মানসিক আর দৈহিক চিত্র আঁকছেন তাদের মুখে ঐ শব্দগুলি স্বাভাবিক—তারা ঐ শব্দগুলিতে অভ্যস্ত] আপনি কি ঐ সমালোচকের সঙ্গে একমত?

: নিশ্চয় নয়। আমি ঐ মতের দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করছি।

ভাস্কর বললে, আপনার সৌভাগ্য, আপনি আমেরিকান নন, কারণ আমেরিকায় ঐ কথা বললে আপনাকে আদালত-অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা চলত। ঐ উক্তিটি অনারেবল জাস্টিস জন উল্‌সের—'ইউলিসিস্‌' বইটাকে অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্ত করার সময় রায়দানের কালে তিনি ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। মিসেস সেন এ-কথা শোনার পরেও কি আপনি বলবেন, আপনি জাস্টিস উল্‌সের সঙ্গে একমত নন?

: হ্যাঁ, তাই বলব আমি!

ভাস্কর শ্রাগ করল। বিচারকের দিকে ফিরে বললে, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, য়োর অনার।

জাস্টিস সেনশর্মা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। নূতন সাক্ষী ডাকার আর সময় নেই। সেদিনের মত আদালত মুলতুবি থাকল বলে ঘোষণা করলেন। আগামীকাল সকাল দশটায় পুনরায় এই আদালতে অসমাপ্ত মামলার অধিবেশন হবে।

ভাস্কর কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। আদালত ক্রমে ক্রমে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ওরা তিনজনে আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ একটা ছোকরা এগিয়ে এসে ভাস্করের হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল। সলিল বলে, কি রে ওটা?

ভাস্কর চিরকুটটার উপর চোখ বুলায়। তাতে লেখা ছিল 'টুটিফ্রুটি। সন্ধ্যা সাতটা। অত্যন্ত জরুরী।"

সলিলও কাগজটা দেখেছে। বলে, কোড মেসেজ মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি?

: ব্যাপার গুরুতর। কাল বলব।

সলিল একটা চোখ ছোট করে বললে, লেখাটা মনে হচ্ছে বামাগতি! নতুন করে মোল্লাফাইং শুরু করলি নাকি?

: মোল্লাফাইং! তার মানে?

সলিল হেসে বলে, 'মোল্লাফাইং' শব্দটা অভিধানে নেই। আছে ভণ্টুর ভোকাবুলারিতে। যারা বনফুলের 'জঙ্গম' পড়েছে তারা শব্দটার অর্থ জানে, অভিধানে না থাকলেও, বুঝলি হতভাগা?

ভাস্করের এতক্ষণে মনে পড়েছে। আর একটি অভিধান বহির্ভূত বনফুলীয় শব্দ ব্যবহার করে বললে, 'লদ্‌কালদ্‌কি' বন্ধ কর! প্রদীপকে ডাক। চল যাওয়া যাক।

## একুশ

'টুটিফ্রুটি। সন্ধ্যা সাতটা। অত্যন্ত জরুরী।"

চিরকুটখানা টেবিলে অ্যাশট্রেতে চাপা দিয়ে ভাস্কর বসেছিল প্রতীক্ষায়। মিনিট পনের আগেই এসেছে সে। বসেছে সেই চিহ্নিত টেবিলে। এক কাপ কফির অর্ডার দিয়েছে। দেহ মন দুই-ই অত্যন্ত ক্লান্ত। সারা দিন আদালতে ধকল তো কম যায়নি। তাই বা কেন? সকাল থেকেই আজ ঝোড়ো হাওয়া বইছে। আদালতে আসার আগে একপ্রস্থ হয়ে গেছে পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সঙ্গে। শিবনাথ নিদান হেঁকেছেন, ভাস্কর গোল্লায় যাবে, উচ্ছন্নে যাবে, না খেতে পেয়ে মরবে একদিন। বাপের পরামর্শ না শুনলে যা হয়

আর কি। সুখে থাকতে ভূতের কীল খাবার সখ! মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র কোম্পানীকে মোচড় মেরে মাইনে বাড়াতে বাধ্য করলি, ভালই করলি—কিন্তু সময়ে থামতে হবে তো? ছেলেটা তা জানে না। সখ হয়েছে সওয়াল করবে! আদালত কক্ষে হিরো হবার সাধ! আরে আদালতে সওয়াল করা কি ঐ সিনেমায় উত্তমকুমার যেমনভাবে করে তেমনটি? কিন্তু কে শুনবে এ কথা? কে বুঝবে?

না, ভাস্কর শোনেনি। ভাস্কর বোঝেনি। পিতার অভিশাপ মাথায় নিয়েই সে এসেছিল নগর দায়রা আদালতে—জীবনে প্রথম সওয়াল করতে। তা প্রথম দিনের হিসাবে খেলটা সে মন্দ দেখায়নি। সলিল এই প্রথম মামলাটা পরিচালনা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে ওর উপর। ভালই করেছে। সলিল অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা রসোত্তীর্ণ সাহিত্য। না সলিল, না তার বউ। প্রফেশনাল কারণে সে শুধু পিছন থেকে মদৎ দিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ভাস্কর একাই লড়বে। তাই লড়ছে সে। নির্মলের জোরালো হাতের প্রত্যেকটি সার্ভিস সে ফিরিয়ে দিয়েছে ওর কোর্টে। ভাস্করই বরং অটল ছিল আজ, নির্মল ছোটাছুটি করেছে নেট থেকে বাউণ্ডারি লাইন। ভাস্করের বিশ্বাস আজ একটা পয়েন্টও পায়নি নির্মল তার সার্ভিস থেকে। কিন্তু ওখানেই তো খেলার শেষ নয়। কাল যে রেফারি তাকে বলবে সার্ভিস করতে। ওর হাতে বল কই? একটাও সাক্ষী সে এখনও খাড়া করতে পারেনি। মুষ্টিমেয় যে কজন এখনও পর্যন্ত বলেছে যে, বইটি তাদের ভাল লেগেছে, অশ্লীল বলে মনে হয়নি, তাদের কাউকে সাক্ষীর মঞ্চে তোলা যাবে না। প্রকাশ কর, সলিল এবং প্রদীপ রোজই দু-একজনের নাম করেছে, কিন্তু কাউকেই ভাস্করের মনে ধরছে না। ওর তূণ একেবারে খালি। ক্রমাগত আত্মরক্ষাত্মক লড়াই চালিয়ে গেলে খেলা জেতা যায় না! কিন্তু কী করতে পারে সে? লেখক অপ্রকাশ যে একেবারেই গুপ্ত, এবং লেখক গুপ্ত একেবারেই অপ্রকাশ। কোন সূত্রই তিনি রেখে যাননি। অন্ততঃ আবদুল রেজ্জাক যদি সেই চিঠিগুলো ওকে দিত—ভাস্করের দৃঢ় বিশ্বাস—সে এমন কিছু অস্ত্র পেত যা দিয়ে লড়া যায়। আবদুল তা দেয়নি।

সারাদিনের ক্লান্তিতে দু হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল ভাস্কর আর মনে মনে বলছিল, অপ্রকাশ! তুমি প্রকাশিত হও! বল—কেন তুমি লিখেছিলে অমন একখানা বই!

একটা শব্দ হতেই ভাস্কর মুখ থেকে হাতটা সরায়। দেখে অপ্রকাশ নয়, তার বদলে অন্তরা এসে বসেছে সামনের চেয়ারটায়। বলছে, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, নয়?

ভাস্কর হেসে বললে, কী খাবেন বলুন?

: সে তো আগেই বলেছি। টুটিফ্রুটি!

: তাহলে আপনি তাই খান, আমি কফির অর্ডার দিয়েছি।

: না। তাহলে আমারও কফি আসুক। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন? কফি এবং স্ন্যাকস-এর অর্ডার দিয়ে ভাস্কর বললে, এবার বলুন, জরুরী ব্যাপারটা কী?

: বলছি। তার আগে আমার একটা কৌতূহল চরিতার্থ করবেন?

: বলুন?

: আপনি রেবা সেনকে ঐ বইটা কেন পড়তে দিয়েছিলেন?

আদালত হলে ভাস্কর আপত্তি তুলত; বলত, এটা 'লীডিং কোশ্চেন'।

কোয়ালিটি রেস্তোরাঁ আদালত নয়। ভাস্কর অম্লান বদনে স্বীকার করল, তাকে

প্রতিবাদী পক্ষে সাক্ষী হিসাবে চেয়েছিলাম আমি। আশা করেছিলাম, রেবা বইটার মর্ম বুঝবে!

: রেবা দেবীকে আপনি 'তুমি' বলে উল্লেখ করছেন। তাকে 'তুমি'ই বলতেন বুঝি?

: সে নিজে থেকেই তাই বলতে বলেছিল।—একটু থেমে বললে, আপনাকেও 'তুমি' বলতে পারি, যদি আপনি অনুমতি দেন।

: দিলাম না। এবার কাজের কথায় আসি। শুনুন। সেদিন স্বীকার করিনি, আজ বাধ্য হয়ে করছি—মনোহর কানোরিয়া জিনিসটাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার সংসারে স্বৈরাচারী, কারও পরামর্শ শোনেন না। তিনি সুখেনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাকে বাধ্য করেছেন এ মামলায় সাক্ষী দিতে। পুলিস নাকি,—নাকিই বা কেন, আমার সামনেই কথা দিয়েছে—সুখেন যদি এই মামলায় তার সাক্ষ্যে বলে যে ও বইটা পড়েই—

: আমি জানি। তা সুখেনেরই বা আপত্তি কেন? সে একটা বিশ্রী কেস-এ ফেঁসেছে। উদ্ধার পেতে হলে পুলিসকে খুশি রাখতে হবে, সেক্ষেত্রে—বাই দ্য ওয়ে—ডরোথি কাপুরের অবস্থা কি?

: এখনও তাঁর জ্ঞান হয়নি। বেঁচে আছে। শুনুন, সুখেনের প্রচণ্ড আপত্তি এই মামলায় সাক্ষী দিতে। বলেছে, তাকে জোর করে পাঠালে সে তার আগেই সুইসাইড করবে। সর্বসমক্ষেই বলেছে। মনোহর কানোরিয়া ধরে নিয়েছেন যে সেটা কথার কথা। সে যে ইতিপূর্বেই একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল তা উনি আজও জানেন না। বিশেষ কারণে আমি বলতে পারিনি।

ভাস্কর গম্ভীর হয়ে বললে, একবার নয়, অন্তরা দেবী। দু'বার।

: দু'বার! কী দু'বার?

: সুখেন এবার নিয়ে দু-দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

অন্তরা স্তব্ধ বিস্ময়ে কয়েক সেকেণ্ড বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। তারপর বলে, আপনি তা কেমন করে জানলেন?

: আপনি কেমন করে জানলেন, রেবা সেনকে আমি ঐ বইটা দিতে গিয়েছিলাম?

অন্তরা স্বীকার করে, আন্দাজে। নির্মলবাবুর জেরার ধরন দেখে, রেবা দেবীর সেই নামটা আদালতে প্রকাশ করে দেবার আগ্রহ দেখে। এবার আপনি বলুন?

ভাস্কর বলে, পুলিসের যেমন চর আছে, আমাদেরও তেমনি প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগাতে হয়েছে। তারাই জানিয়েছে—গত বছর সুখেন একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, আপনি সেবার তাঁকে বাঁচান। সেবারও ঐ ডাক্তার মৈত্র সুখেনকে চিকিৎসা করেছিলেন।

: আর কি জানতে পেরেছেন আপনারা? সুখেনের সম্বন্ধে?

: আর কিছু নয়। ঐটুকুই। কেন? আরও কিছু জানবার ছিল নাকি!

সে কথার জবাব না দিয়ে অন্তরা বলে, আপনি সেই প্রথমবার আত্মহত্যার প্রসঙ্গও কি আদালতে তুলবেন?

: তুলতেই হবে।

হঠাৎ অন্তরা কাতর স্বরে বলে ওঠে, ভাস্করবাবু, এ আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এটা আপনি করবেন না—প্লীজ!

: অন্তরা দেবী, মাফ করবেন; আমি নিরুপায়। কিন্তু একটা জিনিস আমি এখনও

বুঝে উঠতে পারছি না। সুখেনের মানসিক অবস্থাটা আমি বুঝছি; কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে তার এত আপত্তিই বা কেন? তার অপরাধের কথা তো সবাই জানে। তাহলে এটা তার কাছে এমন মরণ-বাঁচনের ব্যাপার মনে হচ্ছে কেন?

অন্তরা সংযত হয়। ধূমায়িত কফির কাপটার ভিতর সে তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল —ভাস্করকে কতটা বলা যায়। শেষ পর্যন্ত সে মনস্থির করে বললে, সেইটেই আজকে আমার জরুরী কথা। আমি জানি, আপনার হৃদয় আছে, আপনি শুধু উকিল নন, আপনি মানুষ। তাই আপনার কাছে একটি ভিক্ষা চাইতে এসেছি। সুখেন নির্মল নিয়োগীকে ভয় পাচ্ছে না, সে ঘাবড়াচ্ছে আপনার কথা ভেবে। প্রসিকিউশান কাউন্সেল আর যাই করুক তাকে বে-ইজ্জত করবে না; কিন্তু আপনি আপনার ভাষায় 'তাকে ছিঁড়ে খাবেন!' তাই নয়?

: অন্তরা দেবী, ক্রস্-এগজামিনেশান জিনিসটা সাক্ষীর কাছে কোন কালেই উপাদেয় নয়। সুখেনের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি যতদূর সম্ভব কম নির্দয় হব। তবু তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে কিছুটা নির্দয় হতে হবে বৈকি!

: কিন্তু আপনি তো ইচ্ছা করলে ওকে জেরা নাও করতে পারেন?

: তা হয় না। নির্মলবাবু যদি ওকে আদালতে না তোলেন, তবে আমি নিজে থেকে ওকে সমন ধরাবো না; কিন্তু সে যদি বাদীপক্ষের হয়ে সাক্ষী দিতে একবার দাঁড়ায় তবে তাকে জেরা না করে আমি ছেড়েও দিতে পারি না।

: পারি না মানে কি। আইনত সে অধিকার আপনার নিশ্চয় আছে—কোন সাক্ষীকে ক্রস্-এগজামিন না করে এড়িয়ে যাওয়া?

: আইনত সে অধিকার আমার নিশ্চয় আছে, কিন্তু—

হঠাৎ অন্তরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ভাস্করের হাতটা তুলে নিয়ে দু'হাতে চেপে ধরে। বলে, আমি—আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি ভাস্কর! মিনতি করছি—

ভাস্কর ধীরে ধীরে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারে না। তারপর গম্ভীর স্বরে বলে, অন্তরা, তা হয় না, হতে পারে না। তুমি যা চাইছ, তা তো আমার সম্পদ নয়, আমি যে প্রদীপের কাছে সত্যবদ্ধ! আমি তার স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখব না বলে অঙ্গীকার করেছি। এই আমার জীবনের প্রথম কেস—এ কেস-এ আমি হারব; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে লড়ে দেখতে হবে। তুমি যদি কবচ-কুণ্ডল চাইতে অন্তরা, তাহলে যুদ্ধের এই অন্তিম পর্যায়ে তাই আমি তোমাকে দিতাম; কিন্তু তুমি যে চাইছ আমার পৌরুষ, আমার ধর্ম।

অন্তরা ম্লান হয়ে গেল। কথা যোগালো না তার মুখে।

আবেগদীপ্ত স্বরে ভাস্কর আরও বলে, তোমাকে আরও খোলাখুলি বলি অন্তরা—তুমি যে ভাবে, যে ভাষায় আমার কাছে এ মিনতি জানিয়েছ তারপর তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে তা তোমাকে কেমন করে বোঝাব? এই মুহূর্তে আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দিতে পারি; কিন্তু জ্ঞাতসারে আমি কি করে আমার মক্কেলকে পিছন থেকে ছুরি মারব বল? যদি এ মামলায় আমার একটা কোন অস্ত্র থাকত—একটা প্রমাণ, একটা নথী, একটা সাক্ষী—যে আমাকে সাহায্য করত, তাহলে—

: কী জাতীয় সাক্ষী পেলে তুমি রাজী হও?

: কী জাতীয় সাক্ষী মানে? যে আমাকে সাহায্য করতে পারে আমার ডিফেন্স। যে

ঐ বইটার প্রকৃত উৎসমুখের কথা শোনাতে পারে, অপ্রকাশ গুপ্তের সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দিতে পারে, কিংবা—

: সে কে? তেমন লোক কে হতে পারে?

: আমি জানি না। আমি আকাশকুসুম চাইছি না। তা চাইলে আমি বলতে পারতাম অপ্রকাশ গুপ্ত যেহেতু মৃত আমি সবচেয়ে খুশী হতাম 'তটিনীদেবী'কে সাক্ষী হিসাবে হাজির করতে পারলে! যাঁর সম্বন্ধে অপ্রকাশ গুপ্ত লিখেছেন—তিনি সুযোগ পেলে দ্বিতীয় দেবী চৌধুরাণী, দ্বিতীয় জোয়ান-অব-আর্ক অথবা দ্বিতীয় প্রীতি ওয়াদ্দেদার হতে পারতেন! কিন্তু আমি তো আর পাগল নই!

: তাঁকে যদি পেতে তাহলে সুখেনকে ছেড়ে দিতে?

ভাস্কর হেসে ফেলে। বলে, এ অবান্তর আলাপের কোন মানে হয়?

: মানে হোক বা না হোক আমার কৌতূহলটা মেটাও। তাঁকে পেলে তুমি সুখেনকে ছেড়ে দিতে?

ভাস্কর হেসে বললে, তবে মেটাও তোমার কৌতূহল। দিতাম।

অন্তরা আবার চেপে ধরে ওর হাত দুটো। বলে, কথা দিলে কিন্তু।

: মানে?—ভাস্কর বুঝে উঠতে পারে না অন্তরা কী বলতে চাইছে।

: ভিক্ষা নয়! এবার দান-প্রতিদান! তুমি কথা দাও সুখেনকে ক্রস্-এগজামিন করবে না; আমি কথা দিচ্ছি—অপ্রকাশ গুপ্তের মানসী প্রতিমা—তটিনীকে সশরীরে হাজির করে দেব!

ভাস্কর বজ্রাহত!

## বাইশ

'হাতের পাখিটা গাছের ডালে বসা দুটো পাখির সমান।' তা তো বটেই। দুনিয়ার তাবৎ সংসারাভিজ্ঞ প্রাজ্ঞজন একথা যুগে যুগে বলে গেছেন—ঈশপ থেকে বিশপকুল, পঞ্চতন্ত্র থেকে পাড়ার পঞ্চ মোড়ল : যো ধ্রুবানি পরিত্যাজ্য—

ভাস্কর তা জানে। চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ানো ঐ আতঙ্ক-তাড়িত প্রায়-কিশোর সুখেন কানোরিয়াকে। চোঙা প্যান্ট, সূচালো জুতো, টেরিলিনের স্ট্রাইপড্ ফুলস্লীভস্ শার্ট-পরা লিকলিকে ফর্সা ছেলেটিকে। বিট্‌লদের মত একমাথা এলোমেলো রুক্ষ চুল, সরু গোঁফ আর বিহ্বল একজোড়া চোখ। জিব দিয়ে বারে বারে নিচেকার ঠোঁটটা চাটছে। সুখেন কানোরিয়া—একটি অশ্লীল বই পড়ে যে পাগল হয়ে ছুটে ছিল কল-গার্লের সন্ধানে—উনিশ বছরের কলেজে পড়া ছোকরা। হ্যাঁ, ঐ হচ্ছে ভাস্করের কাছে জালে আটকানো পাখি,—হাতের পাখি; যে তার ক্রস্-এগজামিনেশনের তাড়নায় স্বীকার করতে বাধ্য হবে—ঐ বইটা পড়ার জন্য নয়, অন্য কারণে সে অমন পাপ কাজে ব্রতী হয়েছিল, যে কারণে সে বার বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, যে কারণে সে আদ্যন্ত মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে।

আর অধ্রুব কি? অপ্রকাশ গুপ্তের মানসী—তটিনী। সে বেঁচে আছে কি নেই তাও খোদায় মালুম। তার অস্তিত্বটাই ঝুলছে অন্তরার একটা মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে।

: আপনার নাম?

: সুখেন কানোরিয়া।

: আপনি ছাত্র? কোথায় পড়েন?

সুখেন তার আত্মপরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। কোথায় পড়ে, কী কম্বিনেশন, বাড়িতে কে কে আছে, কী তার হবি, কী-জাতীয় বই পড়ে, কাদের সঙ্গে মেশে—

ভাস্কর কিন্তু সে প্রশ্নোত্তরে ঠিক মন দিতে পারছে না আজ। তার বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে—এক ঘণ্টা বড় জোর দেড় ঘণ্টা পরেই তাকে নিতে হবে সেই চরম সিদ্ধান্ত। ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুব, না অধ্রুবকে ছেড়ে ধ্রুব!

কাল সন্ধ্যাবেলাতে অন্তরা এই প্রস্তাবটা রেখেছে ওর সামনে। সে তো ভিক্ষা চায়নি, চেয়েছে একটা 'ডীল'—দেওয়া-নেওয়ার একটা আদান-প্রদান। সুখেন কানোরিয়াকে ছেড়ে দাও তোমাকে দিচ্ছি তটিনী দাসীকে। সবটা অন্তরা খুলে বলেনি—তবে এটুকু জানিয়েছে যে, দিন চারেক আগে সে কানোরিয়ার ডাকবাক্স থেকে একটি পোস্টকার্ড উদ্ধার করেছে। পত্রের লেখিকা তটিনী দাসী। ভাস্কর বাধা দিয়ে বলেছিল, কিন্তু তটিনী দাসী যে অপ্রকাশ বর্ণিত সেই মহিলাটিই তা তুমি বুঝলে কেমন করে? অন্তরা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক খণ্ড কাগজ বার করে দেখিয়েছিল। পোস্টকার্ডে যা লেখা ছিল তা সে আদ্যন্ত টুকে এনেছে, শুধু প্রেরকের ঠিকানাটা ছাড়া। ভাস্কর সাগ্রহে সেই কাগজখানা নিয়ে পড়েছিল :

প্রিয় মহাশয়,

আমি আপনার অপরিচিতা, আপনাকেও আমি চিনি না। সংবাদপত্রে আপনার পুত্রের বিবরণ পড়িয়া এই পত্র লিখিতেছি। আপনার ধারণা ভ্রান্ত। অপ্রকাশ গুপ্তের রচিত 'সাগর-সঙ্গমে' গ্রন্থপাঠে আপনার পুত্র ক্ষণিক উন্মাদনার বশে এই পাপ কার্যে ব্রতী হইয়াছে বলিয়া আপনি যে অনুমান করিতেছেন তাহা অসম্ভব। আমি লেখক অপ্রকাশকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম। বস্তুত আমার অনুপ্রেরণাতেই সে ঐ বইটি রচনা করে। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—বিশ্বাস করুন—অপ্রকাশ প্রকৃত জীবন-শিল্পীর মতই ঐ গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিল। সাগর-সঙ্গমে মানুষকে প্রেমের শিক্ষা দিতে চায়। অপ্রকাশ প্রাণ দিয়া সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'সাগর-সঙ্গমে' আপনার পুত্রকে কোন মতেই বিপথে চালিত করিতে পারে না। আবদুল রেজ্জাক কী জানে? সে অপ্রকাশকে চিনিতই না। আমাকে বিশ্বাস করুন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এই অশীতিপর বৃদ্ধা কেন আজ ইশ্বরের নামে শপথ করিতেছে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন। পুত্রকে ক্ষমা করুন। অপ্রকাশের আত্মাকে আঘাত করিবেন না। অপমান করিবেন না।—ইতি

তটিনী দাসী

মনের অগোচর পাপ নেই—ভাস্কর নিজের কাছে স্বীকার করবে—চিঠিখানা পড়ে একসময় তার এমন সন্দেহও হয়েছিল—অন্তরা একটা বিরাট চাল চালছে না তো? অর্থাৎ এ চিঠিখানা জাল নয় তো? অন্তরার শর্ত—আগে সুখেনের জেরা মকুব করতে হবে, তারপর সে ঠিকানা সমেত তটিনীর ঐ মূল চিঠিটা ভাস্করকে হস্তান্তরিত করবে। কিন্তু! ভাস্করের সঙ্গে অন্তরার পরিচয় এক সপ্তাহের—সুখেনকে সে মায়ের মতো ভালবাসে। তাছাড়া আরও একটা কথা—হাতের লেখা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ভাষা? তটিনী হাজার হলেও একজন গণিকা। ঢাকার এক নিষিদ্ধ পল্লীতে তার জীবনের আদিপর্ব কেটেছে—লেখাপড়া সে নিশ্চয় শেখেনি। সে কি সত্যই স্বহস্তে ঐ ভাষায়

চিঠি লিখতে সক্ষম? ভাস্কর কি ভুল করছে? দুদিন আগে রেবা সেনের কাছেও সে কি এই রকম ভুল করে আঘাত পায়নি? বোকা বনে যাবে নাকি শেষে?

: বইটা আপনি তাহলে কখন পড়লেন?

: ঘটনার দিন দুপুরে। ক্লাস পালিয়ে।

: এ জাতীয় অশ্লীল বই আপনি আগে কখনও পড়েছেন?

: না।

: অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত কোন বাঙলা বা ইংরাজি বই আপনি পড়েছেন?

: আমার মনে পড়ে না।

: তাহলে এ বইখানি পড়লেন কেন?

: প্রাক-প্রকাশ বিজ্ঞাপন পড়ে আমার কৌতূহল হয়েছিল।

সলিল লাহিড়ী ওপাশ থেকে একটা কাগজে কি যেন লিখে ভাস্করের হাতে গুঁজে দিল। ভাস্কর দেখল চিরকুটটায় লেখা আছে 'ভাস্কর! খেয়াল করেছিস নিশ্চয়, নির্মল নিয়োগী ওকে প্রশ্ন করেনি—বইটা ও কোথায় পেল। ক্রস্-এগজামিনেশনে এটা জিজ্ঞাসা করবি। টুকে রাখ। ছেলেটাকে ঝেড়ে প্যান্ট পরাতে হবে কোর্টের ভিতর।'

ভাস্কর কাগজটা পকেটে রেখে দেয়। সওয়াল-জবাবে ওর মন নেই। ও শুধু ভাবছে: ধ্রুব না অধ্রুব? সংসারভিজ্ঞ লোকের নির্দেশ সবাই যদি মেনে চলত তাহলে এই দুনিয়ার ইতিহাসটা অন্য রকমভাবে লেখা হত। বুদ্ধদেব তাহলে শাক্যবংশের রাজসিংহাসন অলংকৃত করতেন, কলোম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করতেন না, সুভাষ বোস আই. সি. এস. চাকরিতে আজ হয়তো পেনসন পেতেন—এবং হ্যাঁ, ভাস্কর মুখার্জি হয়তো মিত্র অ্যাণ্ড মিত্র কোম্পানির সিনিয়ার পার্টনার হত একদিন। সুতরাং ধ্রুব না অধ্রুব?

বিচার করে দেখা যাক।

ধ্রুবের পক্ষে যুক্তি :—এক নম্বর—সাগর-সঙ্গমে বইটাই যে সুখেনকে এমন একটা পাপ কাজে প্ররোচিত করেনি এটা প্রমাণ করতে হলে সুখেনকে জেরা করতেই হবে। তাকে জেরা না-করার অর্থ সে অভিযোগ মেনে নেওয়া। দু নম্বর—তটিনীর চিঠিখানা আদৌ জাল কিনা কে জানে? মূল পোস্টকার্ডটা সে দেখেনি, কিন্তু ভাষা পড়ে তার মনে সন্দেহ জেগেছে। ভাস্কর ঘরপোড়া গরু! গত সপ্তাহেই সে ছলনাময়ী রেবা সেনকে বিশ্বাস করে ঠকেছে, এবার অন্তরাকে বিশ্বাস করে ঠকবে না তো? তিন নম্বর—চিঠিখানা যদি জাল না হয় তাহলে তার অর্থ কি? অপ্রকাশের এতবড় হিতৈষী সংবাদপত্র পড়ে কেন তাকে চিঠি লিখল না, তাকে অথবা প্রকাশক প্রদীপ পাত্রকে; কিংবা আসামী বিজয় ভট্টাচার্যের ঠিকানায়? সে চুপচাপ বসে আছে কি করে? আর তাই যদি সে থাকতে চায় তবে মনোহর কানোরিয়াকেই বা সে চিঠি লিখবে কেন? চার নম্বর—ধরা যাক তটিনী জীবিতা, তার সন্ধান পাওয়া গেল। তাকে সাক্ষীর মঞ্চে তোলাও গেল—কিন্তু সেই প্রাক্তন গণিকার সাক্ষীর কতটুকু মূল্য দেবেন বিচারক?

অধ্রুবের পক্ষে : এমনও তো হতে পারে যে তটিনীর কাছে রয়ে গেছে অপ্রকাশের একবাণ্ডিল প্রেমপত্র! অথবা তাঁর দিন-পঞ্জিকা! হয়তো ডায়েরি লিখতেন অপ্রকাশ, যার জীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে লেখকের পুনর্জন্ম সম্ভব—যাকে বলে 'রেজারেকশান'। কী উদ্দেশ্যে তিনি ঐ গ্রন্থটি লিখেছিলেন তা হয়তো এবার জানা যাবে সে সব ডায়েরি

পড়ে। অথবা হয়তো অপ্রকাশের জীবনের অনুদ্‌ঘাটিত অধ্যায় জানাতে পারবেন তটিনী। অপ্রকাশ মদ্যপ ছিলেন? বেশ তো, গিরীশ ঘোষ, মাইকেল কিংবা শিশির ভাদুড়িকে কি আমরা ঐ অপরাধে অশ্রদ্ধেয় করতে পেরেছি? কে জানে অপ্রকাশের বঞ্চনার ইতিহাসটা কী জাতের?

: মনে করতে পারছেন না মানে? ঘরে ঢোকার পর থেকে বেরিয়ে আসার মধ্যে কি কি ঘটল তা কিছুই আপনার মনে নেই?

: না নেই।

: এটা কেমন করে সম্ভব?

: তা আমি কেমন করে জানব? আমার কিছু মনে পড়ছে না। এটুকু শুধু মনে আছে ঘরের চাবিটা মেয়েটা যখন দেবে না বলল, তখন আমি তাকে ধাক্কা মেরেছিলাম। ও পড়ে গেল। তারপর বালিশের তলা থেকে চাবিটা খুঁজে পেয়ে আমি দরজা খুলে বেরিয়ে আসি!

: কিন্তু পুলিসের কাছে সে রাত্রে আপনি বলেছিলেন যে, শর্ত অনুযায়ী টাকা আপনি তাকে দিয়েছিলেন। তার মানে ইয়ু মাস্ট হ্যাভ এঞ্জয়েড—

ভাস্করের মনটা আজ বারে বারে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বা রে দেশের আইন! যে কথা ছাপার অক্ষরে লিখলে অশ্লীলতার দায়ে তুমি দায়ী হবে তা এক আদালত লোকের সামনে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় অপরাধ হয় না!

কী যেন ভাবছিল ভাস্কর?—হ্যাঁ, ধ্রুব, না অধ্রুব! সুখেন, না তটিনী! অন্তরা কথা দিয়েছে—আজ যদি সে সুখেনকে ক্রস্‌-এগজামিন না করে মুক্তি দেয় তাহলে সন্ধ্যা ছয়টায় সে ভাস্করের অফিসে এসে সেই পোস্টকার্ডখানা হস্তান্তরিত করবে। অন্তরা আরও বলেছে তটিনী এখন কলকাতায় নেই—ভাস্করকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে। যাতায়াতে দিন দুই লাগবে—তাতে ক্ষতি নেই—আদালতেও দুদিন শুনানি বন্ধ। আজ সোমবার, আবার বৃহস্পতিবারে আদালত বসবে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল প্রতিবাদীর 'স্টার উইটনেস' সেদিন উঠে দাঁড়াবে সাক্ষীর মঞ্চে—অপ্রকাশ গুপ্তের মানসীপ্রতিমা, সশরীরে! অবশ্য ও যদি ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের দিকেই ধাবিত হয়। প্রদীপ অথবা সলিলকে সাহস করে এসব কথা ভাস্কর বলেনি। বলেনি এজন্য যে, তারা ওকে কোন সাহায্য করতে পারবে না! তারা এক কথায় পরামর্শ দেবে : 'মরবি! মরবি! হাতের কাছে যা পাচ্ছিস তাই নিয়েই লড়ে যা!' তা তো ওরা বলবেই—ওরা তো শোনেনি অন্তরার সেই অনুরাগঘন আর্তি! ওদের হাত তো পায়নি অন্তরার ঘামে-ভেজা নরম মুঠির স্পর্শ!

: আপনি তাহলে স্বীকার করছেন, ঐ সাগর-সঙ্গমে বইটি পড়েই আপনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এ কাজ করেছেন?

: স্বীকার করছি।

: আপনি কি আপনার কৃতকার্যের জন্যে অনুতপ্ত?

সুখেন মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ল।

নির্মল বললে, আপনি মাথা নাড়লে চলবে না। মুখে স্বীকার করুন।

: হ্যাঁ। আমি অনুতপ্ত।

: শুধু ডরোথি কাপুরের প্রতি ব্যবহারটাই নয়, অমন একখানা অশ্লীল বই পড়ার জন্যও অনুতপ্ত?

সলিল ভাস্করকে খোঁচা মারে। ভাস্কর কিন্তু প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে না। সে বুঝতে পারছে—বাদীপক্ষের সওয়াল শেষ হয়ে এসেছে। আর তিন চার মিনিটের ভিতরেই তাকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল—দর্শকের আসনে বসে আছে অন্তরা। সে সাক্ষীকে দেখছে না, নির্মলকে দেখছে না, দেখছে ভাস্করকে। একদৃষ্টে।

: হ্যাঁ, আমি অনুতপ্ত।

: আপনি চান ঐ বইটার প্রচার বন্ধ হোক? ওটা বাজেয়াপ্ত হোক?

: হ্যাঁ, তাই চাই আমি।

নির্মল বিচারকের দিকে ফিরে বললে, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। নির্মল বসে পড়ে। সলিল ভাস্করের কানে কানে শুধু বললে : ফায়ার!!

ধ্রুব না অধ্রুব? সিদ্ধান্ত নেবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

জাস্টিস সেনশর্মা ভাস্করের দিকে ফিরে বললেন, ইয়েস। ইটস্ য়োর টার্ন নাউ!

ভাস্কর উঠে দাঁড়াল। গলা খাঁকারি দিল। গলার কালারটা একটু আলগা করে দিল। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বললে, য়োর অনার! প্রতিবাদীর কোন জিজ্ঞাস্য নেই!

ভাস্কর স্পষ্ট দেখতে পেল জাস্টিস সেনশর্মা নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, মিস্টার মুখার্জি, আপনি কি বলতে চাইছেন, এ পর্যায়ে আপনি ক্রস্-এগজামিনেসানটা মুলতুবি রাখতে চান?

: নো, য়োর অনার! আই মীন, হোয়াট আই সে! প্রতিবাদী ঐ সাক্ষীকে আদৌ জেরা করতে চান না। পার্মানেণ্টলি!

আদালতে একটা মৃদু গুঞ্জন। ভাস্কর অনুভব করল তার বাহুমূল কেউ দৃঢ় হাতে চেপে ধরেছে—হয় প্রদীপ, নয় সলিল—ও জানে না। ও ঘাড় ঘুরিয়ে সেটা দেখেনি। ও শুধু দেখছিল দর্শকের আসনে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে জল চিকচিক করছে। সকলের অলক্ষ্যে সে ঘাড় নাড়ল। ধীরপদে বেরিয়ে গেল আদালত ছেড়ে।

ভাস্কর সংবিৎ ফিরে পেয়ে শুনল বিচারক মধ্যাহ্নবিরতি ঘোষণা করছেন।

আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসাই কি সহজ? চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে কৌতূহলী দর্শকদল, আর সাংবাদিকেরা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, প্রশ্নের বন্যা! এমন কাজ কেন করল সে? কেন জেরায় জেরায় শেষ করে দিল না ঐ ধনীর দুলালটিকে—যে স্পষ্টত মিথ্যার পাহাড় বানিয়ে তুলেছে, যে পুলিসের শেখানো মত জবানবন্দি দিয়ে গেল এতক্ষণ। এমন সাক্ষীকে তুলোধোনা না-করার নজির কেন সৃষ্টি করল ভাস্কর মুখার্জি—এতক্ষণ যে ছিল আদালতের হিরো?

: নো কমেণ্ট, নো কমেণ্ট, নো কমেণ্ট—কোন বক্তব্য নেই।

ভীড় ঠেলে ঠেলে ওরা এগিয়ে আসছে। প্রদীপ বা সলিল এ পর্যন্ত কোন প্রশ্ন করেনি তাকে। করবার পরিবেশ ছিল না। ওর ডান বাহুমূল তখনও বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে সলিল লাহিড়ী।

গাড়িতে উঠতে যাবে, আবার সাংবাদিকের দল। ভাস্কর কঠিনস্বরে বলে, কেন বারবার বিরক্ত করছেন? বলছি তো—আই হ্যাভ নো কমেণ্টস্!

একজন স্যুট-পরা সাংবাদিক এগিয়ে এসে বললে, শুনুন মশাই! আপনার না থাকলেও আমাদের 'কমেণ্টস্‌টা' শুনে যান। কালকের কাগজে যা আমরা ছাপব!

জীমূতবাহন প্রসিকিউশানকেই তাঁর প্রভাব খাটিয়ে কিনেছিলেন বলে এতদিন জানতাম, আজ আমরা জানলাম 'ডিফেন্স'কেও তিনি কিনে ফেলেছেন টাকা দিয়ে! এ-কথা শোনার পর কি আপনার কোনও বক্তব্য আছে?

এ-কথায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভাস্কর ; কিন্তু তার জবাব দেওয়া হল না। তার আগেই প্রদীপ ওকে একটা হ্যাঁচকা টান মারল। বললে, আদালতের ভিতরে হাতাহাতিটা আর নাই করলি ভাস্কর।

## তেইশ

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে সলিল এসে বসল তার চেয়ারে। ভাস্করের দিকে ফিরে বললে, এবার বল।

ভাস্কর লক্ষ্য করে দেখল ঘরে ওরা মাত্র তিনজন। ও, প্রদীপ আর সলিল। হ্যাঁ, এখন কৈফিয়ৎ দেবার সময় হয়েছে তার। প্রদীপ এ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। একটা সিগ্রেট সে ঠোঁটে ধরে আছে। দেশলাই আর কাঠি তার দু হাতে। জ্বালাবারও সময় নেই যেন—এতই উদ্‌গ্রীব সে।

ভাস্কর বললে, কৈফিয়ৎ তোরা দাবী করতে পারিস। আলবৎ! আমার একটা মাত্র কৈফিয়ৎ আছে—আমি একটা 'ডীল' করেছি। দেওয়া-নেওয়া। আমি সুখেনকে ছেড়ে দিয়েছি তটিনীদেবীকে সাক্ষী হিসাবে পাব বলে।

: তটিনীদেবী! মানে! সাগর-সঙ্গমের সেই নায়িকা? সে বাস্তব? বেঁচে আছে?

: আছে। বেঁচে আছে, ভারতবর্ষে আছে। তাকে আমরা প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষী হিসাবে পাব। শর্ত ছিল বিনিময়ে সুখেনকে ছেড়ে দিতে হবে। তাই দিয়েছি আমি!

প্রদীপ লাফিয়ে ওঠে, বলিস কি রে! তটিনীদেবী বেঁচে আছেন? বয়স কত হবে? আশির কাছাকাছি। সাক্ষী দিতে রাজী?

সলিল ওকে এক দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দেয়। বলে, তুই থাম। ঠিক আছে, ভাস্কর, বুঝলাম। নাকের বদলে তুই নরুণ পেয়েছিস কিন্তু টাকডুমা-ডুম বাজাবার আগে আমাকে বল কার সঙ্গে তুই এ চুক্তি করলি, কখন?

: কাল সন্ধ্যায়। সুখেনের মাসি অন্তরা দেবীর সঙ্গে।

সলিল গম্ভীর হয়ে বললে, আমিও তাই আশঙ্কা করছিলাম। মোল্লাফাইং।

ভাস্কর চটে ওঠে, সব সময় তোর রসিকতা ভাল লাগে না সলিল!

: রসিকতা নয় বন্ধু! এ আমার মর্মান্তিক আর্তনাদ! তুই মরেছিস। শুধু নিজে মরিসনি, আমাকে আর প্রদীপকও মেরেছিস।

: তার মানে। কী বলতে চাইছিস তুই?

: তার মানে এই—তুই অন্তরার ফাঁদে পা দিয়েছিস! আমি বুঝতে পারছি কী হয়েছে। তটিনীকে তুই স্বচক্ষে দেখিসনি, সে সত্যি বেঁচে আছে কি না প্রমাণ পাসনি, শুধু মাত্র বঁড়শির চারটাকে দেখে চোখ বুজে টোপ গিলেছিস।

ভাস্কর জবাব দেয় না। দিতে পারে না।

প্রদীপ একটু ঘাবড়ে যায়। বলে, আনুপূর্বিক সব খুলে বলবি?

ভাস্কর সব কিছু খুলে বলে। গতকাল তার সঙ্গে অন্তরার যে-কথা হয়েছিল। সব

কথা শুনে সলিল বলে, তাহলে আজ সারাটা সকাল এ খবরটা চেপে ছিলি কেন?

: কারণ আমি জানতাম—এই লেনদেন-এর পিছনে যে আন্তরিকতা আছে, যে হার্দ্য ব্যঞ্জনাটা আছে তা তোদের বোঝাতে পারব না। তোরা প্রস্তাবটা শুধু ওপর ওপর থেকে দেখবি, এবং যেহেতু আমার চোখ দিয়ে দেখতে পারবি না, তাই নাকচ করবি।

সলিল গম্ভীরভাবে বললে, ভাস্কর তুমি ভুলে যাচ্ছ সব কিছুর দায়িত্ব তোমার একা নেবার কোন এক্তিয়ার নেই। তুমি এভাবে সবাইকে ডোবাতে পার না। ক্ষতিটা তোমার নয়, ক্ষতিটা প্রদীপ পাত্রের, বিজয় ভট্টাচার্যের, অসংখ্য পুস্তক বিক্রেতার এবং মৃত লেখক অপ্রকাশ গুপ্তের। তুমি এবং তোমার বান্ধবী টুটিফ্রুটি খেতে খেতে তোমাদের হার্দ্য-ব্যঞ্জনায়—

ভাস্করের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। প্রদীপ ওকে থামিয়ে দেয়, স্টপ ইট সলিল। ভাস্করকে বলতে দে—

ভাস্কর উঠে দাঁড়ায়। বলে, বলবার আর কিছু আমার নেই প্রদীপ। যা ঘটেছে তা সবই খুলে বলেছি আমি। ইয়েস, আই হ্যাভ টেকন এ গ্রেট রিস্ক! কিন্তু এই হচ্ছে লড়াইয়ের নিয়ম। জেনারেলকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়—তাতে যুদ্ধে জয়ও হয়, পরাজয়ও হয়। জিতলে তোদের সঙ্গেই জিতব, হারলে তোদের সঙ্গে আমারও মৃত্যু হবে।

প্রদীপ ওর হাতটা ধরে। বলে, অত সেন্টিমেন্টাল হসনে ভাস্কর। স্থির হয়ে বস! বল, এখন আমরা কী করব? তুই এখন কী করতে চাস?

সলিল গলায় বিষ ঢেলে বললে, আমি বলে দিচ্ছি প্রদীপ—ও এখন কি করবে। ও 'কোয়ালিটি'তে গিয়ে টুটিফ্রুটির অর্ডার দেবে, আর অপেক্ষা করবে—

ভাস্কর দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়েই থাকে। প্রদীপ বলে, ভুল করছিস। অন্তরা দেবী আজ সন্ধ্যা ছটার সময় আমাদের অফিসে আসবে বলেছে।

: বেশ তাই। কোয়ালিটি নয়, অফিসেই। আমি লিখে দিচ্ছি—সে আসবে না। এলেও বলবে চিঠিখানা খুঁজে পাচ্ছে না। চিঠিখানা খুঁজে পেলেও দেখা যাবে সেটা জাল—একটা ফাঁদ! অন্তরা যে ভাস্করের সঙ্গে প্রেম করছে এটা মনোহর কানোরিয়া টের পেয়ে নিজেই ঐ চিঠিখানা লিখে কোথাও ডাকে দিয়েছে!

ভাস্কর চমকে ওঠে—না, এ সম্ভাবনার কথা সে ভেবে দেখেনি। তা কি সম্ভব? অন্তরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এই বিশ্বাসেই সে ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবের পিছনে ছুটেছে; কিন্তু অন্তরা আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও তো তটিনীর হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া সম্ভব! এটা যদি মনোহর কানোরিয়ারই একটা মারাত্মক চাল হয়?

ভাস্কর সলিলের দিকে ফিরে বললে, ও-বেলা তুই অ্যাটেণ্ড কর। নির্মলবাবু সম্ভবত সেই বাঙলার অধ্যাপকটিকে হাজির করবে। তুই ক্রস্ করিস।

প্রদীপ বললে, তুই এখন তাহলে কি করবি?

: আমি অফিসে ফিরে যাব। একটু বিশ্রাম করব। চিন্তা করব।

সলিল কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রদীপ বললে, যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। ঠিক আছে। তুই বিশ্রাম কর। সলিল, ওঠ! সময় হয়ে গেছে।

ওরা আদালতে ফিরে গেল। প্রদীপ ফিরে গেল অফিসে। আদালতে সকলের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াতে পারছিল না। তার কানে শুধু বাজছিল সেই দুমুর্খ সাংবাদিকটার ব্যঙ্গোক্তি! শুধু সে নয়, ওর দুই বন্ধু ওকে কতটা বিশ্বাস করেছে তাই ও ঠিকমত বুঝে

উঠতে পারছিল না।

অফিসে নিশ্চুপ বসে রইল সারাটা দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। কোনও বইয়ে মন বসল না, কোন কাজ করল না—প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগ্রেট ধ্বংস করে সে শুধু লক্ষ্য করতে থাকে ঘড়ির কাঁটা দুটো। আদালত শেষ হলে প্রদীপ আর সলিল কি অফিসে আসবে? খোঁজ নিতে? সে কথা হয়নি। হয়তো ওরা আগে আসবে, তারপর আসবে অন্তরা; অথবা ওরা দুজন এসে দেখবে অন্তরা বসে আছে অফিসে।

পাঁচটা—সওয়া পাঁচটা—সাড়ে পাঁচটা—পৌনে ছটা। না প্রদীপ, না সলিল। বাজল ছটা। ঢং ঢং করে। ভাস্কর সোজা হয়ে উঠে বসল। অফিস বেয়ারাটা লক্ষ্য করেছে যে সারাদিন চুপচাপ বসে আছে। এখন এসে জানতে চায়, অফিস বন্ধ হবে কিনা। ভাস্কর ওকে ছুটি দিয়ে দিল। ছটা দশ, ছটা পনের, কুড়ি! ভাস্কর ঘামছে! ছটা বেজে পঁচিশে ওর মনে হল—তবে কি ফাঁদেই পা দিয়েছে সে!

সাড়ে ছটা—ছটা পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ। ভাস্কর উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালল। প্রদীপ আর সলিল তার মানে অফিসে আসবে না। কিন্তু অন্তরা? ট্র্যাফিক জ্যাম? দুর্ঘটনা? তবু কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারছে না অন্তরা ওকে ঠকিয়েছে—নিছক নাকে দড়ি পরিয়ে বাঁদর-নাচ নাচিয়েছে!

চোখ তুলে দেখল সাতটা বাজতে পাঁচ। টেলিফোনটা তুলে নিল। ডায়াল করল। রিঙিং টোন। তারপর ভারী পুরুষের কণ্ঠ : হ্যাল্লো!

: অন্তরা দেবী আছেন?

: আপনি কে কথা বলছেন?

বাধ্য হয়ে লাইন কেটে দিল ভাস্কর। সম্ভবত মনোহর কানোরিয়া স্বয়ং।

সাড়ে সাতটায় ও স্থির বুঝল অন্তরা আসবে না। তিন প্যাকেট সিগ্রেট শেষ হয়েছে। গলাটা তেতো-তেতো লাগছে। বাড়ি যাবে? সেখানে তো সেই তিক্ত পরিবেশ! শার্টটা খুলে ফেলে গা থেকে। পাখাটা ফুলস্পীডে বাড়িয়ে দেয়। বাতি এবং চোখ দুটো বন্ধ করে টেবিলে মাথা রেখে চুপ করে বসে থাকে।

হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল, তন্দ্রা-ভাবটা কেটে গেল একটা যান্ত্রিক শব্দে। টেলিফোন বাজছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভাস্কর। তুলে নেয় টেলিফোনটা : হ্যালো!

: তুমি এখনও আছ? যাক, বাঁচা গেল।

: তার মানে? তুমি এলে না কেন?

: সে অনেক কথা। অনেক ব্যাপার ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। শোন—

: কী ঘটেছে আগে বল।

: এক নম্বর, ডরোথি কাপুর মারা গেছে, দু নম্বর সুখেন নিরুদ্দেশ, তিন নম্বর আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শোন, ভাস্কর—তোমার পকেটে এখন টাকা কত আছে?

: টাকা! টাকা কি হবে??

: আহ্! সময় খুব কম। কত টাকা তোমার মানি-ব্যাগে আছে এখন?

: শ'খানেক হবে। কেন?

: যথেষ্ট। তুমি এক্ষুণি একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এস। মেন এন্‌কোয়্যারির দরজার পাশে আমি অপেক্ষা করব। আমি তোমার আগে পৌঁছব। সুতরাং আমিই

টিকিট কেটে রাখছি। আজ রাত্রের ট্রেনে তোমায় বেনারস যেতে হবে। রাত নটা বত্রিশে ট্রেন।

: বেনারস কাশী? তটিনীদেবী কি কাশীতে থাকেন?

: তাই থাকেন। তোমার বাড়িতে খবর দেওয়ার জন্য দেরি করো না। সেটা আমিই দিয়ে দেব তুমি রওনা হয়ে গেলে।

: পোস্টকার্ডটা?

: আমার কাছেই আছে। এখন আটটা পাঁচ। হারি আপ!

অন্তরা লাইনটা কেটে দেয়। ভাস্কর এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। জামাটা গায়ে চড়ায়। অফিসে তালা মেরে রাস্তায় নামে : ট্যাক্সি!

## চব্বিশ

পরদিন মঙ্গলবার, বাঙালিটোলার চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে চিহ্নিত বাড়িটার সামনে মস্ত একটা ফুলের তোড়া হাতে ভাস্কর যখন এসে দাঁড়ালো সূর্য তখন মাথার উপর। বেচারি কাল রাত্রে একবস্ত্রে ট্রেন ধরেছে, সঙ্গে একটা হাত-ব্যাগ পর্যন্ত নেই। সকালে নিমের দাঁতন কিনে মুখ ধুতে হয়েছে। সঙ্গে ছিল শুধু একখানা পোস্টকার্ড—কাল সারা রাত্রে অন্তত দশবার সেটা পড়েছে। যতই দেখেছে, ততই অবাক হয়েছে। চিঠিখানা হাতে পেয়ে রহস্য তো পরিষ্কার হলই না, বরং আরও ঘনীভূত হল। অন্তরা নির্ভুল নকল করেছে—নির্ভুল নয়, বলতে হয়, ভুল সংশোধন করে ঠিক যেভাবে ঢাকা থেকে ছাপা বইটার বানান সংশোধন করে ভারতী প্রকাশন সাগর-সঙ্গমে ছেপেছে। মূল পোস্টকার্ডে একাধিক বর্ণাশুদ্ধি ; হাতের লেখা রীতিমত কাঁচা, অথচ ভাষাটা মোটেই কাঁচা নয়।

কাল রাত্রে অন্তরার কাছে মোটামুটি খবর পাওয়া গেছে, কেন সে সময়মত ভাস্করের সঙ্গে অফিসে দেখা করতে পারেনি। সুখেন আদালত থেকে আদৌ বাড়ি ফেরেনি। ডরোথি কাপুরের অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার এই আত্মগোপন একটা মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে কানোরিয়া পরিবারে। এদিকে কি করে জানি মনোহর কানোরিয়া জানতে পেরে গিয়েছিলেন অন্তরা ভাস্করের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করছে। ফলে একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে ও-বাড়িতে বিকেল নাগাদ। অন্তরাও একবস্ত্রে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ভাস্করকে বলেছে, আপাতত সে এক বান্ধবীর আশ্রয়ে উঠবে। বলেছে, যেখানেই থাকুক সোমবার ভোরবেলা সে ডাউন বেনারস এক্সপ্রেস অ্যাটেণ্ড করতে হাওড়া স্টেশনে আসবে। ভাস্কর তাকে বাড়ির ঠিকানা আর উমার টেলিফোন-নম্বরটা দিয়ে এসেছে। বলেছে অন্তরা যেন ওর বাড়িতে ফোনে জানিয়ে দেয়—বিশেষ কারণে সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে দুদিনের জন্য। প্রদীপ বা সলিলকে সে কোন খবর দিতে বলেনি। দেবার মত খবর নেই—অন্তত যতক্ষণ না তটিনীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

সরু গলিটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একটা ষাঁড়। পাশ কাটিয়ে ভাস্কর এসে দাঁড়াল 'মাতৃসদন'-এর সামনে। পোস্টকার্ডে লেখা ঠিকানার সঙ্গে বাড়ির গায়ে লেখা ঠিকানা মিলে গেল।

তিনতলা বাড়ি। চকমেলানো কাশীর বিচিত্র বাড়ি, আদ্যন্ত পাথরের। সেই খাড়া

ধাপ-ওয়ালা সিঁড়ি। সেই গজাল বসানো ভারি দরজা, যার ছিটকিনি বহু দূর থেকে টেনে খোলা যায়। সেই—মাঝের উঠানটার উপরে বাঁদর-বারণ তারের জালতি। ঢুকতেই বাঁ-হাতি একটা অফিস-ঘর মতো। তক্তাপোশে বসে একজন বৃদ্ধ তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। একমাথা শাদা বাবরি চুল, একবুক শাদা দাড়ি—অর্থাৎ বশিষ্ঠ বা বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে তাঁর কোন মেক-আপ-এর প্রয়োজন হবে না। ভাস্কর হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করল।

ভদ্রলোক কাগজটা নামিয়ে রাখলেন, নিকেলের চশমাটা খুলে আর একজোড়া চশমা নাকে চড়িয়ে ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, মশায়ের কোথা হতে আসা হচ্ছে?

: কলকাতা থেকে। এটাই মাতৃসদন?

: আজ্ঞে হ্যাঁ—বসুন। কাকে অন্বেষণ করা হচ্ছে?

তক্তাপোশের একপ্রান্তে ভাস্কর বসে পড়ে। বলে, আমি যাঁকে খুঁজছি তার নাম তটিনী দাসী। সত্তরের কাছাকাছি বয়স। আদি নিবাস ঢাকা।

ভদ্রলোকের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। বললেন, এ বাড়িতে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশজন বাঙালী মহিলা থাকেন। তার মধ্যে অন্তত বিশ-পঁচিশজনের বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে বলে অনুমান করি, কিন্তু তটিনী দাসী নাম্নী কাউকে আমি চিনি না।

ভাস্কর পকেট হাতড়ে পোস্টকার্ডখানা বার করে। ভদ্রলোক আবার তাঁর চশমাটা বদলান, কাছে-দূরে নানান ভাবে ধরে শেষে পোস্টকার্ডখানা ফেরত দিয়ে বলেন, প্রেরকের ঠিকানা এ বাটীরই ; কিন্তু হস্তলিপি আমার অজ্ঞাত।

ভাস্কর মরিয়া হয়ে বলে, দেখুন, তাঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি এই চিঠি পেয়ে একবস্ত্রে এখানে ছুটে এসেছি। আপনি দয়া করে—

: মশায়ের কী করা হয়?

: আজ্ঞে আমি উকিল।

: উত্তরাধিকার সূত্রে মামলা?

: আজ্ঞে?

: ঐ তটিনী দাসী নাম্নী মহিলার স্বাক্ষর সংগ্রহ মানসে এসেছেন?

ভদ্রলোক যে ভাবে ক্রমাগত সংস্কৃতঘেঁষা বাঙলা বলছেন, তার উপর ঐ চুল দাড়ি, গলার কণ্ঠি—ভাস্করের সাহস হল না সত্য কথাটা স্বীকার করার।

ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়েন, এখনই পড়ছিলেন—'সাগর-সঙ্গমে' মামলার প্রতিবাদী পক্ষের উকিল হিসাবে সে নিজের পরিচয় দিতে ভরসা পেল না। বললে, আজ্ঞে না। প্রয়োজনটা একটু গোপনীয়, আমার নয়, আমার মক্কেলের। এতে তটিনী দেবীর—

: দেবী না দাসী?

: আজ্ঞে?

: তিনি ব্রাহ্মণ, না অব্রাহ্মণ?

: ঠিক জানি না, বোধ হয় অব্রাহ্মণ।

: তাহলে তাঁকে 'দেবী' বলছেন কেন?

ভাস্কর ঢোক গিলে বললে, আর বলব না। মানে ঠিক জানি না তো—

: স্থির নিশ্চয় না জানলে অব্রাহ্মণীকে 'দেবী' বলাও পাপ।

: তা হবে! মোট কথা বলছিলাম—এতে তাঁর লাভ আছে, লোকসান নেই, এবং তাঁর সন্ধান কেউ দিতে পারলে আমার মক্কেল তাঁকে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেবেন—

ভদ্রলোক তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বললেন, আপনি আমাকে উৎকোচের লোভ প্রদর্শন করছেন?

ভাস্কর জিব বার করল, দু-কানে দু-হাত ছোঁয়ালো। সবিনয়ে বললে, আপনি ঋষিপ্রতিম মানুষ। আপনাকে বলিনি—তবে তাঁর সন্ধানের জন্য হয়তো আপনাকে কিছু লোক লাগাতে হবে, খরচ করতে হবে, তাই বলছিলাম—

ভদ্রলোক খুশি হলেন। বললেন, অনুগ্রহ করে ঐ পোস্টকাষ্ঠটা আর একবার প্রদর্শন করাবেন?

পোস্টকার্ডের যে সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'পোস্টকাষ্ঠ' তা জানা ছিল না ভাস্করের। তবু বুঝে নিল ঠিক। বার করে ধরল সেখানা। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সেটা পরীক্ষা করে ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে বললেন, বাবা বিশ্বনাথ!

ভাস্কর প্রথমটা ভেবেছিল উনি ইষ্ট-স্মরণ করছেন বুঝি। একটু পরেই সে ভুল ভাঙল। একজন হৃষ্টপুষ্ট চাকর শ্রেণীর লোক এসে বললে, ডাকলেন?

: হ্যাঁ, দেখ্ তো মদনা দোকানে আছে কিনা?

একটু পরে বিশ্বনাথ একটা ছোকরাকে ধরে নিয়ে এল। উদাম গা। কপালে চন্দনের ছাপ। বোধ হয় গঙ্গাঘাটে পরেছে। ভদ্রলোক বললেন, এই পোস্টকাষ্ঠ তুই লিখেছিস?

মদন—মদনই বোধহয় তার নাম—সেখানা পরীক্ষা করে বলল, হ্যাঁ।

: কে লিখিয়েছেন?

: ফুল-ঠাকুরমা।

: বুঝেছি। আচ্ছা, তুই খেলগে যা। এই নে—

একটি দশ নয়া পয়সা তিনি ধরিয়ে দিলেন ছোকরার হাতে। ছেলেটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বটে—কিন্তু ভাস্করের নজর হল, সে চলে গেল না। দরজার আড়ালে কৌতূহলী চোখ মেলে সে ওকে লক্ষ্য করতে থাকে। বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, আপনি এই প্রকার ধান্দা সৃষ্টি করলেন কী কারণে?

: ধান্দা?

: নয়? ফুল-ঠাকুমার নাম 'নির্ঝরিণী' ; যদিও তা 'তটিনী' শব্দের সমার্থক ; তাঁর প্রকৃত নাম ঘোষণা না করে—

বাধা দিয়ে ভাস্কর বললে, নাম যাই হোক, ঐ ফুল-ঠাকুরমাই এই পোস্টকার্ড লিখেছেন? আপনি নিঃসন্দেহ?

: আপনি সেটা তো স্বকর্ণেই শুনলেন। মদ্‌না কদাচ অনৃতভাষণ করে না।

ভাস্কর মানি-ব্যাগ খুলে পঁচিশটা টাকা বার করে দেয়। বৃদ্ধ নোটগুলো গ্রহণ করলেন, কপালে ছোঁয়ালেন এবং ক্যাশবাক্সে তুলে রেখে বললেন, আপনি যদি ঐ পুষ্পস্তবক উপহার দেবার মানসে আগমন করে থাকেন তবে আপনার যাত্রা সফল ; কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য যদি আদালত সংক্রান্ত কিছু হয়, তবে বৃথাই আপনার অর্থদণ্ড হল।

: ঠিক বুঝলাম না। কী বলতে চাইছেন আপনি?

: নির্ঝরিণী দেবী বদ্ধ উন্মাদিনী!

ভাস্কর অনেকক্ষণ কথা খুঁজে পায় না। শেষে বলে, অসম্ভব!

: অসম্ভব? অর্থাৎ আমি মিথ্যাভাষী?

: আজ্ঞে না, তা বলছি না—কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ হলে এ চিঠি তিনি কেমন করে লিখবেন?

বৃদ্ধ ওকে বুঝিয়ে বলেন। নির্ঝরিণী দেবীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে আজ দশ-পনের বছর। দু-তিন মাস পর হয়তো কিছুদিন ভাল থাকেন। তখন স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেন, বই পড়ে শোনালে তা শোনেন, পূজাআর্চা করেন, গঙ্গা-স্নানে যাবার ঝোঁক ধরেন। এ রকম তিন-চারদিন যেতে যেতেই আবার তাঁর সব কিছু হারিয়ে যায়। তখন তিনি দুনিয়ার বার। স্নান করিয়ে দিতে হয়, খাইয়ে দিতে হয়। তখন ওঁর নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দিতে পারেন না। যখন তিনি ভাল থাকেন তখন মদনের ডাক পড়ে। মদন ওঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, বই পড়ে শোনায়—হয়তো সেই রকম কোন সময়ে তিনি মদনকে দিয়ে ঐ চিঠিখানা লিখিয়েছেন, হয়তো কেন, নিশ্চয় তাই। বৃদ্ধ বললেন, দাঁড়ান, মদনকে আবার সন্ধান করি।

সন্ধান করতে হল না। মদন নিজে থেকেই এল। স্বীকার করল, সপ্তাহখানেক আগে তার ডাক পড়েছিল ফুল-ঠাকুমার ঘরে। খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হয়েছিল। সেই সময়েই ঠাকুরমা ওকে দিয়ে ঐ চিঠিখানা লেখান। ভাস্কর বললে, ওঁর পুরো নাম কি, আত্মীয়স্বজন কে আছে?

বৃদ্ধ খাতাপত্র ঘেঁটেও কিছু বলতে পারলেন না। ভাস্কর বিরক্ত হয়ে বললে, এটা কেমন করে সম্ভব? ওঁর খরচ দেয় কে? কে ওঁকে এখানে পৌঁছে দিয়েছিল? উনি মারা গেলে আপনারা কাকে খবর দেবেন?

বৃদ্ধ বললেন, আমি ওঁর মুখাগ্নি করব। এ পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক পঞ্চবিংশতির করেছি।

'মাতৃসদন' এমনি একটি প্রতিষ্ঠান। এমন অনেক বিধবা আছেন যাঁদের নামে মাসে মাসে মানিঅর্ডারে টাকা আসে। এমন অনেকে আছেন, যেমন ঐ নির্ঝরিণী দেবী—যাঁর নামে ব্যাঙ্কে এককালীন টাকা জমা দেওয়া আছে। সুদ থেকে মহিলাটির খরচ চলে। বৃদ্ধ পুরনো খাতাপত্র ঘেঁটেও বার করতে পারলেন না—এই মহিলাটি প্রথম কবে এসেছিলেন, কী তাঁর সত্যিকারের পরিচয়, কে তাঁর আত্মীয়স্বজন আছে—আদৌ আছে কিনা। দেখা গেল কাশীর একটি ব্যাঙ্কে তাঁর নামে থোক টাকা জমা আছে—যার সুদ মাসে মাসে মাতৃসদনের খাতায় জমা পড়ে। ভাস্কর ঐ ব্যাঙ্কের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে উঠল। বললে, আমি ঐ ফুল-ঠাকুরমার কাছে একবার যাব।

মদনই ওকে নিয়ে গেল তিনতলায়। ঘরটায় আলো-বাতাস যথেষ্ট। দক্ষিণ খোলা ভাল ঘর। বেশ সাজানো-গোছানো। একটা র‍্যাকে অনেক বাংলা বই। ধপধপে বিছানার চাদর। ফুল-ঠাকুরমা আধশোয়া হয়ে বসে ছিলেন একটি ইজিচেয়ারে। ভাস্কর সবিস্ময়ে দেখতে থাকে বৃদ্ধাকে।

ছোট্টখাট্ট মানুষটি। একমাথা রূপালী চুল। দুটি গাল বসে গেছে কোটরে। দাঁত নেই। চিবুকটা সূচালো। গায়ের চামড়া বলিরেখাঙ্কিত, কিন্তু রঙ এখনও ফেটে পড়ছে। যেন পাকা পেয়ারাফুলি আমটি। ধপধপে শাদা থান কাপড় পরনে। দুটি হাত কোলের উপর জড়ো করা। দৃষ্টি ঘোলাটে। জেগে আছেন। ঐ হচ্ছেন তটিনী, যাঁর সম্বন্ধে

অপ্রকাশ বলেছেন—সুযোগ পেলে নাকি তিনিও হতে পারতেন দেবী চৌধুরাণী, কিংবা জোয়ান-অব-আর্ক অথবা প্রীতি ওয়াদ্দেদার।

মদন ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, ফুল-ঠাকুমা, দেখ কে এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

ফুল-ঠাকুরমা হাসি-হাসি মুখে তাকিয়েই আছেন। সাড়া নেই।

ভাস্কর ওঁর সামনে নিচু হয়ে আচমকা ডাকলে, তটিনী দেবী!

সাড়া নেই!

বসে পড়ল ভাস্কর ওঁর পায়ের কাছে। হাতখানা তুলে নিল। বলিরেখাঙ্কিত ডান হাতখানা। বললে, আমি অপ্রকাশ গুপ্তের কাছ থেকে আসছি। চিনতে পারছেন? অপ্রকাশ গুপ্ত! ঢাকা—রমনাবাজার—বুড়িগঙ্গা! কিছু মনে পড়ে?

বৃদ্ধা না-রাম, না-গঙ্গা।

বহুক্ষণ চেষ্টা করল ভাস্কর। বৃথাই। শুধু অপ্রকাশ গুপ্ত নয়, তাঁর মানসী প্রতিমা তটিনীরও মৃত্যু হয়েছে। এ তো বেঁচে মরে থাকাই! এঁকে ভাস্কর কোন্ কাজে লাগাবে? মদন বললে, আপনার কথা ওর কানেই যাচ্ছে না এখন। সেই সময় যদি আসতেন তাহলে চিনতে পারতেন।

ভাস্কর বলে, মদন, উনি যখন সুস্থ থাকেন, তখন কি ওঁর আগের কথা কখনও বলেছেন? কোথায় বাড়ি? কে আছে?

মদন মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না। তবে আপনি ধরেছেন ঠিকই। ঐ ফুলঠাকুমাই তটিনী!

: তটিনী! তটিনী কে তুমি জান?

: জানি বাবু। তটিনী একটা বেশ্যা। ঢাকায় বাড়ি।

ওর হাতটা চেপে ধরে ভাস্কর : তুমি কেমন করে জানলে?

মদন স্বীকার করল। সে সাগর-সঙ্গমে বইটা পড়েছে।

: তুমি! তুমি কোথায় পেলে সে বই?

: ফুল-ঠাকুরমার তোরঙ্গে।

আশ্চর্য কাণ্ড! ফুল-ঠাকুরমা যখন সুস্থ থাকেন তখন মদন ওঁকে বই পড়ে শোনাতে আসে। অনেক বই আছে ঠাকুরমার—রামায়ণ, কথামৃত, পথের পাঁচালী, বঙ্কিম, প্রভাতকুমার, ত্রৈলোক্যনাথ, রমেশ দত্ত, শরৎচন্দ্র। সেই সবই পড়ে শোনাতে হয়। মাস ছয়েক আগে—কী খেয়াল হল—ফুল-ঠাকুরমা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে আমার কাছে বস তো মদন। দ্বার রুদ্ধ করে মদন ঘনিয়ে এসে বসতেই উনি তোরঙ্গ খুলে হাতড়ে হাতড়ে বার করলেন একখণ্ড ধূলি-ধূসরিত বই। বললেন, এখানা পড়ে শোনা দেখি!

মদন বললে, পাঁচ-সাত পাতার বেশি আমি পড়তে পারিনি বাবু। বই ফেলে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বইটা কাঁচা খিস্তির। কিন্তু নামগুলো মনে আছে—তটিনী-সাগর। লেখকের নাম অপ্রকাশ গুপ্ত।

ভাস্করের দুরন্ত কৌতূহল হল, বললে, মাত্র পাঁচ-সাত পাতা পড়েছ বইটার?

মদন মুখ নিচু করে কী ভাবল। তারপর বললে, বামুনের কাছে মিছে কথা বলব না, বাবু। পরে ওঁর তোরঙ্গ থেকে বার করে আমি লুকিয়ে সবটা পড়েছি। উনি ততক্ষণে আবার পাগল হয়ে গেছেন।

ভাস্কর তটিনীকে ছেড়ে মদনকে ধরল, বইটা তোমার কেমন লেগেছে মদন?

: ঐ যে বললাম, কাঁচা খিস্তির বই বাবু!

: তা তো জানি—কিন্তু বইটা পড়ার পরে—বামুনের কাছে মিছে কথা বলো না মদন—তুমি কি—তুমি কি অন্যায়, বিশ্রী কিছু করেছিলে?

: বিশ্রী কিছু? আজ্ঞে না। বিশ্রী কিছু কেন করব?

: ঐ বইটা পড়ার ফলে? মনে কুচিন্তা আসার ফলে?

: না বাবু, মনে কুচিন্তা-টুচিন্তা কিছু আসেনি। খিস্তির বই, পড়তে মজা লেগেছিল ঐ যা—

ভাস্কর হাসল। ভাবছিল, জাস্টিস সেনশর্মা ওর কথা শুনে কি বলবেন?

মদন বললে, চলুন বাবু, ও পাগলীর এখন কোন সান নেই ; আপনি বেকার দৌড়োদৌড়ি করলেন।

ভাস্কর বললে, চল। হ্যাঁ, বৃথাই এত দৌড়োদৌড়ি করলাম।

চলতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়। মনে হয়, না হয় অপ্রকাশের মানসী প্রতিমার সান নেই—লোয়ার সার্কুলার রোডের সেই 'দাঁড়াও পথিকবর' লেখা পাথরটারও তো সান নেই, তবু বছর বছর তো ভাস্কর সেখানে ফুলের স্তবক রেখে আসে শ্রাবণ মাসে। ভাস্কর ফিরে আসে, বৃদ্ধার হাতখানা তুলে নিয়ে গুঁজে দেয় ফুলের তোড়াটা। বৃদ্ধা হাসলেন। তোড়াটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। তারপর তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল—কী যেন বললেন। ভাস্কর বুঝতে পারল না ওঁর কথা। জিজ্ঞাসা করে মদনকে—উনি কী-যেন বললেন, নয়?

: হ্যাঁ। মনে হল ঠাকুরমা বললেন, 'আজ বুঝি জন্মদিন?'

: আমারও তাই মনে হল।

ভাস্কর নেমে এল নিচে। বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, কাজ হল?

: না। আমার দুর্ভাগ্য।

ঘড়িতে দেখল বেলা দেড়টা। ছুটল দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে। সেখানে রিকশা ধরে চলে গেল ব্যাঙ্কে। বৃথাই। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে কে যে নির্ঝরিণী দেবীর নামে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গিয়েছিল আজ তা বলা প্রায় অসম্ভব। সম্ভব হলেও ব্যাঙ্ক তা জানাতে প্রস্তুত নয়।

অগত্যা কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

মনোহর অন্তরাকে ঠকায়নি, অন্তরাও ঠকায়নি ভাস্করকে, ঐ বৃদ্ধও তাকে প্রবঞ্চিত করেনি—অপ্রকাশের নায়িকাকে সে ঠিকই খুঁজে বার করেছে। তবে নাকি ওর পোড়া কপাল তাই সব পেয়েও কিছু পেল না!

সারাটা দিন কেটে গেল গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। বিশ্বনাথের গলির মুখে—কচুরিগলিতে মধ্যাহ্ন আহার সেরে নিল। সন্ধ্যায় ফেরার গাড়ি। হাতে এখনও ঘণ্টা তিনেক সময়। কী করবে এটুকু সময়? হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত একটা কথা খেয়াল হল ওর। তাই তো! একথা তো তার আগে খেয়াল হয়নি! আবার ছুটতে ছুটতে সে চলে এল চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে—মাতৃসদনে।

মদন বসে ছিল সামনের দোকানে। বললে, কি বাবু, আবার এলেন?

ভাস্কর ওকে কাছে ডেকে বললে, মদন, যখন আমি ফুলের তোড়াটা ওঁর হাতে

দিলাম, তখন উনি কি বললেন, বল তো?

: উনি বললেন, 'আজ বুঝি আমার জন্মদিন?'

: হ্যাঁ ; কিন্তু এ কথা উনি কেন বললেন? গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে নিশ্চয় তাঁর জন্মদিন পালিত হয়নি—

: না বাবু। প্রতি বছরই জন্মদিনে ওঁর নামে ফুলের তোড়া আসে। ফাল্গুন মাসে।

ক্ষীণ একটা আলোর রেখা। ভাস্কর ওর হাতটা ধরে বলে, কে পাঠায়? বলতে পার?

: তা জানি না বাবু, তবে কেষ্টা যে ফুলের দোকানে কাজ করে, ঐ যে গোধূলিয়া যেতে—

ভাস্কর ওর হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলে, মদন, তুমি এস আমার সঙ্গে ; কেষ্টাদের দোকানটা চিনিয়ে দাও।

আধ ঘণ্টা পরে একটা সূত্র পাওয়া গেল। দোকানদার বললেন, তাঁর উপর নির্দেশ আছে, প্রতি বছর সতেরই ফাল্গুন 'মাতৃসদনে' নির্ঝরিণী দেবীর নামে একটা ফুলের তোড়া পাঠানোর।

: হ্যাঁ, কিন্তু নির্দেশটা কে দিচ্ছে?

: নাম তো জানি না স্যার। প্রতি বছরই চিঠি পাই, অগ্রিম টাকা পাই।

: অগ্রিম টাকা, মানি অর্ডারে?

: না, চেক-এ।

ক্যাশ-বই ঘেঁটে চেক-এর নম্বর এবং ব্যাঙ্কের নামও পাওয়া গেল। কলকাতার ব্যাঙ্ক। গড়িয়াহাট ব্রাঞ্চ। ঐ ব্রাঞ্চে কাজ করে ভাস্করের এক সহপাঠী। সোমবার সে ক্যাজুয়াল-লীভে না থাকলে জানা যাবে কে বছর বছর ফুলের তোড়া পাঠায় এই পলিতকেশা বারাঙ্গনাকে। হে বিশ্বনাথ! সে লোকটাও যেন বিকৃতমস্তিষ্কের না হয়। তা অবশ্য সে হতেই পারে না। তার ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে। রূপোপজীবিনী তটিনীর প্রতি তাঁর মনের কোণে আছে এক দুর্বলতা। খুব সম্ভব তিনি অপ্রকাশ গুপ্তকে চেনেন, হয়তো দেখেছেন, হয়তো অনেক কথাই জানেন। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে সে-সব কথা কি তিনি স্বীকার করবেন? নিঃসন্দেহে তাঁর বয়স আশির কাছাকাছি। চল্লিশ বছর আগেকার এক প্রেমিকার প্রতি তাঁর যে আজও দুর্বলতা আছে এ কথা তিনি নিশ্চয় স্বীকার করতে চাইবেন না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর নামে সমন ধরালে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কাই বেশি। অর্থাৎ এত পরিশ্রমের নীট ফল—শূন্য।

হাওড়া স্টেশনে যথারীতি হাজির ছিল অন্তরা। ভাস্কর তার অভিজ্ঞতার কথা খুলে বলল। সময় কম। আজ বুধবার। কাল সকাল দশটায় আদালত বসবে। সেদিন সন্ধ্যায় কি হয়েছে জানা নেই। আদালত বসার আগেই তার পক্ষে প্রথম কর্তব্য সলিল অথবা প্রদীপের সঙ্গে যোগাযোগ করা। অথবা বাড়িতে যাওয়া। দুটোর কোনটাই করল না ভাস্কর। সে হাওড়া থেকে মিনি বাস ধরল। গড়িয়াহাট। সবার আগে তাকে জানতে হবে কে সেই অশীতিপর বৃদ্ধ যিনি এখনও বছরে বছরে মাতৃসদনে ফুলের তোড়া পৌঁছে দিচ্ছেন—ঢাকা নগরীর সেই প্রাক্তন গণিকাকে। অন্তরা বললে, ঠিক আছে, তুমি ব্যাঙ্ক ঘুরে আদালতে এস। আমি উমাকে জানিয়ে দিচ্ছি তুমি কলকাতায় এসেছ।

: উমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

: শুধু টেলিফোনে নয়, সাক্ষাতেও। গতকাল। কিন্তু সে সব কথা পরে।

: সুখেন কানোরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে?

: না। তার নামে বডি-ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে।

ভাস্কর আর দেরি করতে পারে না। তখনই রওনা দেয়।

ঈশ্বর আছেন। ভাস্কর তার নিরলস সাধনার ফল পেল হাতে হাতে। আধঘণ্টাখানেকের ভিতরেই ওর সেই সহপাঠী চেক-এর নম্বর থেকে বলে দিতে সক্ষম হল, সেই সেভিংস অ্যাকাউণ্টের মালিকের নাম।

নামটা শুনে বজ্রাহত হয়ে গেল ভাস্কর মুখার্জী।

## পঁচিশ

"কেনোপনিষদে আগেই বলেছি চৌত্রিশটি শ্লোক। শেষ শ্লোকে, শ্রুতি বললেন—এই ব্রহ্মবিদ্যা যে অবগত হয় সে ব্রহ্মে অবস্থিতি করে. সংসারে আর ফিরে আসে না ; কিন্তু তার পূর্ববর্তী শ্লোকটি কি? আমরা এখনই তা আলোচনা করেছি—'তস্মৈ তপো দমঃ কর্ম্মে ত প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্'।—অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযমরূপ দম, নিত্য ও নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে বেদাদি ধর্মগ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত পরম সত্যের আশ্রয় লাভ সম্ভব। লক্ষণীয় কেনোপনিষদের শেষ শ্লোকে শ্রুতি বলছেন, 'দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ-রূপ তপস্যার' কথা, বলছেন, 'ইন্দ্রিয়সংযমের' কথা—অথচ এই কেনোপনিষদের প্রথম শ্লোকটিতে আমরাই প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করেছি—'আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণিচসর্ব্বাণি ;—আমার সমস্ত অঙ্গ, বাকযন্ত্র, প্রাণ, শ্রবণেন্দ্রিয়, দৈহিক বল এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টি লাভ করুক। প্রশ্ন হতে পারে—অন্তিমে যাকে বর্জন করব, দমন করব, সংযম করব, আদিতে তারই বৃদ্ধি এবং পুষ্টি কেন কামনা করছি? জবাবে বলব—এইটেই যে এ খেলার আইন। উপনিষদ এ কথা বলেননি যে. ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে—এই বিশ্ব-প্রপঞ্চকে অস্বীকার করে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় ; ব্রহ্মবিদ্যার মুমুক্ষু শিষ্য তাই নিজের এবং অধ্যাপকের শুধু পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করেই ক্ষান্ত হননি, ইহলৌকিক মঙ্গল কামনাও করেছেন—বলেছেন 'ওঁ, সহ নাববতু—সহ নৌ ভুনক্তু—সহ বীর্যং করবাবহৈ!' শ্রুতি জানেন সব কিছু নিয়েই তিনি পূর্ণ, সব কিছু বাদ দিয়েও তিনি পূর্ণ! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ'।

কেনোপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা আজ শেষ হল। আনন্দময় যুক্তকর কপালে ঠেকালেন। মাইকটা হাত দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর। দর্শকদলও হাত তুলে তাঁকে নমস্কার করলেন। ধীরে ধীরে প্রেক্ষাগৃহ শূন্য হতে থাকে। আনন্দময় পাশে রাখা গ্লাসের জলটি আকণ্ঠ পান করলন, মঞ্চের দক্ষিণদিকের নির্গমন দ্বার দিয়ে বাইরের করিডরে বের হয়ে আসেন। প্রতিদিন যেমন হয়, সেখানে অনেকে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। নানা জাতের প্রশ্ন হতে থাকে—এবার কোন্ উপনিষদ তিনি শুরু করবেন, কবে থেকে, কেমন আছেন তিনি ইত্যাদি। আনন্দময়ের গুণগ্রাহী শ্রোতার দল। আনন্দময়, একে একে সকলকে উত্তর দিচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে নির্গমন দ্বারের দিকে এগিয়ে চলেছেন। হঠাৎ ভিড়ের মাঝখান থেকে এগিয়ে আসে নির্মল। বললে, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা

ছিল স্যার!

আনন্দময় বারান্দার একান্তে সরে এলেন, জনান্তিকে। কৌতূহলী দর্শকেরা বুঝতে পারেন উনি গোপনীয় কিছু আলোচনা করতে চান ঐ অল্পবয়সী ছেলেটির সঙ্গে। তাঁরা সরে দাঁড়ান—চলে যেতে থাকেন। নির্মল বললে, কাল সকালে প্রসিকিউশান তার সাক্ষীর তালিকা শেষ করবে। তাই উপায়ান্তর না পেয়ে আপনাকে এখানেই ধরেছি। আপনি কি আপনার শেষ সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন?

: অর্থাৎ প্রসিকিউশান উইটনেস হিসাবে আমি সাক্ষী দিতে রাজী কিনা?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন—সুখেন কানোরিয়ার জবানবন্দি শোনার পর আপনি আপনার শেষ সিদ্ধান্ত জানাবেন।

আনন্দময় হেসে বললেন, লড়াই তো তুমি ফতে করেছ নির্মল, আবার আমাকে টানাটানি করছ কেন?

: লড়াই ফতে করেছি মানে? আমি ঠিক বুঝলাম না স্যার?

: শুনেছি, ডিফেন্স কাউন্সেল পালিয়ে গেছে, সে নিরুদ্দেশ—জীমূতবাহন নাকি—

: না স্যার, তা সত্য নয়। অবশ্য সত্যিটা ঠিক কী, তা আমি জানি না। কথা সেটা নয়, এ মামলায় আমি হারি-জিতি সেটা বড় কথা নয়, আপনার ডিপজিশনের একটা আলাদা মূল্য আছে—শাশ্বত মূল্য—এ জাতীয় অশ্লীল গ্রন্থের প্রকাশ—

ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আনন্দময় বললেন, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটাকে আমি অশ্লীল বলে মনে করি না নির্মল। 'সত্য' এ মামলায় উদঘাটিত হয়নি। সুখেনের ক্রশ্-এগজামিনেশন হলে সেটা হয়তো হত ; কিন্তু ডিফেন্স কাউন্সেল—যে কারণেই হোক—সেটা এড়িয়ে গেছে। তাই আমি সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছি না যে, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি অবসীন। কিন্তু আর নয়, আমার কয়েকটা জরুরী কাজ আছে, এবার এস তুমি।

নির্মল দু হাত তুলে নমস্কার করে। চলে যায়। আনন্দময় জনবিরল বারান্দা দিয়ে বিপরীত দিকে চলতে শুরু করেন। ঠিক তখনই কে যেন তাঁকে পিছন থেকে ডাকল : স্যার?

আনন্দময় ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন অদূরে দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবক। ময়লা শার্ট। বোধহয় অশৌচ হয়েছে। দাড়ি কামায়নি দুদিন। বললেন, কে? আমাকে বলছেন?

: হ্যাঁ স্যার! আমি আপনার ছাত্র, আমাকে তুমিই বলবেন।

: ছাত্র? তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না বাবা?

: আপনি যখন ল-কলেজ থেকে রিটায়ার করেন, আমি তখন ওখানে পড়তাম।

: বল, কি বলবে?

: আপনার সঙ্গে গোপনে কয়েকটা কথা বলতে চাই, এখানে নয়, কোথাও গিয়ে বসবেন চলুন।

আনন্দময়ের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হল। বললেন, গোপন কথা! আমার সঙ্গে? তোমার নাম? পরিচয়?

: আমার নাম শ্রীভাস্কর মুখার্জি। আমিই সেই ডিফেন্স কাউন্সেল। আমি পালিয়ে যাইনি স্যার। জীমূতবাহনের টাকাও খাইনি—

: ও! তা আমার তো এখন সময় হবে না বাবা। কাল বিকালে—

ভাস্কর দুটি হাত জোড় করে বললে, শুধু অত্যন্ত গোপনীয় কথাই নয় স্যার, অত্যন্ত

জরুরী কথাও। এখনই সেটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

এবার রীতিমত বিরক্ত হলেন আনন্দময়। বললে, তোমার পক্ষে জিনিসটা গোপন এবং জরুরী হলেও আমার পক্ষে—

চকিতে একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে ভাস্কর বললে, আমি কাশীর চৌষট্টি যোগিনী ঘাটে মাতৃসদনে নির্ঝরিণী দেবীর সঙ্গে কাল দেখা করেছি।

আনন্দময় যেন পাষাণ-মূর্তি। গম্ভীর স্বরে বললেন, কে তিনি? আমার কাছে তাঁর প্রসঙ্গ কেন? ঠিক কি জানতে চাইছ?

: আপনি কেন প্রতিবছর সতেরই ফাল্গুন তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দেন এটা আমাকে এখনই জানতে হবে!

আনন্দময় বজ্রাহত। ভাস্করকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, এস তুমি আমার সঙ্গে।

বিবেকানন্দ হলের উপরে, দ্বিতলে একটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নির্জন কক্ষে প্রবেশ করলেন আনন্দময়। তাঁর জন্য চিহ্নিত পাঠকক্ষ। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করলেন। বসলেন গিয়ে নিজ আসনে। সামনের গদি-আঁটা চেয়ারটায় ভাস্করকে বসতে বললেন, প্রশ্ন করলেন, বেশ, এবার বল কী তোমার জরুরী কথা!

ভাস্কর লক্ষ্য করল, অভিযোগটা আনন্দময় অস্বীকার করেননি। কোন্ সূত্রে এত গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে তা জানবার যেন কিছুমাত্র কৌতূহলও নেই তাঁর। ভাস্কর বললে, আপনি স্যার অনেক অনেক উপরে, আমি অনেক নিচে। কিন্তু আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে আপনাকে এভাবে বিরক্ত করছি! আমার উপায় নেই। আমি—আমি—

: ইতস্তত করছ কেন ভাস্কর? যা জানতে চাও অকপটে জিজ্ঞাসা কর না কেন?

: আপনি নির্ঝরিণী দেবীকে—আই মীন তটিনী দেবীকে—দীর্ঘদিন ধরে চেনেন?

: চিনি।

: ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে আপনিই তাঁকে মাতৃসদনে রেখে এসেছিলেন?

: স্বীকার করছি।

: তাহলে অপ্রকাশ গুপ্তকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন?

: চিনতাম।

ভাস্করের সারা দেহের রোমকূপ কদমফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। দু হাতে টেবিলের দু প্রান্ত চেপে ধরে সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বলে, তাহলে তিনি সাগর-সঙ্গমে বইটা কেন লিখেছিলেন—কী উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, তাও আপনি জানেন!

: জানি। পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই ওটা পড়েছি আমি।

বাক রোধ হয়ে গেল ভাস্করের। জিব দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিয়ে বললে, এবার বলুন স্যার, 'সাগর-সঙ্গমে' বইটা কি আপনার মতে অশ্লীল, অবসীন? অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হবার উপযুক্ত?

শান্ত সমাহিত কণ্ঠে আনন্দময় একটিমাত্র শব্দে জবাব দিলেন : না।

: আপনি এইমাত্র নির্মলবাবুকে বললেন যে, প্রসিকিউশানের তরফে আপনি সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত, আপনি কি ডিফেন্স কাউন্সেলের একমাত্র সাক্ষী হতে রাজী?

: না।

ভাস্কর আবার সোজা হয়ে বসে। একটু ভেবে নিয়ে বলে, কারণটা জানাবেন স্যার?

: জানাব। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় বইটাকে আমার অশ্লীল বলে মনে হয়নি। জাস্টিস জনসনের সঙ্গেও আমি একমত নই ; আজ এই চল্লিশ বছর পরে আমার মনে হচ্ছে বইটা অশ্লীল না হওয়া সত্ত্বেও ওটা বাজেয়াপ্ত হওয়াই উচিত।

: কেন স্যার? কি কারণে?

: সুখেন কানোরিয়া।

: কিন্তু এ কথা তো সত্য নয় যে, ঐ বইটা পড়েই উত্তেজিত হয়ে সে ঐ অপরাধটা করেছে! সুখেন কানোরিয়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য রকম—

: সেটা তুমি প্রতিষ্ঠিত করনি। তুমি মেনে নিয়েছ। পালিয়ে না গেলেও সরে দাঁড়িয়েছ!

ভাস্করের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। বললে, আমি ক্রস্ না করলেও কি আপনার মত মহাপণ্ডিত সেটা বুঝতে পারবেন না?

: আমি মহাপণ্ডিত নই ভাস্কর, আমি আইনের ছাত্র। আমি বিচারক ছিলাম। আদালতে যে তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উপরেই আমার রায় নির্ভর করা উচিত— এমন শিক্ষাই আমি পেয়েছি।

ভাস্কর নিরুপায় হয়ে মাথা নাড়ে। বলে, বেশ তাহলে আমাকে বলুন—অপ্রকাশ গুপ্তের কথা বলুন। কেন পাণ্ডুলিপি অবস্থায় বইটি আপনার অশ্লীল মনে হয়নি তাই বোঝান। ল-পয়েন্টস থেকে।

আনন্দময় হাসলেন। বললেন, আমি দুঃখিত, ভাস্কর! আমি কিছুই বলব না। অপ্রকাশ গুপ্তকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মানসী প্রতিমার ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি। তটিনীকেও আমি শ্রদ্ধা করি। তুমি কোন্ সূত্রে জেনেছ জানি না—হ্যাঁ স্বীকার করছি, সেই মহীয়সী মহিলাকে আমি প্রতি জন্মদিনে ফুলের স্তবক উপহার পাঠাই। কিন্তু আর কোন কথা আমি বলব না।

: কেন বলবেন না স্যার? আপত্তি কোথায়?

: লেখকের 'নাম' এবং 'উপাধির' মধ্যেই তোমার প্রশ্নের জবাব। এমন একটা অদ্ভুত ছদ্মনাম কেন নিয়েছিলেন লেখক?

: 'অপ্রকাশ গুপ্ত' লেখকের ছদ্মনাম?

: এত বুদ্ধিমান হয়েও তুমি ঐ সোজা কথাটা বোঝনি?

: তাহলে তার আসল নাম কী?

আনন্দময় নিরুত্তর। স্মিত হাস্যেই বলে—এ প্রশ্নের জবাব নেই।

ভাস্কর অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে, আপনি তাহলে আমাকে কোনো ভাবেই সাহায্য করতে পারেন না?

: না। আমি অপ্রকাশের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ভাস্কর বললে, ঠিক আছে স্যার। শুধু একটা কথার জবাব আমাকে দিন—'সাগর-সঙ্গমের' শেষ পৃষ্ঠায় একটা লাইন আছে যেখানে লেখক বলেছেন—সাগরের চিন্তাসূত্রের মাধ্যমে বলেছেন—যে, সুযোগ পেলে হয়তো ঐ বারবনিতা তটিনী একজন 'জোয়ান-অব-আর্ক' একজন 'দেবী চৌধুরাণী অথবা একজন 'প্রীতি ওয়াদোর' হয়ে উঠতে পারত? আপনার মনে আছে?

: আছে।

: পাণ্ডুলিপিতেও ঐ কথা ছিল?

: নিশ্চয় ছিল—না হলে ছাপা হল কি করে?

ভাস্কর এবার ঝুঁকে পড়ে বলে, এবার বলুন স্যার পাণ্ডুলিপিতে অমন একটা পংক্তি কি করে লেখা হল? অপ্রকাশ গুপ্ত মারা গেছেন ত্রিশে জানুয়ারী 1930 তারিখে, আর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় আঠারই এপ্রিল 1930তে, প্রীতি ওয়াদ্দেদার আত্মহত্যা করেন বাইশে সেপ্টেম্বর 1939-এ।

আনন্দময় নিরুত্তর। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্তব্ধ। চোখ দুটি নিমীলিত।

: বলুন স্যার! এক্সপ্লেন দিস্ অ্যানাক্রনিজম! যে লেখক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হবার আড়াই মাস আগে মারা গেছেন তিনি কেমন করে তাঁর রচনায় প্রীতি ওয়াদ্দেদারের উল্লেখ করেন?

আনন্দ চোখ চাইলেন। হাসলেন। বললেন, তুমি জিতেছ। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, অপ্রকাশ গুপ্ত 1930-এর জানুয়ারীতে মারা যাননি। যেতে পারেন না।

: তবে কবে তিনি মারা গেছেন? মারা যে গেছেন তারই বা প্রমাণ কি?

: প্রমাণ নেই, অপ্রমাণও করা যায় না।

: তবু আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলবেন না?

: আমি সত্যবদ্ধ ভাস্কর!—আনন্দময় উঠে দাঁড়ালেন।

ভাস্করও উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনি আমকে কোনও সাহায্য করবেন না। বেশ, তাই সই। তবু আমি লড়ব। আপনি অপ্রকাশের ঘনিষ্ঠ গুণগ্রাহী হয়েও তাঁকে, তাঁর সাহিত্যকে পদদলিত হতে দিচ্ছেন—আমার কিছু বলার নেই। আমি শেষ পর্যন্ত লড়ব স্যার। একটা অনুরোধ শুধু করব : আমি আপনার পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করব। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন শুধু।

আনন্দময় জবাব দেন না। দণ্ডায়মান সমভঙ্গ বুদ্ধ মূর্তির মত স্থির, অচঞ্চল!

ভাস্কর তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। দুটি পায়ের উপর নামিয়ে দিল দুদিনের অস্নাত তার রুক্ষ চুলে ভরা মাথা।

আনন্দময় ওর মাথায় হাত দিলেন। আশীর্বাদ করলেন—কিন্তু শেষ সংগ্রামে সে জয়ী হোক এ আশীর্বাদ করলেন না।

বললেন : যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!

## ছাব্বিশ

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ভাস্কর এসে পৌঁছালো তার বাড়িতে। দু-দিন পরে। ভেবেছিল ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ির বুঝি অবসান হল, অন্তত সেদিনটার মত। কলিং বেল বাজাতে যে দরজাটা খুলে দিল তাকে দেখে অনুভব করল—নাটক এখনও শেষ হয়নি, বিস্ময়ের অবকাশ এখনও আছে। অবাক হয়ে বললে, তুমি?

খোলা দরজার পাল্লাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে অন্তরা। ওর বাড়িতেই। বললে, ভিতরে এস।

: তা আসছি; কিন্তু তুমি এখানে?

ততক্ষণে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে উমা। খন্‌খনে গলায় বলে ওঠে, আচ্ছা ছোড়দা! তুই কি রে? মানুষ না জন্তু?

ভাস্কর ততক্ষণে বসে পড়েছে একটা মোড়ায়। জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললে, ও প্রশ্নটা তুই আগেও একদিন করেছিস উমা। আমি ভেবে দেখিনি---

: অফিস থেকে সোজা বেনারস চলে গেলি, একেবারে খালি হাতে! একটা খবর পর্যন্ত---

ভাস্কর অন্তরাকে বললে, কিন্তু তুমি এখানে এতরাত্রে কি মনে করে?

অন্তরার জবাব দেওয়ার আগেই উমা বলে ওঠে, অন্তরাদি আমাদের বাড়িতেই আছেন। চা খাবে তো?

: বানা এক কাপ।

: এক কাপ কেন, বানালে তিন কাপই বানাবো, কি বল অন্তরাদি?

: বাবা-মা কোথায়?

: মঠে গেছেন। কীর্তন শুনতে। ফিরে আসার সময় হয়ে এল।

উমা চায়ের জল বসাতে গেল। ইতিমধ্যে ভাস্কর শুনে নিল অন্তরার কাছে। ভাস্কর বেনারস চলে যাবার পর অন্তরা এ বাড়িতে ফোন করেনি। স্বয়ং চলে এসেছিল। শৈলবালা এবং শিবনাথের সঙ্গেও ওর কথা হয়। শৈলবালা ওকে রাতের মত থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন, তোমাদের বাড়িতে ফোন থাকে তো একটা খবর দিয়ে দাও। রাত অনেক হয়েছে, এত রাত্রে একা একা---

অন্তরা ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছিল, কলকাতায় সে থাকে না, কোনও হোটেলে উঠবে।

বলা বাহুল্য তাকে থেকেই যেতে হয়েছে অতঃপর।

অন্তরার প্রশ্নের জবাবে ভাস্করকে আনন্দময়ের সঙ্গে আলাপচারীটাও শোনাতে হয়। অন্তরা চুপ করে সবটা শুনল। মতামত প্রকাশ করল না। তার আগেই অবশ্য উমা ঘরে ঢুকল চায়ের কাপ হাতে।

একটু পরেই শিবনাথ সস্ত্রীক ফিরে এলেন। রাতের রান্না করাই ছিল। তরকারিগুলো গরম করে নিতে আর কতক্ষণ? অনাত্মীয়া মেয়েটির সামনে শিবনাথ আজ আর বকাবকি করলেন না। দেখা গেল অন্তরা বেশ ঘরোয়া হয়ে পড়েছে দুদিনেই।

আহারাদির পর অন্তরা উমার ঘরে শুতে গেল। শিবনাথ আর শৈলবালা শুয়ে পড়ার পর, অন্তরার মশারি গুঁজে দিয়ে উমা এল তার ছোড়দার ঘরে। ভাস্কর তখন আহারান্তিক দিনের শেষ সিগ্রেটটা ধ্বংস করছে। উমা এসে ভাস্করের মশারি টাঙাতে টাঙাতে বললে, ছোড়দা, ইতিমধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে কিন্তু, তোকে বলা হয়নি। অন্তরাদি ছিল বলে--

—তুই যেদিন কাশী চলে গেলি সেদিনই বিকালে তোর সেই এক্স বস্ সুকোমল মিত্র এসেছিল। বাবার সঙ্গে তার অনেকক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস হয়েছে। বাবা আমকে ঘরে থাকতে দেয়নি। তারপর মায়ের সঙ্গে যখন বাবার কথাকাটাকাটি হচ্ছিল তখন আমি ব্যাপারটা জানতে পারি।

: ব্যাপারটা মানে? কি ব্যাপার?

: সুকোমলবাবু বোধহয় সেই রেবা সেন-এর কথা সব বাবাকে বলেছে। তুই নাকি ওঁকে বিয়ে করতে চাস!

: তারপর?

: তারপর গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ অনেকক্ষণ চলত—থামল অন্তরাদি এসে পড়ায়।

: তারপর?

: তারপর? তার পরের কথা তো তুই বলবি—

: আমি বলব? আমি কি বলব?

: আমি জানি! রেবা সেনকে জেরা করার গল্প শুনেছি অন্তরাদির কাছে। আচ্ছা ছোড়দা, অন্তরাদি মেয়েটা ভারি ভাল নয়?

: তোর বুঝি খুব পছন্দ?

: কেন, তোর নয়?

: আমার পছন্দ হলেই বা কি, না হলেই বা কি? অন্তরা কায়স্থ তা জানিস?

: তা আমি জানি মশাই। কিন্তু তুই কি জানিস বাড়ির লেটেস্ট পরিস্থিতি? সন্তানবতী বিধবার হাত থেকে তোকে রক্ষা করতে বাবার অবস্থা এখন 'এনি পোর্ট ইন দ্য স্টর্ম!'

: বাজে কথা, যাঃ!

: মাইরি! বাবা বড়দাকে টেলিগ্রাম করেছে, জানিস?

: বড়দাকে! কেন?

: পারিবারিক সমস্যা মেটাতে বড়দার এখন নাকি আসা দরকার। অর্থাৎ বড়দার সঙ্গে বাবার ঝগড়া মিটেছে। তোর কায়স্থ বিবাহে বোধহয় বাবার আপত্তি হবে না।

: শুধু আমার? আমি একাই বেজাতে বিয়ে করতে চাই বুঝি?

উমা চট করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, ক্লান্ত আছিস আজ, শুয়ে পড়!

ভাস্কর হাত বাড়িয়ে ওর আঁচলটা ধরতে যায়। পারে না। তার আগেই উমা পালিয়ে যায়।

ভোর বেলা ঘুম ভেঙে গেল ভাস্করের।

কী সখ হল, উঠে পড়ল। রান্নাঘরে গিয়ে ইণ্ডেন গ্যাসে বসিয়ে দিল তিন কাপ চায়ের জল। বেড-টি খাবে। ভাস্কর অবশ্য উঠে পড়েছে। শুয়ে শুয়ে বেড-টি খাবার দুর্লভ সুযোগটা তার বরাতে নেই ; কিন্তু উমা তার ঘরের অতিথির জন্য দু'কাপ করে দিয়ে আসবে। ওর মনে হল মনোহর কানোরিয়ার বাড়িতে নিশ্চয় বেড-টির চল আছে।

তিন কাপ চা বানিয়ে ভাস্কর টোকা দিল উমাদের ঘরের দরজায়। একবার টোকা দিতেই উমা দরজা খুলে দেয় : কি রে ছোড়দা? এত ভোরে?

বেড-টি করে এনেছি। অন্তরাকে ডেকে দে।

: অন্তরাদি নেই রে ছোড়দা, ভোর রাতেই সে চলে গেছে।

: এত ভোরে! কেন? কোথায়?

: তা বলেনি। ভোরবেলা আমাকে তুলে বললে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিতে। তার কি একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে। এখনই যেতে হবে।

ভাস্কর এক কাপ চা বেসিনে ঢেলে দিল। দিনটা শুরু হল ব্যর্থ প্রয়াসে।

আজ তার মামলার একটা মারাত্মক দিন।

মামলা! এ দুদিন মামলার কি অবস্থা হয়েছে খোঁজই নেয়নি এখনও!

তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা তুলে নিয়ে প্রদীপকে ধরবার চেষ্টা করে। প্রদীপও সকাল করে উঠেছে। বললে, তুই নাকি বেনারস গিয়েছিলি? কখন ফিরলি?

কাল সকালে ফিরেছে এ কথা স্বীকার করতে বাধল। বললে, বেনারস গিয়েছিলাম তা জানলি কি করে?

: উমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে।

: ও উমা! মামলা এখন কোন স্টেজে? সলিল কি বুঝছে?

প্রদীপ জানালো ভাস্কর চলে আসার পরে নির্মল কাঠগড়ায় তোলে একজন মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারকে, যৌন-রোগের চিকিৎসা করার বিশেষ ডিগ্রি আছে ভদ্রলোকের। নির্মল তার সওয়ালে যৌন-রোগের নানান কূটপ্রশ্ন করেছে—পুরুষত্বহানির কারণ ও লক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্ন। সে প্রমাণ করতে চেয়েছে ঐ বইতে অপ্রকাশ কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করতে চেয়েছেন। হ্যাভলক এলিস, ডক্টর কিনষে, মেরী স্টোপস্-এর শ্রাদ্ধ হয়েছে। ভাস্কর থাকলে ভাল হত ; যা হোক সলিল তাঁকে ক্রস্ করেছে। তারপর সাক্ষী দিতে ওঠেন একজন বাঙলা ভাষার অধ্যাপক। বাঙলা সাহিত্যে 'অশ্লীলতা' বলতে আধুনিক যুগে কি বোঝা হয়—শালীনতার এবং রুচিবোধের আধুনিক সীমারেখা কতদূর তাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সে সীমারেখা বারে বারে অতিক্রম করেছেন অপ্রকাশ। ফলে সেই অধ্যাপকের মতে 'সাগর-সঙ্গমে' অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। তাঁকেও ক্রস্ করেছে সলিল। আদালত বন্ধ হওয়ার ঠিক আগেই প্রসিকিউশান ঘোষণা করেছে যে, তাদের সাক্ষীর তালিকা নিঃশেষিত। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ সকাল থেকে প্রতিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য শুরু হবে। প্রদীপ ও সলিল জনা দুয়েক সাক্ষী খাড়া করেছে। একজন সওদাগরী অফিসে কাজ করেন, এম. এ. পাস, ইংরাজী সাহিত্যে ; দ্বিতীয়জন একটি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। উভয়েই বইটিকে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য বলে মনে করেন। প্রদীপ বললে, তুই চলে আয় আমার এখানে। সলিল আসবে। এখানেই আমরা মোটামুটি ঠিক করে নেব আমাদের কর্মপদ্ধতি। এখান থেকেই তিনজনে কোর্টে যাব। ভাস্কর রাজী হয়ে গেল।

ভাস্কর প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ পৌঁছাল প্রদীপের বাড়িতে। সলিল তার আগেই এসেছে। ওকে দেখে সলিল বলল, আপ-টু-ডেট অবস্থাটা প্রদীপের মুখে নিশ্চয় জেনেছিস। শোন, আমি প্রথমেই মিস্টার বসাককে তুলতে চাই—

: মিস্টার বসাক কোনজন?

: গ্রন্থাগারিক ভদ্রলোক। আমার ট্যাকটিক্স হচ্ছে—

: আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু কিছুতেই তাতে মন দিতে পারল না ভাস্কর। তার বারে বারে মনে হচ্ছিল—আশ্চর্য, ওরা জানতে পর্যন্ত চাইল না কাশীতে সে কেন গেল, তটিনীর সাক্ষাৎ সে পেল কিনা। যেন ও বিষয়ে কোন জিজ্ঞাস্যই থাকতে পারে না। যেন ওরা সে প্রশ্ন করলে ভাস্কর লজ্জা পাবে।

বেলা পৌনে দশটায় ওরা আদালতে এসে পৌঁছালো। গাড়ি থেকে নেমেই ভাস্কর দেখতে পেল সিঁড়ির মুখে অন্তরা দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর অপ্রস্তুত বোধ করল—আরও অস্বস্তি হল যখন সলিল ওকে কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে বললে—ঐ ভদ্রমহিলা বোধহয় তোকে খুঁজছেন। দেরি করিস না যেন।

প্রদীপ একবার চোখ তুলে দেখল। বললে, অন্তরা দেবী না?

সলিল প্রদীপের হাত ধরে টানল, বললে, হ্যাঁ। আয়।

ওরা দুজনে চলে গেল আদালতের দিকে।

ভাস্কর বিরক্ত হয়েছে। তবু বিরক্তি চেপে সে এক পা এগিয়ে এল। অন্তরার কাছাকাছি এগিয়ে এসে বললে, অত সকালে গেলে যে?

অন্তরা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে, ভাস্কর! ঐ দেখ কে এসেছেন!

ওর তর্জনীর নির্দেশ অনুসারে ভাস্কর দেখল আদালতের ওপাশে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়ে সেই গাড়ি থেকে নেমে আসছেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে। কী আশ্চর্য! আনন্দময়!

আনন্দময় এগিয়ে এসে বললেন, আলাপ করিয়ে দিই—ভাস্কর, এ আমার নাতনী, মিনতি।

ভাস্কর হাত তুলে মিনতিকে নমস্কার করল। আনন্দময়ের দিকে ফিরে বললে, আজই আপনি প্রথম আসছেন, নয়?

: হ্যাঁ, কিন্তু দর্শক হিসাবে আসিনি ভাস্কর! আমি মামলায় সাক্ষী দিতে এসেছি। ডিফেন্স উইটনেস নম্বর ওয়ান।

কয়েকটা খণ্ড মুহূর্তে ভাস্কর ভাষা খুঁজে পেল না। তারপর বললে, হঠাৎ মত পরিবর্তন করলেন যে?

: অন্তরা আমাকে বাধ্য করল। চল আদালতেই যাই। অপ্রকাশকে প্রকাশিত করতে হবে আজ।

ভাস্করের রক্তে দোলা লেগেছে। আলো! ঘন মেঘের ভিতর দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু····সে যে কিছুই জানে না! কী প্রশ্ন করবে? কী প্রতিষ্ঠিত করবে?

আনন্দময় নিজেই প্রশ্ন করেন, কী ভাবছ বল তো?

: ভাবছি কী ভাবে আপনাকে জেরা করব?

: বাপ-মা তোমার নাম রেখেছিলেন 'ভাস্কর'! কুজ্ঝটিকার জাল কীভাবে ছিন্ন করতে হয় তা তোমার জানা উচিত। ভয় কি, তুমি আমি দুজনেই আইনের ছাত্র। কীভাবে প্রশ্ন হলে এ মামলায় সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে তা কি আমরা খুঁজে পাব না? ঘাবড়াচ্ছ কেন ভাস্কর—তুমি প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে চালিত করতে না পারলে আমি উত্তরের মাধ্যমে তোমার প্রশ্নকে চালিত করে নেব—এস।

ভাস্কর একগাল হাসল, বলল—এখন স্যার কি মনে পড়ছে জানেন?

: কী?

: কাল আপনি যে মন্ত্রটা বলছিলেন—ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ!

হাসলেন আনন্দময়। হ্যাঁ, ঐ প্রার্থনা মন্ত্রটা কাল তিনি উচ্চারণ করেছিলেন বটে: ব্রহ্ম আমাদের গুরুশিষ্য উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন—আমরা যেন উভয়ে সমান ভাবে সাফল্য লাভ করি।

গুরু আর শিষ্য, সাক্ষী এবং ডিফেন্স কাউন্সেল, আনন্দময় আর ভাস্কর।

আনন্দময় ওর কাঁধে একটা হাত দিলেন, এস ভাস্কর। তোমরাও এস।

ওঁরা যখন আদালতে ঢুকছেন তখন এদিক দিয়ে প্রবেশ করছেন বিচারক।

আজও আদালত লোকে লোকারণ্য। বিচারারম্ভ ঘোষণা করে জাস্টিস সেনশর্মা এদিকে ফিরলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন দু-দিন অনুপস্থিতির পর ডিফেন্স কাউন্সেল ভাস্কর মুখার্জি ফিরে এসেছেন। ওদিকে বাদীপক্ষও প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। দর্শকের আসনে আজ দুটি নূতন মুখ—যাঁরা আজ প্রথম আসছেন আদালতে। দুজনেই প্রখ্যাত। ডঃ আনন্দময় রায় আর জীমূতবাহন বসু এম. পি.।

: আপনি এবার আপনার প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন—জাস্টিস সেনশর্মা বললেন ভাস্করের দিকে ফিরে।

ভাস্কর উঠে দাঁড়ায় : আমার প্রথম সাক্ষী ডক্টর আনন্দময় রায়।

আনন্দময় উঠে দাঁড়াবার পূর্বে নির্মল উঠে দাঁড়ায়। স্তম্ভিত সে। আনন্দময় ধীরে ধীরে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথামাফিক এক হাতে গীতা স্পর্শ করে অপর হাত ঊর্ধ্বে তুলে তিনি শপথবাক্য উচ্চারণ করলেন।

: আপনার নাম ?

: শ্রীআনন্দময় রায়।

: আপনি ল-কলেজের প্রিন্সিপালরূপে রিটায়ার করেছিলেন?

: হ্যাঁ।

: তার পূর্বে কি আপনি বিচারক ছিলেন?

: ছিলাম। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেশনস্ জাজ হিসাবে কাজ করবার সময় আমি ঐ চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলাম।

: এ কথা কি সত্য যে, আপনাকে দর্শন বিষয়ে আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনারারী পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে?

: হয়েছে।

: একথা কি সত্য যে, আপনি সপ্তাহে একদিন গোলাপার্কে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে দর্শনের উপর বক্তৃতা দেন?

: আর সহ্য হয় না নির্মলের। বলে ওঠে, অবজেকশন য়োর অনার। বর্তমান মামলার সঙ্গে এসব প্রশ্ন সম্পর্ক-বিমুক্ত।

জাস্টিস সেনশর্মা বলেন, বর্তমান সাক্ষীর এই ডিপজিশন এ জাতীয় মামলার একটি নজীর হয়ে থাকবে বলে আমি আশা রাখি। সাক্ষীর পূর্ণ পরিচয় সেক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবজেকশান ওভাররুল্ড।

আনন্দময় বললেন? হ্যাঁ, সপ্তাহে একদিন আমি দর্শনের উপর বক্তৃতা দিয়ে থাকি।

: আপনি সাগর-সঙ্গমে বইটা আদ্যন্ত পড়েছেন?

: পড়েছি।

: ভারতী-প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ পড়েছেন?

: পড়েছি।

: ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটা পড়েছেন?

: পড়েছি।

: পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রচনাটি পড়েছেন কি?

: পড়েছি।

নির্মল উঠে দাঁড়ায়। জাস্টিস সেনশর্মা তার দিকে তাকান। নির্মল বসে পড়ে।

: আপনি তাহলে বইটি তিনবার পড়েছেন?

: হ্যাঁ, তাই।

: কোনবার কি বইটি আপনার অশ্লীল মনে হয়েছে?

: আমার কাছে কোনবারই বইটি অশ্লীল মনে হয়নি।

: লেখক অপ্রকাশ গুপ্তকে কি আপনি তাঁর জীবিতাবস্থায় খুব ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন?

: চিনতাম।

ভাস্কর এবার তার প্রশ্ন অন্যদিকে মোড় ফিরালো। বললে, একথা কি সত্য যে গতকাল সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে আপনার বক্তৃতার শেষে এ-মামলার বাদীপক্ষের কাউন্সেল শ্রীনির্মল নিয়োগী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন?

: হ্যাঁ, সত্য।

: তিনি কি আপনাকে এ মামলায় বাদীপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন?

: হ্যাঁ, করেছিলেন।

: আপনি স্বীকৃত হন, না অস্বীকৃত হন?

: আমি অস্বীকৃত হই।

: কিন্তু আপনি তাঁকে বলেছিলেন, আপনার মতে এ গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত?

: হ্যাঁ, বলেছিলাম।

: আপনার সে মত এখনও আছে?

: না, নেই। বর্তমানে আমার মতে বইটি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত নয়।

: আপনি কি আদালতকে জানাবেন, কী কারণে আপনার মত এভাবে রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেল?

: নিশ্চয় জানাবো। সেক্ষেত্রে আমাকে একটি দীর্ঘ বিশ্লেষণ করতে হবে।

জাস্টিস সেনশর্মা বলেন, আপনি বলুন ডক্টর রায়, আদালত আপনার সেই বিশ্লেষণই শুনতে চায়। তা যত দীর্ঘই হোক না কেন।

## সাতাশ

ডক্টর আনন্দময় রায় একটা দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে আদালতকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাঁর এই আপাত-অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের অর্থটা কী?

আনন্দময় পাণ্ডুলিপি অবস্থায় উপন্যাসটি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে যান। জাস্টিস জনসনের রায় যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন ; কিন্তু তিনি আশা রেখেছিলেন, হয়তো চল্লিশ বছর পরে—যখন হয়তো অপ্রকাশ, তটিনী অথবা তিনি নিজে এই দুনিয়ায় থাকবেন না, তখন গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশিত হবে এবং পাঠক-সাধারণের দ্বারা গৃহীত হবে, অভিনন্দিত হবে। ভারতী প্রকাশনীর প্রাক-প্রকাশন বিজ্ঞপ্তি তাঁর নজরে পড়ে ; তিনি তখনই স্থির করেন এবার বইটি প্রকাশিত হলে তিনি তাঁর প্রভাব খাটাবেন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে. ঐ গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিখে কোন বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশ করবেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল—বইটি বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা এবারও পুলিস করতে পারে। দুর্ভগ্যবশতঃ গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশের পূর্বেই আসামী বিজয়

ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হলেন। জন্মের আগেই অজাত শিশুটিকে পুলিস হত্যা করতে চাইল। আনন্দময়ের কণ্ঠ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত। উঠল না আর একটি কারণে। একই সঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল সুখেন কানোরিয়ার বৃত্তান্ত।

আনন্দময় চিন্তান্বিত হলেন। তবে কি তিনিই ভুল করেছেন! অপ্রকাশের রচনা সমাজের মঙ্গলবিধান করবে না? অপরিণতমন কিশোরদের চিন্তাধারা কলুষিত করবার উপাদান কি সত্যই আছে ঐ উপন্যাসে? সাময়িকভাবে আনন্দময় মতামত প্রকাশে বিরত হন ; তিনি অপেক্ষা করে থাকেন এই মামলায় সুখেনের জবানবন্দির জন্য। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এই আদালতে প্রমাণিত হবে সুখেন কানোরিয়ার এই পাপ কাজের মূল প্রেরণা ঐ গ্রন্থটি নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হল না। যে কোন কারণেই হোক এ মামলার প্রতিবাদীপক্ষের উকিল সুখেনকে জেরা করলেন না—যার অর্থ দাঁড়ালো সুখেনের জবানবন্দি তিনি মেনে নিলেন। এই ঘটনায় মর্মাহত হয়েছিলেন আনন্দময় ; তিনি সিদ্ধান্তে এলেন—অতঃপর আর বলা যায় না, অপ্রকাশ গুপ্তের 'সাগর-সঙ্গমে' অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করা অনুচিত।

তারপর আজ সকালের ঘটনা। অতি প্রত্যুষে তিনি উঠেছেন প্রতিদিনের মতো। প্রার্থনায় বসেছেন। উপাসনা অন্তে তাঁকে জানানো হল একটি মেয়ে তাঁর দর্শনপ্রার্থী। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে সে নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আনন্দময় মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন, তার পরিচয় পেলেন। শুনলেন মেয়েটির নাম শ্রীঅন্তরা বসু ; সে ঐ সুখেন কানোরিয়ার মাসী। অন্তরা তাঁকে সুখেন কানোরিয়ার গোপন ইতিহাস আদ্যন্ত খোলাখুলি বলে গেল। আনন্দময় অবাক হলেন—জেরা করে বুঝলেন মেয়েটি সত্য কথা বলছে। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য যে চিকিৎসক সুখেনকে গোপনে চিকিৎসা করেছিলেন সেই ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ মৈত্রকে তিনি ফোন করলেন। অন্তরার নির্দেশে ডঃ মৈত্র স্বীকার করলেন সুখেনের কী রোগের চিকিৎসা তিনি করেছেন। তৎক্ষণাৎ আনন্দময়ের চোখের সামনে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হল—সুখেনের ক্রিয়াকলাপের জন্য 'সাগর-সঙ্গমে' বইটি আদৌ দায়ী নয়। অন্তরার অনুরোধে তিনি এ মামলায় প্রতিবাদীপক্ষে সাক্ষী দিতে সম্মত হলেন, তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন এই আদালতে উপস্থিত হবার জন্য।

আনন্দময় বললেন, অন্তরার বক্তব্য শোনার পর আমি বুঝতে পারলাম সুখেনের জীবনের সঙ্গে ঐ অপ্রকাশ গুপ্তের জীবনে অদ্ভুত একটা মিল আছে। দুজনেই একই রকম মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। যে যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত হয়ে সুখেন ডরোথি কাপুরের কাছে গিয়েছিল, প্রায় সেই যন্ত্রণার তাগিদেই অপ্রকাশ দ্বারস্থ হয়েছিলেন ঐ তটিনী নাম্নী বারবনিতার—

এইখানে সাক্ষীকে বাধা দিয়ে জাস্টিস সেনশর্মা বলে ওঠেন, ডক্টর রয়, আদালতের কাছে আপনার জবানবন্দি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। লেখক অপ্রকাশ গুপ্তের জীবন সম্বন্ধে আমরা বস্তুত কিছুই জানি না।

: ইয়েস য়োর অনার। আমার মনে হয়, সর্বপ্রথমে লেখক অপ্রকাশ গুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনীটা আমি আদালতে পেশ করি—

আনন্দময় সেই লোকটিকে পরিচিত করতে থাকেন :

অপ্রকাশ গুপ্ত জমিদার তনয়। পূর্ববঙ্গের এক ধনবান জমিদার গৃহের সন্তান। অত্যন্ত

মেধাবী ছাত্র। ম্যাট্রিকে জেনারেল স্কলার হয়েছিলেন। মাত্র একুশ বাইশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তার পরেই তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি সাধারণ নন, তিনি ব্যতিক্রম, অস্বাভাবিক। আর পাঁচজনের মত দাম্পত্যজীবন, যৌনজীবনে অংশীদার হবার অধিকারী করে সৃষ্টিকর্তা তাঁকে নির্মাণ করেননি। এ-কথা তিনি কারও কাছে স্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর যুবতী ভার্যার কাছ থেকে গোপন করার উপায় ছিল না। বৎসরখানেক দাম্পত্যজীবনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অপ্রকাশ প্রায় পাগল হতে বসেন। তাঁর স্বভাব, ব্যবহার ইত্যাদির পরিবর্তনে বাড়ির সবাই চিন্তান্বিত—তাঁরা ঐ নবাগতা বধূকেই এজন্য দায়ী করতে থাকেন। রূপে-গুণে যে ছেলে এতদিন সকলের হৃদয় জয় করেছে সে এমন ভাবে পাগল হতে বসে কেন? নিশ্চয় তার জন্য দায়ী ঐ নবাগতাই। অপ্রকাশ প্রতিবাদ না করে পারেন না, আবার প্রকৃত কারণটা খুলেও বলতে পারেন না। মরণান্তিক যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত তিনি গৃহত্যাগ করেন। সকলে জানল, অপ্রকাশ সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন।

সে কথা সত্যই। অপ্রকাশ প্রথমটায় ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্যটন করতে থাকেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। গুরুর সন্ধানে ফিরেছেন অপ্রকাশ। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কর্ণপ্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা—শেষে একদিন কাশীতে এসে তিনি তাঁর গুরুর সাক্ষাৎ পেলেন বিচিত্র পরিবেশে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করছেন অপ্রকাশ, হঠাৎ পাশের মেয়েদের ঘাটে একটা 'গেল-গেল' রবে আকৃষ্ট হয়ে দেখলেন একটি মহিলা ডুব-জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন। পূববাঙলার দক্ষ সাঁতারু তেইশ বছরের অপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ভাদ্রের ভরা গঙ্গার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন সেই নিমজ্জমানাকে। ভাদ্রের ভরা-গঙ্গার মতই মেয়েটির রূপ কানায়-কানায় টলমল। মেয়েটিকে সুস্থ করে পৌঁছে দিলেন তাঁর বাড়িতে। মহিলাটি অপ্রকাশের চেয়ে ছয়-সাত বছরের বড়। তাঁরও বাড়ি পূর্ববঙ্গে—ঢাকায়। বস্তুত মেয়েটিও সাঁতার জানত কিন্তু একটি নৌকার মাঝির অসতর্ক দাঁড় চালনাতে আহত হয়ে জ্ঞান হারায়। পুরো পরিচয় তিনি প্রথম দিন দিলেন না অপ্রকাশকে। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বললেন, আপনি আমার প্রাণ দিয়েছেন, তার প্রতিদান হয় না ; কিন্তু আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? আগামীকাল আমি একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে ইচ্ছুক। আপনি দুপুরে আমার এখানে এসে দুটি অন্ন গ্রহণ করবেন।

অপ্রকাশ রাজী হলেন। মহিলাটি তাঁর বিচিত্র ভাষায় আরও বললেন, দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা নই—আমি—ধরুন, আমি অচ্ছুৎ! আপনার জন্য কি বাজারের খাবার আনাব?

অপ্রকাশ মহিলাটির সেই জগদ্ধাত্রীর মত রূপের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, না! আমি দর্শনের ছাত্র। আপনার হাতে অন্ন গ্রহণে আমার আপত্তি নেই—

অপ্রকাশের না থাক নির্মলের ছিল। সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, অবজেকশান যোর অনার। সাক্ষী এমন বিবরণ দিচ্ছেন যা 'হেয়ার-সে' রিপোর্ট হতে বাধ্য। কোন সূত্রে তিনি এসব কথা জেনেছেন না জানা পর্যন্ত তাঁর এজাহার গ্রাহ্য হতে পারে না।

জাস্টিস সেনশর্মা সাক্ষীকে বলেন, ডক্টর রায়, আপনি যা বলেছেন, এবং বলবেন তা আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে, না শোনা কথা? শুনলে কার কাছে শুনেছেন? স্বয়ং অপ্রকাশ গুপ্ত?

আনন্দময় হাসলেন। বললেন, যোর অনার! আমি নিজেও একজন আইনের ছাত্র। জুরিসপ্রুডেন্স আমিও সামান্য চর্চা করেছি। আমি জানি, সাক্ষীর জবানবন্দিতে সীমারেখা কোথায় টানতে হয়---এবং 'হেয়ার-সে' রিপোর্ট কাকে বলে। বিশ্বাস করুন---য়োর অনার---আজ এই জবানবন্দি আমার কাছে মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক এক অভিজ্ঞতা। তবু সত্য উদ্ঘাটন-মানসে আমি আদালতে স্বীকার করতে উঠেছি। আমি আদালতকে আশ্বস্ত করছি---আমি যা বলেছি, বলছি এবং বলব সাক্ষী হিসাবে তা বলবার অধিকার আমার আছে। লার্নেড কাউন্সেল অফ দ্য প্রসিকিউশান যদি আমার জবানবন্দির নোট রেখে যান, তাহলে জেরার সময় তিনি জেনে নিতে পারেন কোন তথ্যটি কীভাবে আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছি। আমি খুশি হব যদি আদালত আমাকে বিনা বাধায় অকপট জবানবন্দিটা দিতে দেন।

জাস্টিস নির্মলের দিকে ফিরে বলেন, অবজেকশান ওভাররুলড।

সুর কেটে গেছে। আনন্দময় যেন হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। দিশেহারার মতো আদালত কক্ষের উপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখেন। কী খুঁজছেন তিনি? ওদিকে বসে আছেন জীমূতবাহন, অজিত গুপ্ত আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ। সলিল প্রদীপকে নিম্নস্বরে কী যেন বলছে। কিন্তু না, আনন্দময় তো ওদের দেখতে চাইছেন না—তাঁর দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থেমে গেল—ঐ তো! যাকে খুঁজছিলেন! মনোরমা! কিন্তু এ কী! মনোরমা আজ বাইশ বছরের তরুণী হয়ে গেল কেমন করে?

: য়ু মে প্রসীড ডক্টর রয়।

সম্বিৎ ফিরে পান আবার। বুঝতে পারেন, মেয়েটি ওঁর স্ত্রী মনোরমা নয়, মনোরমার নাতনী---ওঁর আদরের মিণ্টু। মনোরমা কোনদিন তটিনীর কথা শোনেনি, তটিনীকে সে চিনত না---চিনলে কি আজ অমন অবাক চোখে এই আদালতে এমন ভাবে বসে থাকতে পারত? ও মিনতি—ওঁর শেষ জীবনের সঙ্গিনী। বোধকরি এই এত বড় আদালত কক্ষে একমাত্র ঐ মেয়েটিই অনুমান করতে পারছে—সাক্ষীর আর্তি, কেন এ জবানবন্দি তাঁর কাছে বেদনাবহ, যন্ত্রণাময়! কিন্তু সেটা যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য!

: ডক্টর রয়?

: ইয়েস—ইয়েস য়োর অনার—

না। আদালতের উপর দৃষ্টি প্রসারিত করলে মন তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। চক্ষুলজ্জা, লোকলজ্জা, সামাজিক বাধা, অহঙ্কারে আঘাত! না, এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে---অহংবোধের কুজ্ঝটিকাকে ভেদ করে সত্যসূর্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্ত আনন্দময় তাঁর মনকে গুটিয়ে আনলেন—মিলিয়ে গেল আদালতের দৃশ্য—জজ, পেশকার, কৌঁশুলীরা, উদ্‌গ্রীব দর্শকদল, সংবাদপত্রের প্রতিনিধির দল। পঞ্চেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে আনলেন সংযমের বর্মে---যদা সংহরতে চায়ং কুর্ম্মোইঙ্গানীব সর্ব্বশঃ! সামনে ফুটে উঠল কাশীর সেই মিছরিপোকরার গলি। ফেড-আউট আদালত—ফেড-ইন মিছরি-পোকরা। সেখানে অপ্রকাশ সন্ধান পেলেন তাঁর বাঞ্ছিত গুরুর। হ্যাঁ, বারবনিতা তটিনী দীক্ষা দিল তাঁকে---জীবনমন্ত্রে। বললেন, 'সাগর, আমি অনেক কিছুই জানি না, জানলি? তর মত ইঞ্জিরি বই পড়বার পারি না, আর পাঁচড়া গেঁয়ো মাগী যা পারে তাও পারি না। ভাতাররে পাঁচব্যঞ্জন রাইন্ধ্যা খাওয়াইবার পারি না, আঁতুরে বাচ্ছারে মাই দিবার পারি না, হক্কল মাইয়া যা পারে তাও পারি না---বিউতে। তা হউক, একডা কাম আমি

মন দিয়া শিখ্ছি—ঐ একটা শাস্তর! ফ্রক ছাইড়্যা শাড়ি পরন-ইস্তক ঐ কামডাই শিখছি। আমি তরে কইতাছি শুইনাল'—যা ভাবতাছিস তা লয়। এ তর দ্যাহের অসুখ লয়, মনের! তর মাথা খাইছে—ঐ বেহুদ্দা ডর! তুই ধইর‍্যা নিছিস—'আমি পারুম না'! মাইন্যা নিছিস—তুই বাতিল। তরে ঐ জুজুবুড়ির হাত থিকা একডা মুনিষ্যিই বাঁচাইবার পারত—তর ঐ মাগ আবাগী! তা সে মাগী জানেই বা কি, বোঝেই বা কি! তারে দুষ্যা কি অইব?"

অপ্রকাশ অবাক হয়ে যেত। ইতিপূর্বে কোন ডাক্তার দিয়ে সে নিজেকে পরীক্ষা করায়নি। লজ্জায়, সঙ্কোচে। কিন্তু লাইব্রেরী থেকে শারীরবিজ্ঞানের বই এনে পড়েছে, রাতের পর রাত জেগে। ফ্রয়েড, য়ুং, হ্যাভলক এলিস, অ্যাডলার। ও অবাক হয়ে যায় তটিনীর নিদান শুনে। সে-সব বই না পড়েও তটিনী কেমন করে জানল যে, সে ভুগছে 'ফিয়ার কমপ্লেক্সে'? অসুখটা ওর দেহে নয়, মনে। রোগনির্ণয় তার করাই ছিল—জানত না, তার বিশল্যকরণী কোথায় পাওয়া যায়।

তটিনী তাকে সারিয়ে তুলল। তিল তিল করে। রাতের পর রাত। সাহস ফিরে পেল অপ্রকাশ। আত্মবিশ্বাস। যে অন্ধকার গুহার প্রবেশদ্বারে এতকাল সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, অজ্ঞাত গুহামুখে বিহ্বল হয়ে পড়েছে, সেই ঘনান্ধকার গুহার অভ্যন্তরে তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল তটিনী, অনায়াস ভঙ্গিমায়। বারে বারে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'ডরাস ক্যানে? চল না—দেইখ্যা আসি ভিতরডা! আমি তো তর লগেই আছি!' যে নিষিদ্ধ গহ্বরের কল্পিত আতঙ্কে ও ভয়ে কাঁটা হয়ে যেত এতদিন, ভিতরে প্রবেশ করে দেখল সেটা অপূর্ব সুন্দর এক অনাবিষ্কৃত নন্দন-কানন—'ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স'। তার বর্ণনা পড়া ছিল—স্মাইথ-এর ভ্রমণকাহিনীতে : 'কামেট কংকার্ড'। তার বাঙলা কি হবে? বাঙলা যাই হোক, সেই কামশিখর জয়ের পথেই স্মাইথ দেখেছিলেন এই অপূর্ব 'ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স'। লোকচক্ষুর অন্তরালে সে এক গোপন উপত্যকা! দুই দিকে দুই পর্বতের ঢালু পাড়—মাঝখানে নরম গালিচা মোড়া এই ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্স। অযুত-নিযুত পুষ্পসম্ভার : ব্রহ্মকমল, ডলফিনিয়াম, পোটেন্টিলা, গোলাইগোনাম, ক্রিম্যাণ্টোডিয়াম। সোহাগভরে হাওয়ায় দুলছে। সবই অচেনা, অজানা নাম—যা ফোটে লোকচক্ষুর অন্তরালে—না কখনও দেখেছে চোখে, না শুঁকেছে গন্ধ, না পেয়েছে স্পর্শ! শুধু বই পড়া বিদ্যা! তটিনীর হাত ধরে সেই নন্দন-কাননে পৌঁছে ও নয়ন ভরে দেখল সেই সঙ্গোপন পুষ্পসম্ভার। কিছু কিছু যেন চেনাও লাগল। অভিজাত পুষ্পের এ রাজসভার একান্তে লাজুক ঐ কুসুমমঞ্জরীটা অপরাজিতার নয়? আর ঐ কোণে? ওটা তো পাতার আড়ালে-লুকিয়ে থাকা অকাল-বর্ষণের প্রথম-স্পর্শে রোমাঞ্চিততনু ফোটা কদম!

দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাদ্রের ভরা গঙ্গার বুক থেকে অপ্রকাশ ছিনিয়ে এনেছিল আর এক ভাদ্রের ভরা গঙ্গাকে। সেই কানায়-কানায় ভরা পতিতপাবনী পতিতাই উদ্ধার করল ওকে—অপ্রকাশের ঊষর সাহারা-জীবনে শোনালো সাহানার সুর। অপ্রকাশ তটিনীকে দিয়েছিল জীবন, প্রতিদানে তটিনী অপ্রকাশকে ফিরিয়ে দিল তার যৌবন। একটি বছর অপ্রকাশ গুপ্ত হয়ে রইল সেই বারবনিতার গুরুগৃহে। তখনই সে রচনা করে তার গ্রন্থখানি। 'সাগর-সঙ্গমে'। যেদিন তার রচনা শেষ হল সেদিন তটিনীই হল তার পাণ্ডুলিপির প্রথম শ্রোতা। আদ্যোপান্ত শুনে তটিনী বললে, "সাগর, এ কী ক্ষ্যাপামি শুরু

করছিস তু? আমার মুখের কথা বেবাক লিখ্যা গেছিস, অ্যাঁ? এ পোড়ামুখের কি আড় আছে? এ যে সব কাঁচা খিস্তি রে?"

অপ্রকাশ বলেছিল, 'আড়' মানে 'আড়াল'। আমি তো আড়াল দিয়ে কিছু বলতে চাইছি না! যা বলতে চাই, তা খোলাখুলিই জানাতে চাই—

কিছুদিন পরে তটিনী বলে, "সাগর, তরে এবার দ্যাশে ফিরন লাগব। তর মাগের কাছে যাওন লাগব। আইজ একটি বচ্ছর সে মাগীর—"

তটিনী যে ভাষার প্রোষিতভর্তৃকা নারীর আন্তরবেদনার ব্যাখ্যা করেছিল সেটা ছাপা অক্ষরে বলা চলে না, বললে এ 'অশ্লীলতার দায়ে' বাজেয়াপ্ত হবে অশ্লীলতার দায়ে। তা তটিনীর সেই ভাতারখাকি-ভাষায় বলা কথাগুলি ভর্তৃখাদিকা-ভাষায় রূপান্তরিত করলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় : তুমি সংসারাশ্রমে ফিরে যাও সাগর। আবার লেখাপড়া শুরু কর। দাম্পত্যজীবনে মধুপানে তুমি একাই বঞ্চিত ছিলে না, বঞ্চিতা ছিল তোমার সংসারানভিজ্ঞা গ্রাম্যবধূও। তাকে মুঞ্জরিতা করে তোল, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতিনীতে সেই পরিত্যক্ত সংসারটিকে আনন্দঘন করে তোল।

অপ্রকাশ চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললে, আর তুমি? তুমি এরপর কী করবে?

তটিনী তার নিজস্ব ঢঙে বললে, সে ঢাকাতেই ফিরে যাবে। তাঁর চিহ্নিত জীবনে! তীর্থদর্শন করার সখ মিটেছে তার। অপ্রকাশ বলতে চেয়েছিল, এরপর সেই ক্লেদাক্ত জীবন হয়তো ভাল লাগবে না তটিনীর। সেটা সে স্বীকারও করেছিল, তবু বলেছিল, পেট বড় অবুঝ রে সাগর! কী করুম ক? আর কুন বিদ্যা তো শিখি নাই?

: শিখেছ। না হলে তুমি আমাকে নতুন করে বাঁচতে শেখালে কেমন করে? শোন, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার প্রতিদান নেই ; কিন্তু আমিও তোমাকে ঐ ঘৃণিত জীবন থেকে মুক্তি দিতে চাই, তুমি নেবে?

: কী করবার চাস?

: তুমি এই কাশীতেই থেকে যাও। গঙ্গাস্নান কর, বিশ্বনাথের মন্দিরে যাও, বাঙলা বইটই পড়, গঙ্গার ঘাটে কথকতা শুনে কাটিয়ে দাও বাকি জীবন। আমি ভরণপোষণের আজীবন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সে আর্থিক ক্ষমতা আমার আছে।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল তটিনী : অমা, আমি কনে যামু? মাইয়ামানুষ পুষবি? হ্যাঁ রে সাগর! ময়না-পোষণের সখ হইচে?

: তোমার ভাষায় যদি এটা ময়না-পোষা হয়, তবে তাই। রাজী?

এবার তটিনী গম্ভীর হয় : রাজী হইমু এক কড়ারে! যুদি আমার সুমুখে আর কুনদিন না আসিস! চিঠি-চাপাঠি না লিখিস! অখন থিকা বাকী জীবন তরে মাগের আচল-ধরা হইয়া থাকবার লাগবো। পারবি?

অপ্রকাশ রাজী হয়। তটিনী হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে : অমা আমি কনে যামু! হ্যাঁ রে সাগর! এমন মাগি-পোষণের কথা যে আমি জন্মে শুনি নাই রে!

তটিনী রয়ে গেল কাশীতেই। গত চল্লিশ বছর ধরে সে কাশীতেই আছে। কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছে বই পড়ে পড়ে। আজও সে জীবিতা। অপ্রকাশ ফিরে এসেছিল সংসারাশ্রমে। অসমাপ্ত শিক্ষা শেষ করল। স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল। মুঞ্জরিতা হয়ে উঠল সে কালে। অপ্রকাশ ক্রমে জীবনে—হ্যাঁ, লৌকিক মানদণ্ডে সফল-জীবন বলতে যা

বোঝায়—অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান, সামাজিক মর্যাদা—তার অনেকখানিই পেল। তটিনীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে অপ্রকাশ আনন্দময় হয়ে উঠল। স্ত্রী কোনদিন জানতে পারেনি তটিনীর কথা। তটিনীও দ্বিতীয়বার সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হতে পারেনি—বস্তুত সাগরকে সে চোখেই দেখেনি আর কোনদিন। কোন চিঠিপত্রও পায়নি কখনও! পেয়েছিল রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে একখানি বই। ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

জবানবন্দি শেষ করলেন আনন্দময়। আদালতে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা।

ভাস্কর প্রশ্ন করতে ভুলে গেল। এর পর একটিমাত্র কথাই জানার বাকি আছে। বুঝতে সে পেরেছে ; কিন্তু সে-কথা কি জিজ্ঞাসা করা যায় ঐ হিমালয়প্রতিম মহান পুরুষটিকে? প্রশ্ন ভাস্করকে করতে হল না, করলেন বিচারক স্বয়ং : ডক্টর রায়, এবার আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই—

: ইয়েস, য়োর অনার!—ক্লান্ত সাক্ষীর তন্ময়তা কেটে গেল।

: দর্শন এবং আইনের উপর আপনি অনেক বই লিখেছেন, আমি জানি, পড়েছি। কিন্তু আপনি কি কখনও কোন কথাসাহিত্য রচনা করেছেন? উপন্যাস, রম্যরচনা?

: ইয়েস, য়োর অনার, করেছি!

: স্বনামে?

: না।

: ছদ্মনামে?

: হ্যাঁ।

: সেই ছদ্মনামটা কি আপনি আদালতকে জানাতে পারেন?

: জানতে আমাকে হবেই—না হলে আমার এ জবানবন্দি অর্থহীন—সবই 'হেয়ার-সে'!

: আপনার সেই ছদ্মনামটি কি?

: অপ্রকাশ গুপ্ত।

চমকে উঠল না, আদালত যেন এতক্ষণের একটা রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করল শুধু।

: অর্থাৎ আপনিই 'সাগর-সঙ্গমে' গ্রন্থের লেখক?

: অ্যাফার্মেটিভ!

জাস্টিস সেনশর্মা ভাস্করের দিকে ফিরে বললেন, য়ু মে প্রসীড। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

: আছে, য়োর অনার। আমি আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সাক্ষী তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন, সুখেন কানোরিয়ার সঙ্গে অপ্রকাশ গুপ্তের জীবনে আশ্চর্য মিল আছে। সেই সময়েই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে যান এবং অপ্রকাশ গুপ্তের জীবন-কথা আমাদের শুনিয়েছেন। প্রসিকিউশান উইটনেস সুখেন কানোরিয়া সম্বন্ধে বর্তমান সাক্ষী প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কী জেনেছেন তা আমরা এখনও শুনিনি—

আনন্দময় বলেন, ইয়েস, ডক্টর অতুলকৃষ্ণ করোবরেট করবেন যদি তাঁকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয় যে, সুখেন ঐ একই রোগে ভুগছে। পুরুষত্বহানির কথাটা তার কাছে এতই লজ্জাকর যে, সে-কথা প্রকাশ হয়ে পড়ার বদলে সে ডরোথি কাপুরের মৃত্যুর দায়িত্বও নিজস্কন্ধে নিতে চায়। সুখেন একটি মানসিক রুগী। তারও দেহের নয় মনের অসুখ। সেই অসুখের কথা গোপন করার উদ্দেশ্যেই ও বলেছে ডরোথির কাছে সে একা

গিয়েছিল, সে তাকে উপভোগ করেছে। তা সে করেনি, করতে পারে না। তার রোগের কথা এ দুনিয়ায় তিনজন মাত্র জানে, ডাক্তার মৈত্র, অন্তরা এবং সম্ভবত জানত ডরোথি কাপুর! অন্তরা আমার কাছে স্বীকার করেছে সুখেনকে বইটা সে নিজেই পড়তে দিয়েছিল --সৎ উদ্দেশ্যে। অন্তরা আশা করেছিল, সুখেন ঐ বইটায় আশার আলোক দেখবে। তা সে দেখেছে। বস্তুত সুখেন 'সাগর-সঙ্গমে' পড়ে লালসার তাড়নায় ডরোথির কাছে ছুটে যায়নি —মর্মান্তিক প্রয়োজনে সে ঐ বারবনিতার ভিতর তটিনীকে খুঁজতে গিয়েছিল! দুর্ভাগ্য সুখেনের, আর ডরোথির,---ডরোথি কাপুর তটিনী নয়। যাই হোক, বর্তমান মামলায় সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। আমি শুধু এ কথাই বলব যে, আমি আশা রাখি—আমার এই অকুণ্ঠ জবানবন্দি যখন কালকের কাগজে ছাপা হবে তখন সুখেন কানোরিয়া—সে যেখানেই থাকুক না কেন সেটা সে পড়বে ; বুঝবে যে, একটা মানসিক রোগে ভোগার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আত্মহত্যার মধ্যে এ সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা নিষ্প্রয়োজন। অপ্রকাশ গুপ্ত সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন তাঁর গ্রন্থে—দিচ্ছি আমি, এই পলিতকেশ বৃদ্ধ আজ প্রকাশ্য আদালতে। আমি বিশ্বাস রাখি, যেখানেই থাকুক, সুখেন আমার এ আহ্বানে সাড়া দেবে। পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি সে মাথা পেতে নেবে। তারপর তার জীবনও আনন্দময় হয়ে উঠবে। আমি এ আশাও রাখি—অপ্রকাশ গুপ্তের ঐ গ্রন্থ যুগে যুগে ঐ জাতীয় মানসিক রোগীকে আশার বাণী শোনাবে, পথনির্দেশ করবে, তাদের জীবনকে আবার ফুলে-ফলে ভরে তুলবে।

আনন্দময় থামলেন।

জাস্টিস সেনশর্মা নির্মলের দিকে ফিরে বললেন, ইয়েস! য়ু মে ক্রশ হিম নাউ।

নির্মল উঠে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়ানো কাঞ্চনজঙ্ঘার মত শুভ্রকেশ ঐ বৃদ্ধকে। সত্যের খাতিরে যিনি তাঁর যৌন-জীবনের গোপনতম তথ্য চার দশক পরে আজ এই আদালতে অকুণ্ঠভাবে মেলে ধরেছেন। আনন্দময়ের ত্যাগের তুলনায় তার পরাজয় তো অকিঞ্চিৎকর! বিচারকের দিকে ফিরে সে বললে, নো, য়োর অনার। প্রসিকিউশনের কোন কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। পার্মানেণ্টলি!

আনন্দময় নেমে এলেন মঞ্চ থেকে।

ভাস্কর এগিয়ে এসে ওঁর ডান হাতটা ধরল।

নির্মলও এগিয়ে এসে ধরল ওঁর বাঁ হাতটা।

দুজনের হাত ধরে উনি এগিয়ে এলেন দর্শকের আসনে, যেখানে ওঁর মনোরমা আজ মিনতি হয়ে অপেক্ষা করছে। দু চোখের জলে ভাসছে।

সব কিছু খুইয়েও—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়---আনন্দময় আনন্দময়!

—